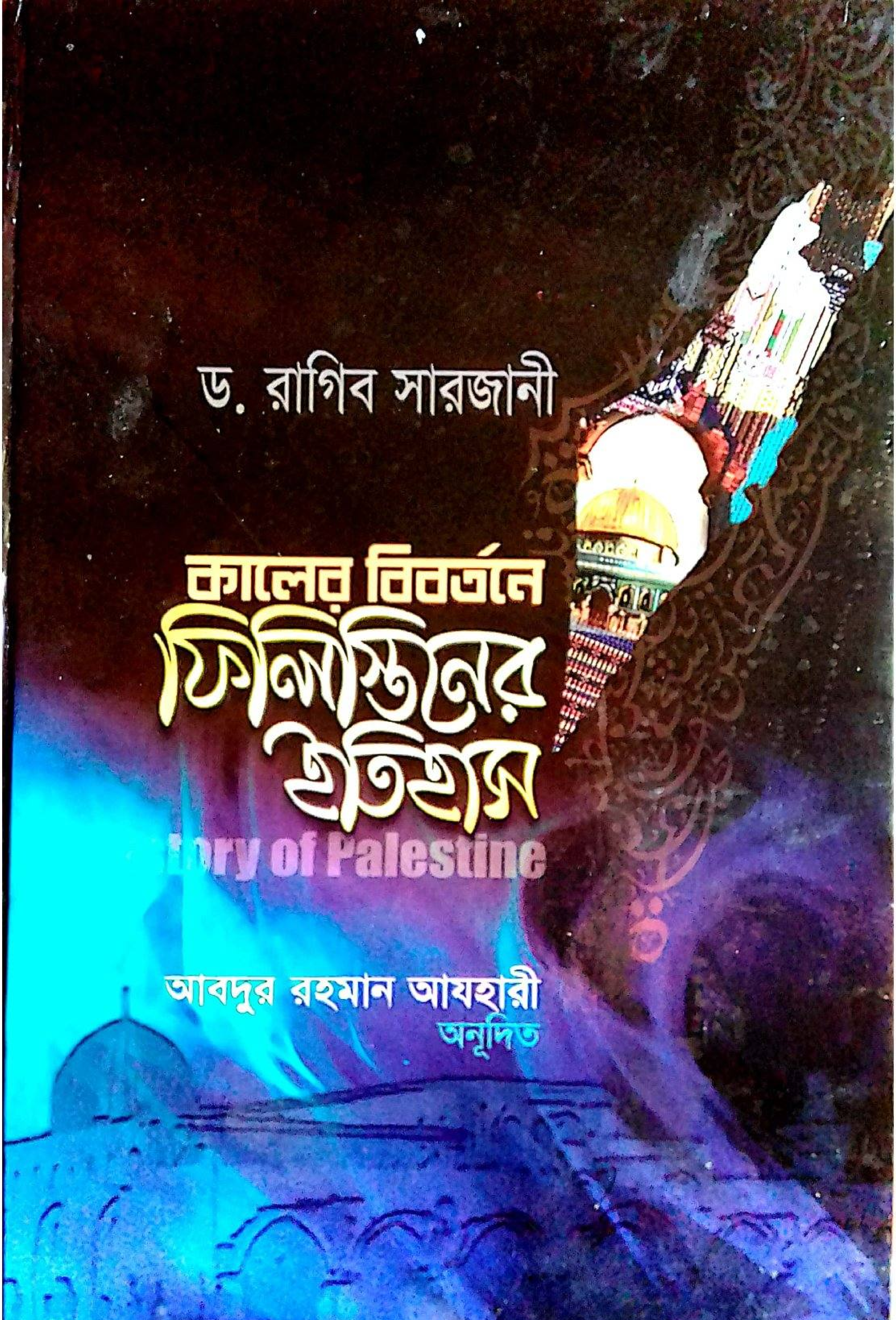

ড. রাগিব সারজানী
কালের বিবর্তনে
ফিলিস্তিনের
ইতিহাস
tory of Palestine
আবদুর রহমান আযহারী
অনূদিত

কালের বিবর্তনে
ফিলিস্তিনের ইতিহাস

[মানব ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত]

মূল

ড. রাগিব সারজানী

কায়রো, মিসর

অনুবাদ

আবদুর রহমান আযহারী

শিক্ষার্থী : আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন ডিপার্টম্যান্ট, মিসর

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস, জামালুল কুরআন মাদরাসা

গেন্ডারিয়া, ঢাকা

কালের বিবর্তনে
ফিলিস্তিনের ইতিহাস
মূল
ড. রাগিব সারজানী
কায়রো, মিসর
ভাষান্তর
আবদুর রহমান আযহারী
সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

প্রকাশনা
১০৮ [একশত আট]
প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশক
উসওয়া প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫
প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক
মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা
মূল্য ৬০০ টাকা মাত্র

সূচি

আমাদের কথা

মনটা ভারাক্রান্ত। ফিলিস্তিনের ইতিহাস বেশ ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। পড়লে বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া যেই সারজানীকে চিনতাম না; এখন আমি রীতিমত তাঁর প্রেমে পড়ে গেছি। সময় থাকলে তাঁর সব বই পড়ে ফেলতাম। তবে এখনও আশা আছে।

'কিস্‌সাতু ফিলিস্তিন' সারজানীর জাদরেল একটি রচনা। অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক মাওলানা আবদুর রহমান আযহারী। নবীনের অনুবাদ হওয়ায় সম্পাদনার কাস্তেটা নির্মমভাবে চালাতে হয়েছে। তবে এখন অনুবাদটাও আরবী মূলের মত সুখপাঠ্য হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে নম্বর প্রদানের মূল দায়িত্ব পাঠকের।

আমরা নাম দিলাম 'কালের বিবর্তনে ফিলিস্তিনের ইতিহাস'। সংক্ষিপ্ত হলেও লেখক টাচ করেছেন পুরো দুনিয়ার ইতিহাসে। বিশেষত ফিলিস্তিন-সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে স্পর্শ করতে লেখক কখনও ভোলেননি। আর কাহিনীর পরম্পরা তিনি বজায় রেখেছেন একেবারে উপন্যাসের কায়দায়, যা আপনাকে তীব্রভাবে বিস্মিত করবে।

মুসলমানদের হৃদয়ে ফিলিস্তিন ঘিরে এক বিশেষ আবেদন সৃষ্টির লক্ষে লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। মূল আরবী গ্রন্থ এই আবেদন সৃষ্টিতে যথাযথভাবে সফল। অনুবাদও যদি অনুরূপ সফল হয়, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক।

আল্লাহ ﷻ লেখক, অনুবাদ, সম্পাদক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্বাধীন ফিলিস্তিন দেখে যাওয়ার এবং মৃত্যুর আগে মসজিদে আকসায় সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
সম্পাদক ও মহাপরিচালক
হুদহুদ প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

২০২০ সালের শুরু। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়তে আসার তখনও বছর পোরেনি। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে তখন সারা দুনিয়া নাকাল। মিসরে চলছে লকডাউন। আল-আযহার বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য। বাসায় অবস্থানের বিকল্প কিছু নেই। তখন প্রখ্যাত দাঈ ও ইতিহাসবিদ ডক্টর রাগিব সারজানীর বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। ফিলিস্তিন নিয়ে তাঁর লেখা পাঁচটি বই পড়ে ফেলি। সেগুলোর মধ্যে 'কিস্সাতু ফিলিস্তিন' বইটি আমাকে খুব আলোড়িত করে। ইতিহাসের সাথে দাওয়াত ও চেতনার এক অপূর্ব মিশ্রণ। আল-আকসার পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের এ আবেদন বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি বইটি এখনও বাংলায় অনূদিত হয়নি।

পুরো কায়রো শহরে তখন রামাদানের আমেজ। সিদ্ধান্ত নিই এবারের রামাদান কাটবে ফিলিস্তিনের সাথে। শুরু হয় অনুবাদ। তারাবীহের পর লেপটপের সামনে বসি। নিস্তব্ধ রাতে অনুবাদে ডুবে থাকি সাহরী পর্যন্ত। ফজরের পর যোহর পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপর মাগরিব পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে বাংলায় রূপান্তর। অনুবাদ মানে একদম অনুবাদে হারিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে আবেগে কেঁপে উঠি। কখনও কখনও আল-আযহারের ফিলিস্তিনী বন্ধুদের সাথে মতবিনিময় করি। পহেলা রামাদান থেকে ঈদের রাত পর্যন্ত এভাবে কেটে যায়। অনুবাদ সম্পন্ন হয় প্রায় দুই তৃতীয়াংশের। বলতে পারি, এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রামাদান।

এর মধ্যে আল-আযহারের বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ হয়ে যায়। খুব কষ্টে ফিলিস্তিন থেকে সরে এসে পরীক্ষায় মনোনিবেশ করি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি কয়েকটি আরবী ম্যাগাজিনে লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়ি। তখন বড় ইতিহাস গ্রন্থেরও

অনুবাদ চলছিল। সব মিলিয়ে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ফিরে আসতে আসতে ফুরিয়ে যায় প্রায় দেড় বছর। অবশেষে আল্লাহ ﷻ-র মেহেরবানীতে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয় 'কিস্সাতু ফিলিস্তিনে'র অনুবাদ।

একাধিক প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের সাথে অনুবাদটি প্রকাশের কথা হয়। শেষে হুদহুদ প্রকাশনের মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হোসাইন সাহেবের আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করে। হুদহুদ পরিবার অনুবাদ সম্পাদনার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাঁদের এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। এখন বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মাসিক আল-হামিদ সম্পাদক মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও প্রিয় ভগ্নিপতি, জাতীয় লেখক পরিষদের সেক্রেটারি আবদুল গফফার সাহেবসহ যাদের নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় হাতে কলম তুলে নেওয়ার হিম্মত হয়েছে, তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করি ফিলিস্তিনের ইতিহাস মুসলমানদের হৃদয়ে জায়গা করে নিবে। ফিলিস্তিনের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ আরও গভীরে প্রোথিত হবে। আল্লাহ ﷻ বইটি কবুল করুন। আমীন।

আবদুর রহমান
নসর সিটি, কায়রো, মিসর
তারিখ: ০১/০৬/২০২২

লেখকের কথা

ইসলামী ইতিহাসের হাজারও কাহিনী থেকে আমরা আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছি এমন এক বিশেষ কাহিনী, বর্তমান যুগে যা অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। তা হল ফিলিস্তিনের কাহিনী। ফিলিস্তিনের কাহিনী মানবেতিহাসের এমন এক অধ্যায়, যা অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করা মুসলমানদের আবশ্যক। এতে রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আর উপদেশ। রয়েছে এমন অজস্র শিক্ষা, যা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি এখন, এবং নিকট ও দূরবর্তী ভবিষ্যতে।

কেউ কেউ মনে করেন, ফিলিস্তিন ইস্যু একটি ভূখণ্ডগত বিষয়; যা এতান্তই ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব ব্যাপার। যেহেতু ফিলিস্তিনীরা প্রতিনিয়ত নানাবিধ ঘটনার সম্মুখীন হন, তাই এই অধ্যায় নিয়ে পড়াশোনা তাদেরই প্রধান কর্তব্য।

হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! ফিলিস্তিন ইস্যু একটি সর্বব্যাপী ইসলামী ইস্যু। এমন এক ইস্যু যা প্রত্যেক মুসলমানকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। কেননা, ফিলিস্তিন ইস্যু প্রথমত আকিদার ইস্যু। আর আকিদাসংক্রান্ত বিষয় এমন, যা পূরণ না করে কোনো মুসলমান জীবনযাপন করতে পারে না। অতএব, ফিলিস্তিন প্রত্যেক ওই মুসলিমের ইস্যু, যে নিজের ধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের রব তাঁর কিতাবে যা বলেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের হাবীব ﷺ হাদীসে যা বলেছেন, তার ওপর শ্রদ্ধাশীল, ইতিহাসের ধাপে ধাপে এই উম্মতের সন্তান উলামা-সুলাহা ও মুজাহিদরা যা করেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল।

বিভিন্ন দলিলের আলোকে প্রমাণিত যে, এই ভূখণ্ড পবিত্র। এটা মুসলমানদের প্রথম কেবলা এবং তৃতীয় হারাম। এখানে রয়েছে মসজিদে আকসা। এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ যে, হাদীসের ভাষ্যমতে মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং ফিলিস্তিনের এই মসজিদ বাদে আর কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে না। ফিলিস্তিনের ভূমি কুরআনের একাধিক বিবরণমতে বরকতময় অঞ্চল।

ফিলিস্তিনের কাহিনী নির্বাচনের অন্যতম আরেক কারণ, ফিলিস্তিনের কাহিনীর আলোকে আমরা অধ্যয়ন করব পুরো ইসলামী ইতিহাস। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ এই ভূখণ্ড দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। রসুল ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে ইসলামের আলোকে শাসনকারী প্রতিটি সাম্রাজ্য এই ভূখণ্ড হয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আমরা বিচরণ করব মানবেতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে। শুধু ইসলামী ইতিহাসই নয়, বরং ফিলিস্তিনের ইতিহাস থেকে আমরা জেনে নেব পারসিক, রোমান, অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলন ও ফারাওদের ইতিহাস। এমনইভাবে ফিলিস্তিনের ইতিহাস ধরে আমরা বিচরণ করব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসেও। ঘাঁটাঘাঁটি করব ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানিসহ বহু আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস।

এই বরকতময় রাষ্ট্রের ইতিহাসে দুনিয়ার যে রাষ্ট্রেরই রয়েছে কোনো না কোনো সম্পর্ক কিংবা কোনো প্রকারের রেষারেষি, সেগুলোর ইতিহাসও আমরা জেনে নেব।

সেই সাথে আমরা আলোচনা করব চলমান ফিলিস্তিন সংকট নিয়েও। কেননা, ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে এত অধিক পরিমাণে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, যা অন্য যেকোনো ইস্যু নিয়ে চালানো অপপ্রচারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। জায়নবাদীদের দখলে রয়েছে ভয়ঙ্কর মিডিয়া শক্তি। এই মিডিয়া শক্তির ব্যবহার করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে এক বড় ধরণের বিকৃতি। সেই বিকৃতির ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই।

এসব বিষয় সামনে রেখেই আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি এই গ্রন্থ। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের পশ্চাতে আমাদের রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। আল্লাহ ﷻ কবুল করুন।

— রাগিব সারজানি

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনার প্রত্যাশায় কালের বিবর্তন নিয়ে এ গ্রন্থটির রচনা। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস অতিদীর্ঘ এবং অত্যন্ত মহিমান্বিত। মূল্যবান রত্ন, অফুরন্ত ধন-সম্পদ ও অঢেল খনিজে পরিপূর্ণ এ ইতিহাস, যার বিস্ময় কখনও শেষ হওয়ার নয়।

ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্য থেকে আমি আপনাদের জন্য এমন একটি কাহিনী নির্বাচন করেছি, বর্তমান যুগে যা অধ্যয়ন করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। তা হল ফিলিস্তিনের কাহিনী। আমি মনে করি, ফিলিস্তিনের কাহিনী ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায়, যা অধ্যয়ন না করে মুসলমানদের কোনো গত্যন্তর নেই। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে অসংখ্য উপদেশ ও দিকনির্দেশনা। রয়েছে এমন সব শিক্ষা যা থেকে আমরা পাথেয় পেতে পারি। উপকৃত হতে পারি এখন এবং নিকট ও দূরবর্তী ভবিষ্যতে।

আগেই বলে রাখি, কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা ইতিহাস পড়ব কেন? উত্তরে আমি বলব, ইতিহাস পাঠের সরাসরি নির্দেশ এসেছে আমাদের রব ﷻ-এর পক্ষ থেকে।

তিনি বলেন—

> আমি ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দিতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের মত; তার উপর তুমি বোঝা চাপালেও সে হাঁপায়, বোঝা না চাপালেও সে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শন অস্বীকার করে, তার অবস্থাও এরকম, তুমি কাহিনী বর্ণনা করো; যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৬]

এই আয়াতে রয়েছে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ হতে সরাসরি নির্দেশ, যেন আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কাহিনী বর্ণনা করি।

তা ছাড়া ইতিহাস পুনরাবৃত্তিশীল। যে ঘটনা ঘটেছিল এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, দশ বছর কিংবা দশ হাজার বছর আগে, আজ আবার তা ঘটছে। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহ ﷻ-র এক অমোঘ নীতি রয়েছে, যা কখনও পরিবর্তন হয় না।

আল্লাহ ﷻ তাঁর মহান গ্রন্থে বলেন—

> ... দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য আর কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব, তুমি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম ব্যতিক্রমও পাবে না। [ফাতির : ৪৩]

মুসলমানরা একই ভুলে নিপতিত হয় বারংবার। কেননা, তারা ইতিহাস অধ্যয়ন করে না। যেমন, একজন ডাক্তার যদি চান কোনো রোগীর সঠিক চিকিৎসা করতে, তবে তার জন্য রোগীর ইতিহাস জেনে নেওয়া আবশ্যক। গত বছর তার কী সমস্যা হয়েছিল? দশ বছর আগে তার কী ঘটেছিল? সে কোথায় কোন পরিবেশে বসবাস করেছে? কোথায় কোথায় গিয়েছে? সেই প্রতিক্রিয়াগুলো কী, যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে সে অতীতে কষ্টভোগ করেছে এবং বর্তমানেও কষ্টভোগ করছে? এগুলো ডাক্তারকে আগে জেনে নিতে হবে; যাতে তিনি পরিশেষে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন।

বর্তমান ফিলিস্তিন নানান সমস্যায় জর্জরিত। এই ভূখণ্ডে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে অসংখ্য ঘটনা। মিডিয়া সেগুলো প্রচার করছে।

হে প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, তার সমাধান রয়েছে আল্লাহ ﷻ-র কিতাবে এবং প্রিয় নবী ﷺ-এর হাদীসে। সাধারণ ইতিহাস, ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং সমকালীন ও পূর্ববর্তী সকল জতিসত্তার ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে আমরা পাব অসংখ্য দিকনির্দেশনা। কখনও কখনও আমি ইশারা করব ওইসব সমস্যা সমাধানের উপায়ের প্রতি, মুসলমানরা ফিলিস্তিন ও অন্যান্য স্থানে এখন যেগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে।

কিছু মানুষের ধারণা, ফিলিস্তিন ইস্যু একটি আঞ্চলিক ইস্যু এবং আমার একথাগুলো তাদের জন্যই প্রযোজ্য। এটা মেনে নিচ্ছি যে, এই ইস্যু নিয়ে অধ্যয়ন তাদেরই প্রথম কর্তব্য। কেননা, তারাই প্রতিনিয়ত নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা একটা সর্বব্যাপী বিষয়। এমন বিষয়, যা প্রত্যেক মুসলিমকে বিচলিত করে রেখেছে।

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একবার আলেকজান্দ্রিয়া শহরে একটি বিশেষ সভায় আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে আমি 'ফিলিস্তিন সংকট ও ফিলিস্তিন সংকটে মুসলমানদের করণীয়' সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন এক ভদ্র মহিলা আমার কাছে খুব শক্ত ভাষায় একটি চিরকুট লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমরা ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা করব কেন; অথচ মিসরে আমরাই এমন কত ধরণের সমস্যার সম্মুখীন, যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য। তখন উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম– ফিলিস্তিন সংকট কি মিসর ও মিসরের বাইরে সমস্ত মুসলমানের সংকট নয়?

তখন বেশ বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল!

আসলে অনেক মুসলমানই ফিলিস্তিন সংকটকে মুসলমানদের সংকট বলে মনে করেন না। তারা একে শুধু ফিলিস্তিনীদের সংকট বলে মনে করেন। এটা এমন এক সমস্যা, যা আমাদের কাছে পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। আসলে ফিলিস্তিন প্রত্যেক ওই মুসলিমের সমস্যা, যে নিজের ধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের রব তাঁর কিতাবে যা বলেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল, আমাদের হাবীব ﷺ হাদীসে যা বলেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল, ইতিহাসের ধাপে ধাপে এই উম্মতের সন্তান উলামা-সুলাহা ও মুজাহিদরা যা করেছেন, তার উপর শ্রদ্ধাশীল।

ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে অধ্যয়ন কেন?

প্রথম বিষয় হল, ফিলিস্তিন ইস্যু হচ্ছে আকিদার বিষয়। আর আকিদার বিষয় এমন, যা ছাড়া মুসলমান বেঁচে থাকতে পারে না। ইহুদীরা কেন বলে যে, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড তাদের? কারণ, এটা আকিদা-বিশ্বাসের ইস্যু। কেন ইহুদীরা ফিলিস্তিনের ভূমি আঁকড়ে ধরে আছে? কেন তারা এর বিকল্প মানতে রাজি নয়? এজন্য যে, তারা বলে– আমাদের তাওরাতে এমন নির্দেশই রয়েছে।

অথচ তাওরাত বিকৃত গ্রন্থ। তাতে রয়েছে বহু বিভ্রান্তি। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের কথা অনুসারে নিজেদের হক খামচে ধরে আছে। কাজেই ফিলিস্তিন হচ্ছে আকিদার ইস্যু। আমরাও এমনই বলি। আমাদের মতেও এটা আমাদের আকিদাগত বিষয়। কাজেই এটা আকিদার মোকাবেলায় আকিদার ব্যাপার। একদিকে বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা– যার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সমস্ত ধর্মের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন– অপরদিকে বিকৃত আকিদা। আর মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই জানে যে, তাওরাত মুসা ﷺ-এর পর বিকৃত হয়ে গেছে। এমনইভাবে ইঞ্জিলও ঈসা ﷺ-এর পর বিকৃত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থ অসংখ্য।

তবে আমরা বলি– দলিল-প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির আলোকে ফিলিস্তিন ইসলামী আকিদার বিষয়। এটা আমাদের কোনো অস্পষ্ট অমূলক দাবি নয়। আমাদের কাছে রয়েছে এমনসব দলিল-প্রমাণ, যেগুলো প্রমাণ করে যে, এটা বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত আকিদা।

আমাদের আকিদায় আছে, দুনিয়ার যেকোনো ভূখণ্ড যখন একবার ইসলামের আলোকে শাসিত হয়, তখন সেটা ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত হয়। চাই শাসনকাল সামান্য হোক। ফিলিস্তিন ইসলামের আলোকে

শাসিত হয়ে আসছে ষোল হিজরী সন থেকে। অর্থাৎ ইসলামের সূচনাকাল থেকে। কাজেই ফিলিস্তিন প্রায় চৌদ্দশ বছরেরও অধিক সময় থেকে ইসলামী ভূমি ভূখণ্ড। কিয়ামত পর্যন্ত এই ভূখণ্ড আমাদের শরীয়ত ও আকিদায় ইসলামী ভূখণ্ড হিসাবেই বিবেচিত হবে। যদিও তা কখনও কখনও ব্রিটিশ, ফরাসী অথবা ইহুদী কর্তৃক শাসিত হোক, কিংবা শাসিত হোক দুনিয়ার অন্যকোনো সাম্রাজ্যের হাতে। এবং যদিও তা কখনও কোনো কালে মুসলমানদের হাত থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। কিন্তু তখন তা ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। এটাই আমাদের আকিদা এবং এটাই আমাদের শরীয়ত। 'আল্লাহর কালিমায় কোনো পরিবর্তন নেই।'

ইসলামী ফিকহের ভাষ্যমতে, যদি কোনো ইসলামী দেশ থেকে একজন মুসলিম নারী কাফেরদের হাতে বন্দী হয়, তা হলে সেই দেশের উপর তাকে মুক্ত করে আনা ফরজ হয়ে যায়। যদি সেই দেশ তাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর উপর তাকে মুক্ত করে আনা ওয়াজিব। যদি তারাও ব্যর্থ হয়, তা হলে প্রথমে নিকটবর্তিতার ভিত্তিতে এবং এক পর্যায়ে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়।

শুধু একজন মুসলিম নারী বন্দী হলে এই মাসআলা। এই বিধান ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান রয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর সমস্ত আলেম এখানে একমত। ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো মাযহাব পাওয়া যায় না, যা এই মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছে। তা হলে আপনি সেই পূর্ণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে কী বলবেন, প্রতিনিয়ত যাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে, ঘরদোর তছনছ করা হচ্ছে, ধন-সম্পদ ছিনতাই করা হচ্ছে। তাও আবার এই তাণ্ডব এক-দুই বছর নয়; বরং চলছে যুগের পর যুগ।

ফিলিস্তিনের এই সংকট মুসলমানদেরকে বিব্রত করা বাঞ্ছনীয়। এটা দীনের অংশ। ফিলিস্তিনের মত যেকোন ভূখণ্ড অথবা আগ্রাসনের শিকার যেকোনো অঞ্চল– চাই তা ফিলিস্তিন, ইরাক, চেচনিয়া,

কাশ্মীর কিংবা দুনিয়ার যেকোনো মুসলিম ভূখণ্ড হোক– তা উদ্ধারের বিষয়ে সিথিলতা দেখায়, তা হলে দীনের এই অংশ হারিয়ে যাবে।

ফিলিস্তিনের বিষয়টি সবকিছুর উর্ধ্বে। এটা দখলকৃত সাধারণ কোনো ইসলামী ভূখণ্ড নয়, যা স্বাধীন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব; বরং এই ভূখণ্ডে আবশ্যকতা আরও গভীরে। আরও স্পর্শকাতর। কেননা, আল্লাহ ﷻ এই ভূখণ্ডে এমন অনেক উপাদান রেখেছেন, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের কাছে এই ভূখণ্ডকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছে। নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, আরব-অনারব কেউ তা অস্বীকার করে না। সব ধরণের মুসলমান বিশ্বাস করে যে, এই ভূখণ্ড পবিত্র।

আমরা সবিস্তারে প্রমাণ করব যে, এই ভূখণ্ড পবিত্র। এটা মুসলমানদের প্রথম কিবলা। মক্কা-মদীনার পর তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। এখানে রয়েছে মসজিদে আকসা। মক্কা মুকাররামার মসজিদে হারাম ও মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর পর শুধু এই মসজিদে আকসার দিকেই সওয়াব ও বরকতের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়।

কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে এ ভূখণ্ডকে বরকতময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এই ফিলিস্তিনের ইতিহাসে নিয়ে আসব এমন কিছু আয়াত, যেগুলো প্রমাণ করবে, এই ভূখণ্ড কুরআন ও হাদীসের আলোকে বরকতময় ভূখণ্ড। এ ভূমি ধন্য হয়েছে এখানে জীবন-যাপনকারী অসংখ্য সাহাবীর সোনালী পরশে; বরকতময় হয়েছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বদৌলতে; মহিমান্বিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ আর প্রলয়ঙ্কর লড়াইয়ের কারণে, যেগুলো সংঘটিত হয়েছিল ফিলিস্তিনের এই পবিত্র ভূখণ্ডে।

যেমন, আল্লাহ ﷻ ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বরকত নিশ্চিত করে দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

> আমার উম্মতের একটি দল সবসময় দীনের পথে অটল থাকবে। তারা হবে বিজয়ী। শত্রুদের পরাস্থকারী। বিরোধিতাকারীরা তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এই অবস্থায় অবিচল থাকবে, তাদের উপর আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) না আসা

পর্যন্ত। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তারা কোথায়? নবীজী বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশে।

[আহমাদ : ২২৩৭৪]

উল্লিখিত হাদীসে 'বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশে' বলে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড বোঝানো হয়েছে। এটা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর বাণী।

ইসরাইল প্রথম রাষ্ট্র যা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হওয়া উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও আযারবাইজানসহ বহু মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে অনেকগুলো ইসলামী দেশ ছিল। এ দেশগুলো জোট থেকে বের হলে ইসরাইল সবার আগে ওগুলোর সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যাতে এর অন্তরালে ইসলামী দেশগুলোকে নিজের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসতে পারে।

ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল, আমেরিকা কর্তৃক ইরাক ও আফগানিস্তান দখলের চেয়ে কিংবা রাশিয়া কর্তৃক চেচনিয়া দখল করার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। একথা বলে আমরা অন্যান্য অঞ্চলের দখল প্রক্রিয়াকে খাট করছি না। কিন্তু ফিলিস্তিন জবরদখলের রাজনীতি অন্যান্য ইসলামী ভূখণ্ডের জবরদখলের রাজনীতির চেয়ে ভিন্ন। ভিন্নতার কারণ হচ্ছে, ইহুদী আগ্রাসন হচ্ছে বসতি স্থাপনের আগ্রাসন। এটা গণ আগ্রাসন; সামরিক আগ্রাসন নয়। এমন নয় যে, খনিজ সম্পদ দখলের জন্য তারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হানা দিচ্ছে, তারপর ফিরে যাচ্ছে। আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। বরং তারা সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, কর্ম-পেশা সবকিছু নিয়ে এসে এ ভূখণ্ডে জুড়ে বসছে। এখানেই শেষ নয়; বরং তারা দেশের মূল অধিবাসীদেরকে তাড়িয়ে করে দিচ্ছে। এজন্য ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদের প্রত্যাবর্তনের যেকোনো দাবি প্রত্যাখ্যান করছে। কেননা, ফিলিস্তিনীদের ফিলিস্তিনে ফিরে আসার মানে হচ্ছে এখানে জনসংখ্যার অনুপাত বদলে যাওয়া; ইহুদীদের চেয়ে ফিলিস্তিনীদের জনসংখ্যা ভারী হওয়া, যা ইহুদী রাজনীতির পরিপন্থী। দুনিয়াতে যখন

এমন রাজনীতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন এমনসব পরিবর্তন সাধিত হয়, যা আমাদের ধারণারও অতীত।

কেন আমেরিকা আজ সৃস্তিতে জীবনাতিপাত করছে, অথচ ইতোপূর্বে এই ভূখণ্ড ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের মালিকানাধীন। রেড ইন্ডিয়ানরা শত শত বছর আগ থেকে আমেরিকাতে বসবাস করে আসছিল। এমন কিছু হয় ঘটে বসতি স্থাপনের রাজনীতির কারণে। যখন আমেরিকানরা এ ভূমি জবরদখল করে নেয়, তখন তারা এখানকার মূল অধিবাসীদেরকে হত্যা করে দেয়। কালের আবর্তে তাদের স্থান পুরোপুরি দখল করে নেয় সঙ্গে আসা ইউরোপীয়ানরা। রেড ইনিয়ানদের সেই ভূমি পরিণত হয় আমেরিকায়। আর আন্দালুস পরিণত হয় স্পেন ও পর্তুগালে। এরপর মামলা ডিসমিড হয়ে যায়।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আমরা এমন কিছু ঘটার আশঙ্কা করছি। এজন্য এখন আমরা অধ্যয়ন করব ফিলিস্তিন ইস্যু। যাতে আমরা সবাই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।

ফিলিস্তিন ইস্যু নির্বাচন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে— এ ভূখণ্ডের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আমরা জেনে নিব ইসলামী ইতিহাস পুরোটা। আগে যেমন আমরা বলেছি, ফিলিস্তিনের কাহিনী শুরু হয়েছে ১৬ হিজরী থেকে; যখন এ পবিত্র ভূখণ্ডে মুসলমানরা প্রবেশ করেছিলেন এবং ইসলামের কল্যাণে এ অঞ্চল জয় করেছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর সমস্ত ধাপ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং সমস্ত সাম্রাজ্য, যেগুলো ইসলামের আলোকে শাসন করেছে।
ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আছে উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশেষ ইতিহাস। ফিলিস্তিনের ভূমিতে আছে আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিশেষ ইতিহাস। ফিলিস্তিনে আছে জংগী ও আইয়ুবী সাম্রাজ্যের সৃতন্ত্র ইতিহাস। এমনইভাবে এখানে বিশেষ ইতিহাস রয়েছে সালজুক, মামলুক ও উসমানী সাম্রাজ্যের।

কাজেই আমরা যখন ফিলিস্তিনের ইস্যু অধ্যয়ন করব, তখন কেমন যেন আমরা ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ ঘুরে আসব। এর চেয়েও

আজব কথা হচ্ছে মানব-ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ ঘুরে আসব; শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা জেনে নিব পারস্যের ইতিহাস। এমনইভাবে রোমান, গ্রিক, অ্যাসিরিয়্যান, ব্যাবিলন ও ফারাওদের ইতিহাস। এমনকি আমরা জেনে নিব আধুনিক বিশ্বের ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানি প্রভৃতি দেশের ইতিহাসও। দুনিয়ার সব দেশের সাথে তার ইতিহাসের কোনো না কোনা পর্যায়ে এই বরকতময় ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের ইতিহাসের সাথে বোঝাপড়া রয়েছে। বললাম বরকতময়, যেমন আমাদের রব ﷻ তাঁর সম্মানিত গ্রন্থে বলেছেন।

এজন্য আল্লাহ ﷻ এ ভূখণ্ডকে মুসলমানদের কাছে দামী ও মূল্যবান এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন, রসুল ﷺ-এর ইসরার ক্ষেত্র, মুসলমানদের প্রথম কেবলা ও ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। এ ভূখণ্ডে অবস্থিত মসজিদে আকসায় সালাত আদায়ে রয়েছে পাঁচশত গুণ বেশি সওয়াব।

এসব কিছু কেন?

কারণ, আল্লাহ ﷻ জানেন, বিশ্বের সমস্ত শক্তি সত্বর একদিন এ ছোট্ট ভূখণ্ডের প্রতি লালায়িত হবে। অথচ এর আয়তন মাত্র ২৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার। তবে তা দুনিয়ার সব মানুষের কাছে খুব মূল্যবান। এজন্য আল্লাহ ﷻ এ ভূখণ্ডের ভালোবাসার বীজ বপন করেছেন মুমিনদের অন্তরে। যাতে যেকোনো সাম্রাজ্যের যেকোনো আগ্রাসন থেকে তারা এ ভূখণ্ডকে রক্ষা করেন।

ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে, যেকোনো বিষয়ের চেয়ে এই বিষয়ে বিকৃতির পরিমাণ অনেক বেশি। ইহুদীদের অধীনে রয়েছে ভয়ঙ্কর মিডিয়া শক্তি। এ মিডিয়া শক্তিকে পুঁজি করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে বিরাট বিকৃতি। এ বিকৃতির ধূম্রজাল আচ্ছন্ন করে নিয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই।

মনে রাখা দরকার যে, সর্ব শ্রেণির উপর প্রযোজ্য তথ্যশক্তির মালিক ইহুদীরা। যেমন সংবাদ সংস্থার কথাই ধরা যেতে। এখানে আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, বলুন তো, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংবাদ

সংস্থা কোনটি? সবাই বলবেন, রয়টার্স (Reuters)। এই রয়টার্স ইহুদীদের। এসোসিটেড প্রেস (Assocated Press) ইহুদীদের। ফ্রান্সের হাভাস (Havas)-ও ইহুদীদের। এমনইভাবে দ্য টাইমস (The Times), নিউজ উইক (Newsweek), ওয়াশিংটন পোস্ট (Washington Post) ও স্টার ম্যাগাজিন (Star Magazine)-সহ বহু প্রসিদ্ধ আমেরিকান সংবাদ সংস্থার সিংহভাগ শেয়ার ইহুদীদের। এমনকি বিষয়ভিত্তিক ভ্যারায়টি (Variety) পত্রিকাটিও ইহুদীদের। নির্বাচনের দিনগুলোতে তাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যাদের হাত আছে, এমন ব্যক্তিদের অভিমত ছাপা হয়। আমেরিকার চিন্তাধারার উপর যা প্রভাব বিস্তার করে। এটি যদিও একটি বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা তবুও আমেরিকান রাজনীতিতে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকা দ্য টাইমস-এর বেশিরভাগ মালিকানা রুপার্ট মারডক-এর। সে একজন ইহুদী। সিবিএস (CBS), সিএনএন (CNN), এবিসি (ABC), এনবিসি (NBC) ইত্যাদি দুনিয়ার প্রসিদ্ধ টেলিভিশন চ্যানেল। এসব চ্যানেলের মালিকানায় ইহুদীদের উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। কোনো কোনোটি পুরোপুরি ইহুদীদের মালিকানাধীন। আমেরিকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রচার সংস্থার মালিকানা ইহুদীদের।

একই অবস্থা ফিল্ম নির্মাতা সংস্থাগুলোরও। যেমন, মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার (Metro Golden Mayer) ইহুদীদের। ফক্স (Fox) (ফক্স ফিল্ম কর্পোরেশন) এবং ওয়ার্নার ব্রোস (Warner Brose)-ও ইহুদীদের।

এসব প্রযোজনা কোম্পানী যেসব ফিল্ম নির্মাণ করে, সেগুলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রভাব ফেলে। ইহুদী ও মুসলিমদের ইতিহাসে এবং মানবতার ইতিহাসে যে কোনো ধরণের বিকৃতি সাধনে সক্ষম এসব কোম্পানি।

এমনকি ডিজনি (Disney) যা শিশুদের জন্য বিভিন্ন ফিল্ম নির্মাণ করে থাকে– সেটিও এ জঘন্য কর্মে জড়িত। আমি এক প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম, যা শিক্ষার সাথে বিশ্বের পরিচয়ের কাহিনীর উপর কাজ করে– যেমন, সবার আগে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে কে? কোন দেশে শিক্ষার ধারাবাহিকতা সূচিত হয় ইত্যাদি।

এক পর্যায়ে ইসলামী যুগের পালা আসে। এটা এমন এক যুগ যা অস্বীকার করার কারও সাধ্য নেই। সকলেরই জানা আছে যে, হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী তথা খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে শুধু মুসলমানরাই শিক্ষার ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন। এই বাস্তবতা গোপন করার সাধ্য ডিজনিরও নেই। তাই ডিজনি বলতে বাধ্য হয় যে মুসলমানরাই এই ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন। কিন্তু সে মুসলমানদের সাথে আরও একটি শব্দ জুড়ে দেয়। বলে দেয়, মুসলমান ও ইহুদীরা। ডিজনি সেখানে ইহুদীদের কিছু চিত্রও প্রদর্শন করে। যেন ইহুদীরা এ ছয় শতাব্দীকাল শিক্ষার মশাল বহন করে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এ ছয় শতাব্দীতে ইহুদীরা আসে কোত্থেকে? আপনি হয়তো একজন ইহুদী চিকিৎসাবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী কিংবা ভূগোলবেত্তার নাম শুনতে পারেন। কিন্তু তাদের একজনের মোকাবেলায় হাজার হাজার মুসলিম ব্যক্তিত্ব পেয়ে যাবেন। কিন্তু এভাবেই ছয় শতাব্দীতে শিক্ষার মশাল বহনের কাফেলায় মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের জুড়ে দিয়ে প্রদর্শন করা হয়। আর শিশুরা তা দেখে। মুসলিম-অমুসলিম বয়স্করাও দেখে। এভাবে চোখের সামনে দিনের আলোতে ইতিহাস বিকৃত করা হয়। পুরো বিশ্ব তা দেখে, শোনে; কিন্তু রা করে না।

তাই আমরা এ বিষয়ে কলম ধরেছি। এখানে আমরা তুলে ধরব ফিলিস্তিনের প্রকৃত ইতিহাস। ফিলিস্তিন ও অন্যান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেসব বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, সেগুলো আমরা তুলে ধরব। আমরা জেনে নিব সেই প্রোপাগান্ডা, যার ভিত্তিতে তারা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাদের অগ্রাধিকার দাবি করে।

আমরা জানব তাওরাতের সেই বক্তব্যসমূহ, যেগুলো তাদেরকে ফিলিস্তিন প্রদান করে বলে তারা মনে করে। তাওরাতের কোনো কোনো বক্তব্য বিকৃত, আর কোনো কোনো বক্তব্য সঠিক। তাদের উল্লেখকৃত তাওরাতের বক্তব্যের জওয়াব আছে। সেগুলো নিয়ে পর্যালোচাও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সেই মিডিয়া কোথায়, যা মানুষের সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরবে? আর যে টেম্পলের কাহিনী তারা

মিডিয়ার জোরে দুনিয়াজুড়ে গেয়ে বেড়ায়, সেই কাহিনী কি বাস্তব, না কি অবাস্তব? মুসলমানরা কোথায়, যারা এসব বিকৃতি এবং সমসাময়িক অন্যান্য বিষয়ের বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে?

কিছু কিছু মুসলমান বলে থাকেন যে, ফিলিস্তিনীরা তাদের ভূখণ্ড ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। একথা কি আদৌ সঠিক? নাকি তা সেই মিথ্যা প্রোপাগান্ডারই অংশ যা ইহুদীরা যত্রতত্র ছড়িয়ে দিয়েছে! ইউরোপে যে হত্যাকাণ্ড ও বর্ণবাদের শিকার ইহুদীরা হয়েছিল বলে তারা প্রচার করে, তার যথার্থতা কোথায়? এসব বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার শিকার তারাও, যারা ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন, রজার গ্যারাউডি (Roger Garaudy)-এর কথাই ধরা যাক। তিনি একজন ফরাসি মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। যায়নবাদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণার জন্য তিনি বিখ্যাত। একই অবস্থা লন্ডনের মেয়রসহ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির, যার কথায় প্রকাশ পেয়েছে যে ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি মুসলমানদের পক্ষে। বিষয়টি মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রতিবাদের দাবি রাখে।

এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা এ গ্রন্থটি রচনা করছি। ফিলিস্তিনের ইতিহাস রচনার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য অনেক বড়।

CamScanner

প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিন

আমরা আগেই বলেছি— ফিলিস্তিনের ইতিহাস অধ্যয়ন করা নিজ ধর্মের উপর আত্মমর্যাদাবোধ লালনকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আমরা আরও বলেছি যে, ফিলিস্তিন বরকতময় ভূখণ্ড। বেশ কতগুলো কারণে আল্লাহ ﷻ এ ভূখণ্ডকে বরকত দিয়েছেন। যার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা আগে উল্লেখ করেছি। আল্লাহর তাওফীকে আরও অনেকগুলো কারণ আমরা সামনে উল্লেখ করব। আমরা বলেছি যে, এটা জাতিগত নিরাপত্তার ইস্যু; শুধু ফিলিস্তিনের নয়; বরং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর এবং পুরো মুসলিম বিশ্বের। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে উঠার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেই আমরা এসব কথা বলেছি। মুসলমানদের উচিত, এ ভূখণ্ডের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করা। এ ভূখণ্ড স্বাধীন করা তাদের দায়িত্ব। নিজের ধর্ম ও আকিদার উপর অবিচল থাকতে চায় এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা ওয়াজিব। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য সংকটের কথা ভুলে যাব। আমি সমস্ত মানুষকে আশ্বস্ত করে বলছি যে, ফিলিস্তিন সংকটের পর্যালোচনা চেচনিয়া, কাশ্মীর, আযারবাইজান, সেউটা, মালিলা ও তুর্কিস্তানসহ ওইসব ভূখণ্ডের সংকট নিয়ে পর্যালোচনার বিকল্প নয়, যেগুলো মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা আজ ওগুলোর নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সংকটগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ফিলিস্তিন ইস্যুর রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব— যা আমরা একটু আগে উল্লেখ করে এসেছি।

যদি আপনারা হিসাব আর গণনা করেন, তা হলে দেখবেন ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মাত্র আট বছরে ৫৫০০ জনেরও অধিক

শহীদের লাশ ফিলিস্তিনের মাটিতে পড়েছে। অথচ রসুল ﷺ মাত্র একটি মুসলিম প্রাণহানীর কারণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মোকাবেলায় পরিপূর্ণ এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন মুতার রণাঙ্গনে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। শামের মাটিতে যখন একজন মাত্র মুসলিম নিহত হয়, তখন রসুলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ এক বাহিনী প্রেরণ করেন। পুরো উম্মতকেই জাগিয়ে তোলেন। তা হলে আট বছরে ঝরে যাওয়া হাজার হাজার শহীদ এবং একই সময়ে লক্ষাধিক লোকের যখম হওয়া নিয়ে আপনাদের কী অভিমত? উপরন্তু প্রায় অর্ধলক্ষাধিক বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত, যেগুলো এই সময়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? ধ্বংসযজ্ঞের এই সংখ্যা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত মুসলমানকে সন্ত্রস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

এ গ্রন্থে আমাদের পন্থা একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত তা নির্ভর করবে দলিল-প্রমাণের উপর। এ গ্রন্থে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো কাহিনী বা বিবরণ উল্লেখ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হব। চাই সে বর্ণনা হোক প্রাচীন কিংবা আধুনিক ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। বানোয়াট বর্ণনাগুলোকে অবশ্যই আমরা প্রত্যাখ্যান করব। যদি কোনো বিষয়ে মুসলমানদের কোনো অধিকার থাকে, তা হলে অবশ্যই আমরা তা প্রমাণ করব। যদি ইতিহাসের কোনো ধাপে ইহুদীদেরও কোনো অধিকার থাকে, তা হলে সে সত্যও আমরা তুলে ধরব। যদি এ বিষয়ে কোনো ন্যায়পরায়ণ কোনো মন্তব্য করে থাকেন, তা হলে তা আমরা অবশ্যই আলোচনা করব; এমন কি তিনি যদি অমুসলিমও হন। আমরা অযথা কাউকে দোষারোপ করব না। আমাদের মধ্যে কোনো গালাগালি নেই। নেই কোনো ভর্ৎসনা। —ভর্ৎসনাকারী, অভিশাপকারী, কটুভাষী এবং বকওয়াসকারী প্রকৃত মুমিন নয়। [তিরমিযি: ১৯৭৭]

শেষ লক্ষে পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা দলিল-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করব। তবে আলোচনা হবে খুব সংক্ষিপ্ত। কেননা, আমরা এক জাতির দীর্ঘ সময়কালের ইতিহাস আলোচনা করছি, যা চৌদ্দ শতাব্দীরও অধিক। এ

হচ্ছে বরকতময় ভূখণ্ডের ঈমানী ইতিহাস। উপরন্তু আছে মানবতার ইতিহাস, যা আরও দীর্ঘ। কাজেই সংক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই।

আগে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি– প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা কি আবশ্যক?

কেউ কেউ শুধু ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করেন। অর্থাৎ রসুল ﷺ-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন খলিফা হয়ে পরবর্তী বিভিন্ন ইসলামী সাম্রাজ্যের ইতিহাস। তবে কয়েকটি কারণে আমি এই ভূখণ্ডের প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস অধ্যায়নও জরুরী মনে করি।

প্রথমত ফিলিস্তিন একটি ইসলামী ভূখণ্ড। প্রাক-ইসলামিক ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের আকিদা থেকে কিছুই পরিবর্তন করবে না; তবে সেখানে প্রাচীনকালের এমন কিছু দলিল-প্রমাণ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা ইহুদীদের কতিপয় দাবি খণ্ডন করতে পারব।

যখন আমার জানা থাকবে শুরুর ইতিহাস– ইবরাহীম ও ইয়াকুব ﷺ-এর ইতিহাস। দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-এর ইতিহাস। সাথে সাথে এই বরকতময় ভূখণ্ডে জীবন-যাপনকারী নবীদের ইতিহাস। ওইসব অমুসলিম জাতির ইতিহাসও, যারা এ ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল। এমনকি স্বয়ং ইহুদী ও তাদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাসও। তখন আমি অমুসলিমদের উত্থাপিত দাবিগুলো খণ্ডন করতে পারব। চাই তা উত্থাপিত হোক ইহুদীদের পক্ষ থেকে অথবা অন্য কারও থেকে।

এখানে আমি আপনাদের কাছে একটি কাহিনী বর্ণনা করছি, যা প্রমাণ করে যে, আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি নিরেট ইসলামী ইতিহাস না-ও হয়। আদী ইবনু হাতিম ﷺ ইসলাম গ্রহণের আগে রসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। রসুল ﷺ জানতেন যে, এই লোক একজন খ্রিস্টান। তবে মৌলিক খ্রিস্টবাদ ত্যাগ করে তিনি রকুসিয়া নামে অন্য একটি মতবাদ গ্রহণ করেছেন, যা খৃষ্টধর্মেরই একটি শাখা।

রসুল ﷺ আদী ইবনু হাতিমের সাথে আলোচনাকালে বলেন, তুমি কি রকুসী মতালম্বী নও?

আদী ইবনু হাতিম বলেন, অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বলেন, তুমি কি তোমার গোত্রের নেতা নও?

আদি ইবনু হাতিম বলেন, অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বলেন, তুমি কি গনীমতের সম্পদ হতে এক চতুর্থাংশ গ্রহণ কর না?[১]

আদি ইবনু হাতিম বলেন, অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বলেন, কিন্তু তোমার ধর্মে সেটা তোমার জন্য হালাল নয়!

(পরবর্তীতে এই কাহিনী নিজ মুখে বর্ণনা করার সময়) আদী ইবনু হাতিম তায়ী ﷺ বলেন, তখন আমি বিনয়াবনত হয়ে পরলাম। অর্থাৎ আদী বুঝতে পারেন ইনি (নবীজী ﷺ) তার পুরো ইতিহাসই জানেন। ফলে তিনি স্থির হয়ে মনোযাগ দিয়ে নবীজী ﷺ-এর কথা শ্রবণ করতে থাকেন। [আহমাদ : ১৯৩৮৯]

আপনি যখন কোনো ইহুদী কিংবা অন্য কাউকে দলিল-প্রমাণ ও তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য দিয়ে সম্বোধন করবেন। চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিবেন যে, এই ইতিহাস বিকৃত। তখন সে নত হতে বাধ্য হবে। কেননা, সে তখন বুঝতে পারবে, তার ইতিহাসের খুঁটিনাটি সবই আপনি জানেন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ফিলিস্তিনের ইতিহাস হচ্ছে নবীদের ইতিহাস।

এখন আমি এমন একটি কথা বলব যা শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন। প্রিয় ভাই-বোনেরা! বনী ইসরাইলের নবীদের ব্যাপারে আমরা তাদের চেয়ে বেশি হকদার। এটা আমার কথা নয়; বরং প্রিয় নবী ﷺ-এর কথা।

---

১. সে যুগে আদীর গোত্র যখন কোনো যুদ্ধে শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়ে গনীমত লাভ করত, তখন গোত্রের সরদার সেই গনীমতের এক চর্তুথাংশ নিয়ে নিত।

আবু মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন সেখানে কিছু সংখ্যক ইহুদীকে পান, যারা আশুরার দিনকে সম্মান করে। এ দিনে সিয়াম পালন করে। তখন নবী ﷺ বলেন, আমরা এ সিয়ামের অধিক হকদার। এরপর তিনি আশুরার দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। [বুখারী : ৩৯৪২]

আমরা মুসলমানরা ইহুদীদের নবীদের ব্যাপারে তাদের চেয়েও বেশি অধিকার রাখি। কেননা, ইহুদীরা তাদের নবীদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। নবীদের জীবদ্দশায়; এমনকি মৃত্যুর পরও অসংখ্য কথা ও বিকৃতির মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। তাদের মহান চরিত্রে তারা লেপন করেছে বহু গর্হিত কালিমা। এভাবে তারা বেড়িয়ে গিয়েছে নবীদের প্রকৃত আদর্শ থেকে। ইহুদীরা তাদের কোনো নবীরই আনুগত্য করেনি। এমনকি তারা অনেক নবীকে হত্যাও করেছে।

পক্ষান্তরে আমরা আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীকে সম্মান করি। যথার্থ শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি। তাদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নবীরাও রয়েছেন। দুনিয়ার সূচনা থেকে যত নবী আল্লাহ ﷻ প্রেরণ করেছেন তাদের সবার প্রতি রয়েছে আমাদের এ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। একই কথা বলেছেন রসুল ﷺ ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে। তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে আমি ঈসা ইবনু মারইয়ামের সবচেয়ে বেশি আপন। [বুখারী : ৩৪৪৩]

কাজেই খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলমানরা ঈসা ﷺ-এর বেশি আপন। এটা আমাদের ইতিহাসের বাস্তবতা। আমাদের দীনের মর্মকথা। ইহুদীরা তাদের নবীদের ব্যাপারে যা বলে, সেকথা শুনে আমরা লজ্জিত না হয়ে পারি না। যেমন, ইয়াকুব ﷺ-এর ব্যাপারে তাদের বক্তব্য।

আপনারা কি জানেন ইয়াকুব কে?

ইয়াকুবই হচ্ছেন, ইসরাইল। অতএব, ইয়াকুবের বংশধরই হচ্ছে বনী ইসরাইল। তা সত্ত্বেও দেখুন, বনী ইসরাইল ইয়াকুব ﷺ-এর ব্যাপারে কী বলে?

তারা বলে থাকে, *ইয়াকুব তাঁর বড় ভাই ইসুর কাছ থেকে বরকত চুরি করেছিলেন।* বিকৃত তাওরাতের ভাষ্য হচ্ছে– *ইসহাক ﷺ যখন ইয়াকুবের বড় ভাই ইসুকে বরকত দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ইয়াকুব এসে তার পথ রোধ করেন। ইসহাক ছিলেন অন্ধ। তিনি কিছু দেখতেন না। ইয়াকুব তাকে বিভিন্ন কৌশলে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তিনিই ইসু। তখন এই ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে ইসহাক ﷺ-এর বরকত ইয়াকুবের দিকে স্থানান্তরিত হয়।*

একথা ইহুদীরা তাদের নিজেদের বই-পত্রে প্রচার করে থাকে। ইসহাক ﷺ-এর প্রতারিত হয়েছেন, ইয়াকুব ﷺ হয়েছেন হাসির পাত্র, আর হাসির হয়েছে সে-ও, যে এই কথা পড়ে।

এগুলো কি মহাবিশ্বের রব আল্লাহর সাথে বিদ্রুপ নয়? এমন ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপারে আমাদের রব কীভাবে নীরব থাকতে পারেন? এজন্য আমরা বনী ইসরাইলের চেয়েও তাদের নবীদের বেশি আপন।

তারা বলে থাকে, ইয়াকুব ﷺ রবের সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। ভেবে দেখুন, তাদের বর্তমান তাওরাতে একথার উল্লেখ রয়েছে। আরও দুর্ভোগের বিষয় হচ্ছে তারা বলে, ইয়াকুব ﷺ রবের উপর বিজয়ী হন। রবকে পরাজিত করেন। চিন্তা করে দেখুন, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলছে ইয়াকুব ﷺ রবকে পরাজিত করেছেন। আরও লক্ষ্য করুন, তাদের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাত্রা। যখন রব হেরে গিয়ে বিপাকে পড়ে যান, তখন এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তিনি কী করেন? তিনি বলেন, *আমাকে মুক্ত করো, আমি তোমাকে বরকত দিয়ে দিব। এরপর রব বাধ্য হয়ে ইয়াকুব (ইসরাইল) ও তার বংশধরকে বরকত দিয়ে দেন।* বলুন, এটা কি কোনো বোধগম্য কথা?

অথচ আমরা বলি, আমরা এসব ইতিহাস পড়ব না! [না,] আমরা এই ভূখণ্ডের ইতিহাস পড়ব, যাতে ইহুদীদের নবীদের পবিত্রতা প্রমাণ করতে পারি। মুছে দিতে পারি সেইসব কালিমা, যেগুলো তাদের উপর ইহুদীরা লেপন করেছে। এসব কথা বিদ্যমান রয়েছে ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনায়। তাদের তাওরাতে। পুরাতন ও নতুন ভার্সনে।

ইতিহাস খুব দীর্ঘ। এজন্য আমরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ থেকে শুরু করব। ধারণা করা হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার হয়েছে ফিলিস্তিনের ভূমিতে, যা প্রায় দেড় মিলিয়ন বছরের পুরানো। সুতরাং এটা এমন এক ভূখণ্ড, যার ইতিহাস খুব দীর্ঘ। যার সূচনা প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে।

যেহেতু তখন পর্যন্ত দুনিয়াতে কোনো খনিজ পদার্থ আবিষ্কার হয়নি, তাই সবধরণের হাতিয়ার তখন তৈরি করা হত পাথর দিয়ে। এই প্রস্তরের ব্যবহারের কারণে এই যুগকে প্রস্তর যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর প্রস্তর যুগের সমস্ত বিবরণ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে পাওয়া যায়।

প্রস্তর যুগকে সাধারণত চারটি বিশেষ ধাপে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সে ধাপগুলো হচ্ছে—

প্রথম ধাপ : শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের পর্ব। এই যুগে মানুষের কোনো স্থিরতা ছিল না। আদিম মানুষ সে যুগে খাদ্যের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক স্থিতিহীন যুগ। শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে মানুষ মাঝে মাঝে কোথাও বিরতি নিত। কিছুদিন পর অন্যত্র চলে যেত।

দ্বিতীয় ধাপ : কৃষি জনপদের পর্ব। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রাচীন কৃষি জনপদের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয় ধাপ : পেশাগত কৃষি জনপদের পর্ব।

চর্তুথ ধাপ : কতিপয় গ্রন্থে এই ধাপকে ধাতুর যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। কেননা, ইতোমধ্যে তামা আবিষ্কৃত হয় এবং অনেক যন্ত্র নির্মাণে তামার ব্যবহার শুরু হয়।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে এ সবগুলো ধাপেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ বিষয়টি আমাদের পরস্পরকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে যে, কেন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে এসবকিছুর এমন সমাহার? উত্তর হচ্ছে, এটা সেই বরকতের কারণে, যার দিকে আমাদের রব তাঁর কিতাবে ইঙ্গিত করেছেন—

> আমি তাকে (ইবরাহীম) ও লূতকে মুক্তি দিয়ে প্রেরণ করলাম সেই ভূখণ্ডের দিকে, যেখানে আমি গচ্ছিত রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য বরকতের সমাহার। [সুরা আম্বিয়া : ৭১]

এ ভূখণ্ডের রয়েছে যথেষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা। এখানে সারা বছর বৃষ্টি হয়। বছর জুড়ে তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমেই তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

ফিলিস্তিন এমন একটি ভূখণ্ড, যা সারা দুনিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিন মহাদেশের সম্মিলনস্থল। এ ভূখণ্ডের কল্যাণ ও বরকত অফুরন্ত। তাই মিলিয়ন মিলিয়ন বছর যাবৎ এ ভূখণ্ডে মানুষের বসবাস।

এখন আমরা প্রস্তর যুগের উপর কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরব। ফিলিস্তিনে আবিষ্কৃত হয় দুনিয়ার সর্বপ্রথম নগর। ফিলিস্তিন সেই ভূখণ্ড, যেখানে মানুষ নগর নির্মাণের জন্য প্রথম সমবেত হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম সহস্রাব্দে। তা হচ্ছে আমাদের সবার পরিচিত নগর আরিহা। আরিহা হচ্ছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম নগর।

প্রস্তর যুগে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের মূল অজ্ঞাত। এ যুগের সময়কাল হচ্ছে প্রাচীণ কাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত। এই ধাপের শেষে দুনিয়াতে সাধিত হয় বিরাট উন্নয়ন। তা হল লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। এর মাধ্যমে মানুষ প্রবেশ করে ইতিহাসোত্তর যুগে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হল লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের আগের যুগ। সে যুগের সবকিছু প্রত্নতত্ত্ব নির্ভর। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ সহস্রাধিক বছর আগে মানুষ লিখতে শিখেছিল। তখন থেকে আমরা দুনিয়ার মানুষ সম্পর্কে অনেক তথ্য পেতে শুরু করেছি।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালের পর আমরা ব্রোঞ্জ যুগ বলে পরিচিত এক যুগে প্রবেশ করি। এই যুগে মানুষ টিন আবিষ্কার করে এবং তার সাথে তামা মেশালে ব্রোঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। ব্রোঞ্জ উদ্ভাবনের পর মানুষ প্রচুর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে থাকে।

CamScanner

ব্রোঞ্জ যুগের প্রতিটি ধাপ ফিলিস্তিনে দৃশ্যমান। ব্রোঞ্জ যুগকে মূলত ৩টি ধাপে বিভক্ত করা হয়। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ ও আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ। অর্থাৎ প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগের সময়কাল প্রায় ১২০০ বছর। এই ধাপে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ যুগে যারা ফিলিস্তিনের বাসিন্দা ছিল, তাদের মূল পরিচয় ও বৈশিষ্ট জানা। এই পরিচয় প্রমাণ করবে ইহুদীদের অসংখ্য দাবির অসাড়তা।

ইহুদীরা তাদের মিডিয়া ব্যবহার করে যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র প্রচার করে যাচ্ছে যে, তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম বাসিন্দা। এবং তারা এ ভূখণ্ড প্রথম আবাদ করেছে। আর বসবাসের দিক থেকে অগ্রবর্তী বলে তারা মানুষের কাছে দাবি করে যে, এই ভূখণ্ডের তারা বেশি হকদার।

আমরা বলব, আসুন, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি ঘেঁটে দেখা যাক। ফারাও ও ব্যাবিলনদের নথিপত্র অনুসন্ধান করা যাক। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপাসনালয় ও গুহা থেকে আবিষ্কৃত দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যাক। দেখে নেওয়া যাক প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগে কারা ছিল ফিলিস্তিনের অধিবাসী।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম বাসিন্দা হচ্ছে কেনানী জনগোষ্ঠী। কেনানী সম্প্রদায়ের প্রতিটি শাখা আরব বংশোদ্ভূত। আরব উপদ্বীপ থেকে তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হিজরত করেছিল। অধিকাংশ মানুষই এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নয় যে, আরবরা হচ্ছে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম ও প্রাচীন অধিবাসী। যারা আরব উপদ্বীপ হতে হিজরত করে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল।

এসব আরব ছিল মূর্তিপূজক। তারা কোনো ধর্মেরই অনুসারী ছিল না। আমরা তাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হই না। তবে আমরা ইহুদীদের ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করি। কেনানীদের নিয়ে আমরা গর্ববোধও করি না। যেহেতু তারা মহাপরাক্রমশালী

আল্লাহর এবাদত করত না। তবে আমরা প্রমাণ করব যে, তারাই ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রথম আদি বাসিন্দা। যাতে ইহুদীরা জেনে নেয়, তারা যেসব বর্ণনা প্রচার করে তা নিতান্তই মিথ্যা।

এমনকি খোদ ইহুদীরাও তাদের বিকৃত ও বানোয়াট তাওরাতে স্বীকার করে যে, কেনানী সম্প্রদায়ই ইহুদীদের আগে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল। এখানে তাদের কথার মধ্যে রয়েছে সংঘর্ষ।

ইহুদীরা তাওরাতে দাবি করে যে, আল্লাহ ﷻ কেনানীদের এই ভূখণ্ড ইহুদীদেরকে দান করেছেন। সেখানে তারা এই ভূখণ্ডকে কেনানীদের ভূখণ্ড বলেই উল্লেখ করেছে। অতএব, তারাও এ সত্য জানে যে, কেনানীরা ইহুদীদেরও আগে এই ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল।

কেনানীরা ফিলিস্তিনে গড়ে তুলেছিল দুই শতাধিক শহর। যেমন, নাবলুস, বাইসান, আসকালান, আক্কা, হাইফা, বির আল-সাবা ও বাইতুল লাহম (বেথেলহেম) প্রভৃতি। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে কেনানীরা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। অর্থাৎ ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আসার ১৪০০ বছর আগে।

ফিলিস্তিনের ভূমিতে বসবাসকারী আরও একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তারা হল ফিনিশিয়ান সম্প্রদায়। অবশ্য ফিনিশিয়ানরা আরব কেনানীদেরই একটি শাখা। প্রাচীনকালে তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী উত্তর ফিলিস্তিনীয় অঞ্চলে বসবাস করেছে। ইতিহাসখ্যাত সেই প্রসিদ্ধ ফিনিশিয়ান সভ্যতা তাদেরই অবদান।

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরও একটি জনগোষ্ঠী হল আমোরীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ও আরব বংশোদ্ভূত। তাদের মধ্য থেকে আবির্ভাব হয় 'হেকসোস' সম্প্রদায়ের। যারা পরবর্তীতে মিসর, ফিলিস্তিন ও শামের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল।

আমোরীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কীর্তি হচ্ছে আল-কুদস শহরের গোড়াপত্তন। তারা এ শহরকে প্রথমে 'উরসালিম' নাম দেয়। পরবর্তীতে তা 'উরশালীম' এ রূপান্তরিত হয়। বর্তমান ইহুদীরা শহরটির এই নামই ব্যবহার করে থাকে।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাসকারী আরও একটি সম্প্রদায় রয়েছে। এ সম্প্রদায় ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আগমনকারী সর্বশেষ জনগোষ্ঠী। যারা এই সময়কালে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি; বরং কয়েকশ বছর পর প্রবেশ করেছে। তারা হচ্ছে ব্লেস্ট জনগোষ্ঠী। ভূমধ্য সাগরের ক্রিট দ্বীপ থেকে আগত একটি জনগোষ্ঠী। ক্রিট দ্বীপ থেকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে তারা মিসরীদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তবে ফারাও সম্রাট তৃতীয় রামসিস তাদেরকে প্রতিরোধ করেন। অবশেষে এ মর্মে সন্ধি হয় যে, ব্লেস্ট সম্প্রদায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাস করবে। এ ব্লেস্ট গোত্রই বর্তমান ফিলিস্তিনকে প্যালেস্টাইন (Palestine) নাম দেয়। তবে এরাও ইহুদী ছিল না।

এ হল প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ। এ যুগের ঐতিহাসিক তথ্যাবলি সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেনি যে, আরবরাই হচ্ছে ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা। আরব হিসাবে আমরা একথা বলছি না। ফিলিস্তিন নিজেদের দাবি করেও একথা বলছি না; বরং আমরা ইহুদীদের দাবি– তারাই সবার আগে ফিলিস্তিনে বসবাস করেছিল– প্রত্যাখ্যান করার জন্য বলছি। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মুসলমানদের অগ্রাধিকার এজন্য নয় যে, আরবরা এখানকার প্রথম বাসিন্দা। তারা তো ছিল মূর্তিপূজক। বরং এজন্য যে, ইসলাম এ ভূখণ্ড শাসন করে আসছে ১৬ হিজরী থেকে। তখন থেকেই ফিলিস্তিন ইসলামী ভূখণ্ড।

এখন দেখা যাক, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মধ্যব্রোঞ্জ যুগে কী ঘটে?

এই ভূখণ্ডে ইবরাহীম ﷺ-এর ইতিহাস কী?

কীভাবে তিনি এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইবরাহীম ﷺ-এর সন্তানদের ইতিহাস কী?

ইহুদীরা কখন এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করে?

মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে ফিলিস্তিন

প্রস্তর যুগ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিয়ে বের হয়ে এসেছি। যেমন, দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত নগর হচ্ছে ফিলিস্তিনের আরিহা। খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে যার গোড়াপত্তন হয়। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম মানুষের প্রবেশ ঘটে দেড় মিলিয়ন বছর আগে। আমরা জেনেছি, প্রস্তর যুগে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যেসব জনগোষ্ঠী বসবাস করত, তাদের মূল অজ্ঞাত।

এরপর আমরা প্রবেশ করেছি ব্রোঞ্জ যুগে। ব্রোঞ্জ যুগকে আমরা তিনটি বিশেষ ধাপে বিভক্ত করেছি। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ, আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এ আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওইসব জনগোষ্ঠীর আলোচনা, যারা লিখন-রীতির যুগে বা ইতিহাসের যুগে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল। আমরা ফিলিস্তিনের সেই জনগোষ্ঠীর কথাও আলোচনা করেছি, যারা এই ভূখণ্ডের নামকরণ করে। তারা হচ্ছে ব্লেস্ট জনগোষ্ঠী।

এরপর আসে মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ, যা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ইতিহাসের ৪৫০ বছরের একটি ধাপ। এই যুগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগ। কেননা, এটাই প্রথম যুগ, যখন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড আল্লাহর একত্ববাদ প্রত্যক্ষ করে। আগে এ ভূখণ্ড ছিল মূর্তিপূজার লীলাভূমি। কেনানী ও ফিনিশিয়ানরা

ছিল মূর্তিপূজক সম্প্রদায়। কিন্তু তাওহীদের সূচনা, আল্লাহ ﷻ-এর পরিচয়, এবাদতের পদ্ধতি কী, সঠিক পন্থায় শরয়ী জীবনধারা কেমন হয়ে থাকে– এসবকিছু ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড প্রত্যক্ষ করে তখন, ইবরাহীম ﷺ যখন তার মূল জন্মভূমি ইরাক থেকে হিজরত করে এ ভূখণ্ডে আগমন করেন।

ইবরাহীম ﷺ হচ্ছেন নবীদের পিতা। ইরাকের উর শহরে তিনি প্রেরিত হন। এখানে দীর্ঘ সময় বসবাস করেন। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দোআ করেন। এই শহরে তাঁর ও বাদশাহ নমরূদের মধ্যে সংঘটিত হয় বাদানুবাদ ও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের ঘটনা। এরপর আল্লাহ ﷻ ইবরাহীম ﷺ-কে মুক্তি দেন। যা খুব প্রসিদ্ধ ঘটনা। এরপর আল্লাহ ﷻ তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন–

> আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ও লুতকে মুক্তি দিলাম। প্রেরণ করলাম এমন ভূখণ্ডে, যাতে আমি বরকত দিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য। [সুরা আম্বিয়া : ৭১]

যেই ভূখণ্ডে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন, তা হচ্ছে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড। ইবরাহীম ﷺ ইরাকের উর থেকে ফিলিস্তিনের শাকিন নামের এক গ্রামে হিজরত করেন। সেটা ছিল নাবলুস শহরের কাছে, যা শাকিনেরও কয়েকশ বছর আগে কেনানীদের হাতে স্থাপিত হয়েছিল।

ইবরাহীম ﷺ শাকিন বা নাবলুস-এর বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু তিনি এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এই সুবাদে তিনি আল-কুদস ও বেথেলহেম প্রভৃতি শহরে গমন করেন। ওই সময় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড শাসন করত হেকসোস সম্প্রদায়। হেকসোসরা ছিল আমোরীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যারা প্রায় ২০০ বছর ফিলিস্তিন শাসন করেছিল। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ২০৭ বছর। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭৪ থেকে ১৫৬৭ সাল পর্যন্ত। এক পর্যায়ে ফিলিস্তিন থেকে তারা শাম দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তারা মিসর দখল করে। এ সময় ইবরাহীম ﷺ ফিলিস্তিনে বসবাস করেন।

হেকসোস সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্য মিসর ও ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের দাওয়াতের পথ সুগম করেছিল, তা হল

তাদের সাম্রাজ্যের ধর্মীয় স্বাধীনতা। হেকসোসদের সাম্রাজ্যে নির্দিষ্ট কোনো ইলাহের উপাসনার জন্য জবরদস্তি ছিল না। তারা ছিল মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠী। তবে নির্দিষ্ট কোনো ইলাহের উপাসনাতে তাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা ছিল না। তারা ইবরাহীম ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। কোনো প্রকারের বাধা-বিঘ্ন, জুলুম-অত্যাচার ছিল না। যেগুলো ইরাকের ভূখণ্ডে ইবরাহীম ﷺ-কে ভোগ করতে হয়েছিল। ফলে ইবরাহীম ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বাধা-বিপত্তিহীন স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করেন।

ইবরাহীম ﷺ-এর সন্তান লাভের ক্ষেত্রে বিলম্বের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। এরপর তার উপর মিসর হিজরত করার নির্দেশ হয়। মিসর হিজরতকালে সেখানকার শাসকশ্রেণির সাথে সেই বিড়ম্বনার ঘটনা ঘটে। হেকসোস সম্প্রদায় তখনও মিসরের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি। ইবরাহীম ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে এসেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালে। অর্থাৎ হেকসোসদের মিসর প্রবেশের ১০০ বছর আগে। তবে ইবরাহীম ﷺ দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে তিনি বয়স পেয়েছিলেন ১৭৫ বছর। শেষ জীবনে তিনি মিসর হিজরত করেন এবং হাজেরাকে নিয়ে ফিরে আসেন। হাজেরা ছিলেন একজন মিসরী রাজকন্যা।

ইবরাহীম ﷺ হাজেরাকে বিয়ে করেন। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাদের থেকে জন্ম হয় ইসমাঈল ﷺ-এর। এরপর ইবরাহীম ﷺ পুত্র ইসমাঈল ও তদীয় মাতা হাজেরাকে নিয়ে আরব উপদ্বীপের এক জনমানবহীন ভূমিতে হিজরত করেন। ইবরাহীম ﷺ-কে তাঁর রব হিজরতের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তা হল মক্কা মুকাররামা। এ সময় মক্কার ভূমিতে সংঘটিত হয় সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা।

এই কাহিনী থেকে যে কথার সাক্ষ্য পাই, তা হল ইসমাঈল ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের সাথে আমাদের নবী ﷺ-এর রয়েছে শিকড়ের সম্পর্ক। ফিলিস্তিনের বরকতময় ভূমির জন্য এসম্পর্ক খুবই সম্মানের।

এমনইভাবে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে সাইয়্যিদা সারার গর্ভে ইবরাহীম ﷺ-এর আরেক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন ইসহাক ﷺ। এটা ছিল ইসমাঈল ﷺ-এর জন্মের ১৩ বছর পরের ঘটনা। ইসহাক ﷺ-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াকুব ﷺ। ইবরাহীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াকুব ﷺ-এর জন্ম হয়। এর প্রমাণ হল কুরআনে বর্ণিত সাইয়্যিদা সারাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রদান। *আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের। ইসহাকের পরই ইয়াকুব।* [সুরা হুদ : ৭১] ইসহাক ও ইয়াকুব ﷺ-এর সুসংবাদ ছিল সারা ও ইবরাহীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়।

ইয়াকুব ﷺ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ সালে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাহিনী খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ফিলিস্তিনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। ইয়াকুব ﷺ-এর কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে আমরা আরও কিছু সময় নিব ইবরাহীম ﷺ-এর সাথে।

ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম– সবাই ইবরাহীম ﷺ-কে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। সবাই তাকে নিজেদের দাবি করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ইবরাহীম ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া নিয়ে গর্ববোধ করে। তবে আমরা মুসলমানরা ইবরাহীম ﷺ-এর বেশি আপন। যদিও ইহুদী-খ্রিস্টানরাও এমনই দাবি করে। কুরআন মাজীদের সুরা আলে ইমরান-এ আমাদের রব এই মামলার মীমাংসা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

> হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? [সুরা আলে ইমরান : ৬৫]

অর্থাৎ কীভাবে তোমরা দাবি কর যে, তিনি ইহুদী ছিলেন, অথচ ইহুদী ধর্ম এসেছে মুসা ﷺ-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর। ইবরাহীম ﷺ-এর কয়েকশ বছর পর ছিল মুসা ﷺ-এর আগমন!

আর কীভাবে তোমরা বল, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন? অথচ ইবরাহীম ﷺ-এর মৃত্যুর এক হাজার সাতশ বছর পর ইসা ﷺ-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছে! তোমাদের কি বিবেক-বুদ্ধি নেই?

> শোনো! ইতোপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? [সুরা আলে ইমরান : ৬৬]

এরপর চূড়ান্ত মীমাংসা করে বলেন–

> ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন হানীফ (অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্ম থেকে বিমুখ) এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। [সুরা আলে ইমরান : ৬৭]

এরপর বলেন–

> মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম– আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। [সুরা আলে ইমরান : ৬৮]

অর্থাৎ ইবরাহীম ﷺ-এর অনুসরণ কথা, প্রজন্ম ও বংশ দিয়ে নয়; বরং তার অনুসারী হওয়া যাবে তাঁর আনা দীনে হানীফের অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ ﷻ, পরকাল, নবী-রসুল ও আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশুদ্ধ আকিদা পোষণের মধ্য দিয়ে। এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা ও বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা আবশ্যক তার জন্য, যে নিজেকে ইবরাহীম ﷺ-এর অনুসারী দাবি করে। অথবা দাবি করে তাঁর নিকটজন হওয়ার।

ইসরাইল তথা ইয়াকুব ﷺ ইহুদীদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও কেন ইহুদীরা ইবরাহীম ﷺ-কে অবলম্বন করে? তাদের পিতা ইয়াকুব ﷺ তো ইবরাহীম ﷺ-এর পরে আগমন করেছিলেন!

বিকৃত তাওরাতের ভাষ্যমতে, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড এবং বৃহত্তর ইসরাইল যাকে দেওয়া হয়েছে– তিনি ইবরাহীম ﷺ ও তার বংশধর। বিকৃত তাওরাতে ইহুদীরা বলে– *হে ইবরাহীম! আপনার বংশধরকে দেওয়া হল এ ভূখণ্ড। মিসরের নদী থেকে ফুরাতের বড় নদী পর্যন্ত।*

অর্থাৎ তাদের ভাষ্যমতে আল্লাহ ﷻ নীল নদ ও ফুরাত নদীর মধ্যকার ভূখণ্ড ইবরাহীম عليه السلام ও তার বংশধরদের দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করে বলি–

প্রথমত : বর্তমান তাওরাত একটি বিকৃত গ্রন্থ।

দ্বিতীয়ত : যদি এই শ্লোক সঠিকও হয় তা হলে ইবরাহীম عليه السلام-এর বংশধর ইসহাক, ইয়াকুব ও ইসমাঈল عليه السلام। এবং ইসমাঈলের পরবর্তী বংশধর মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত।

তৃতীয়ত : এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান যুগে যেসব ইহুদী রয়েছে, তাদের অধিকাংশই না ইয়াকুব عليه السلام-এর বংশের, আর না ইবরাহীম عليه السلام-এর বংশের। তারা হচ্ছে খাযার ইহুদী (Zewish Khazars)।[২] খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তারা ইহুদীবাদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইয়াকুব عليه السلام-এর বহু শতাব্দী পর। অতএব, তাদের মূল ইবরাহীম ও

---

২. খাযার সম্প্রদায় একটি নন-সেমিটিক জনগোষ্ঠী। সেমিটিক বনী ইসরাইলের সাথে তাদের বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই। এ বৃহত্তর খাযার সম্প্রদায় ইউরোপ ও সেন্ট্রাল এশিয়া জুড়ে খাযারিয়া সাম্রাজ্য নামে এক বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তাদের পুরো সম্প্রদায় বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। খাযারদের কিছু সংখ্যক লোক খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এ খাযার ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হাত ধরেই আত্মপ্রকাশ করে জায়নিস্ট মুভমেন্ট। এই সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান খাযার ইহুদীদের সাথে বাদামি চামড়ার সেমিটিক ইহুদীদের কোনো সাদৃশ্যই নেই।
এক পর্যায়ে খাযাররা তাদের খাযারিয়া সাম্রাজ্য থেকে বেড়িয়ে পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ি জমায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। বিস্ময়করভাবে তারা পাশ্চাত্য থেকে ধর্মকে ছাটাই করে গড়ে তোলে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা। আধুনিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুই তারা কুক্ষিগত করে রেখেছে। যায়নবাদী খাযার ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্র ও নীল নকশারই ফসল আজকের ইসরাইল রাষ্ট্র। ইউরোপীয়ান খাযার ইহুদিদের হাতেই ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা। চলমান নাশকতা, ধ্বংসযজ্ঞ, ফিতনা-ফাসাদ ও সকল অমানবিকতার মূল চাবিকাঠি এরাই নাড়ে। আর সংখ্যালঘু সেমিটিক ইহুদিরা বর্তমান ইসরাইলের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাদের সংখ্যা শতকারা ১০% এরও কম। –অনুবাদক

ইয়াকুব عليه السلام-এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই যদি তাওরাতের এই শ্লোক সঠিকও হয়, তবুও এ ভূখণ্ড ইহুদীদের নেওয়া বৈধ হবে না। কেননা, তা বিশেষ বংশধরকে দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলব, আল্লাহ ﷻ ইমামত দিয়েছেন ইবরাহীম عليه السلام-এর বংশের নেককারদেরকে; জালেমদেরকে নয়। আল্লাহ ﷻ ইবরাহীমের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন–

> যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, এবং তিনি সেগুলো পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। [সুরা বাকারা :১২৪]

অতএব, যারা জুলুম করে, সত্যকে বিকৃত করে মিথ্যায় রূপান্তর করে– এ ভূখণ্ডে তাদের কোনো হক নেই। কেননা, এই ইমামত আল্লাহ ﷻ শুধু নেককার বান্দাদের দিয়েছেন।

আমরা ইবরাহীম عليه السلام-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। কীভাবে ইসমাঈল عليه السلام-এর জন্ম হয়। এরপর ইসহাক عليه السلام-এর। তারপর ইসহাক عليه السلام-এর ঔরসে ইয়াকুব عليه السلام-এর। আমরা প্রমাণ করেছি যে, ইবরাহীম عليه السلام-এর ঘনিষ্ঠ তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন, মুসলমান, নবী-রসুল ও নেককার বান্দারা। শেষ নবী, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ হলেন পুরো মানবসমাজের মধ্যে ইবরাহীম عليه السلام-এর অধিক ঘনিষ্ঠতম।

এখন আমরা জানব ইবরাহীম عليه السلام-এর জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ এক অংশ। তা হল আল্লাহ ﷻ তাঁকে একাধিকবার হেজাযের ভূমিতে হিজরত করার নির্দেশ দেন। প্রথম হিজরত ছিল সাইয়্যিদা হাজেরা ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল عليه السلام-কে সাথে নিয়ে। তিনি তাদেরকে মক্কার ভূখণ্ডে রেখে আসেন। যে ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা।

ইসমাঈল عليه السلام সেখানেই লালিত-পালিত হন এবং বেড়ে ওঠেন। ইবরাহীম عليه السلام তাদেরকে সেখানে রেখে চলে আসেন ফিলিস্তিনের

ভূখণ্ডে। এর কিছুকাল পর আমাদের রব আবার তাঁকে মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। বাইতুল্লাহর বুনিয়াদ স্থাপনের জন্য। যা খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা। আমাদের রব ﷻ বলেন—

> স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল, পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা : ১২৭]

কাজেই ইবরাহীম ﵇ আবার মক্কায় গমন করেন। বাইতুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেন এবং কাবা স্থাপিত হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি আমাদের অনেকের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সেটা কাবার সূত্রের সাথে গ্রথিত। তা হল ফিলিস্তিনের আল-কুদস শহরে মসজিদে আকসা নির্মাণ নিয়ে। মসজিদে আকসা কে নির্মাণ করেছিলেন? কখন নির্মিত হয়? আকসা নামে কেন ডাকা হয়?

আরবরা এর নাম দিয়েছে আল-মাসজিদুল আকসা। কেননা, এটা আরব উপদ্বীপ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, যেখানে আল্লাহ ﷻ-র উপাসনা করা হত। মক্কা মুকাররামা থেকে অনেক দূরে হওয়াতেই আরবরা একে মসজিদে আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) নাম প্রদান করে। আর এই নামই সুরক্ষিত হয়ে যায়। এমন কি আমাদের রব ﷻ তাঁর কিতাবে এই নামই উল্লেখ করেছেন—

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। [সুরা বনী-ইসরাঈল : ১]

দ্বিতীয় প্রশ্ন মসজিদে আকসা কে নির্মাণ করেছিলেন?

এ বিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। বিষয়টি সহজ করার জন্য আমি বলব, আকসা মসজিদের মূল নির্মাতা আদম ﵇। খানায়ে কাবারও নির্মাতা আদম ﵇। আগে তিনি কাবা নির্মাণ করেন, তারপর নির্মাণ করেন মসজিদে আকসা। এ বিষয়ে আবু যার ؓ রসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আবু যার ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! দুনিয়াতে নির্মিত প্রথম মসজিদ কোনটি? রসুল ﷺ বলেন, মসজিদে হারাম। আবু যার ؓ বলেন, আমি জানতে চাইলাম এরপর কোনটি? তিনি বলেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদ নির্মাণের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন, ৪০ বছর। [বুখারী : ৩৪২৫]

দুনিয়ার সব মুসলমানের কাছে দুটি পবিত্র মসজিদ ও পবিত্র স্থানের মধ্যে এটা সুস্পষ্ট বন্ধন। খুব শক্তিশালী বন্ধন। আদম ﵇ প্রথমে কাবা ঘর নির্মাণ করেন। এর ৪০ বছর পর নির্মাণ করেন মসজিদে আকসা। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত। এমতানুযায়ী ইবরাহীম ﵇ যখন বাইতুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেন, তখন বাইতুল্লাহর বুনিয়াদ মজুদ ছিল। তবে কালের আবর্তন ও যুগের ঘূর্ণিপাকে কাবা ঘর ক্ষতিগ্রস্থ ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তার নিদর্শন মুছে গিয়েছিল। শুধু পুরানো ভিত্তি বাকি ছিল। যেমন, আমাদের রব উল্লেখ করেছেন—

> স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। .... [সুরা বাকারা : ১২৭]

তা হলে ইবরাহীম ﵇ বাইতুল্লাহ নবায়ন এবং তা পূনঃনির্মাণ করে থাকবেন।

যদি আমরা ধরে নিই যে, ইবরাহীম ﵇-ই কাবা ঘরের প্রথম নির্মাতা; আদম ﵇ নন। তখন মসজিদে আকসার নির্মাতা হবেন ইয়াকুব ﵇। বাইতুল্লাহ নির্মাণের ৪০ বছর পর যা নির্মিত হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, সুলাইমান ﵇ আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

> আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ؓ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন— যখন সুলাইমান ইবনু দাউদ ﵇ বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শেষ করেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি আর্জি পেশ করেন...। [ইবনু মাজা : ১১৫৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর নবী সুলাইমান ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। সেটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের মসজিদে আকসা। এখান থেকে ধারণা করা হয়, সুলাইমান ﷺ সেই ভিত্তি নবায়ন করেন, যা আদম ﷺ নির্মাণ করেছিলেন বা আদম ﷺ-এর পরবর্তীতে ইয়াকুব ﷺ নির্মাণ করেছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় দাউদ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ শুরু করেছিলেন এবং সুলাইমান ﷺ তা সমাপ্ত করেন।

এসব কাহিনী যা প্রমাণ করে, তা হল মসজিদে হারামের নির্মাতা আল্লাহর নবীদের মধ্য থেকে এক নবী। তেমনইভাবে মসজিদে আকসার নির্মাতাও আল্লাহর নবীদের মধ্য থেকে কোনো এক নবী। উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল চল্লিশ বছর। এভাবে মসজিদে হারাম আর ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসার মধ্যে রয়েছে এক দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

ইয়াকুব ﷺ-ই হলেন ইসরাইল। তাওরাত বর্ণিত ইসরাইলই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইয়াকুব ﷺ। বনী ইসরাইল হল ইয়াকুব ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবরাহীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াকুব ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি এক দূরবর্তী এলাকায় হিজরত করেন। বলা হয়, তা হল হাররান। যা বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানেই তিনি জীবন-যাপন করতে থাকেন। হাররানে তার ঔরসে এগারো জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনায় যাদের আলোচনা এসেছে। এরপর তিনি নতুন করে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে হিজরত করেন। ইউসুফ ﷺ-এর মিসর যাওয়ার পর ইয়াকুব ﷺ-এর দ্বাদশ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি বিনইয়ামিন। যা আমাদের সকলেরই জানা।

ইউসুফ ﷺ-কে তার ভাইয়েরা কূপে ফেলে দেয়। এরপর তাকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মিসরে তার দীর্ঘ সময় কেঁটে যায়। মিসরের ভূখণ্ডে কষ্ট, দুর্ভোগ ও কারা-জীবনের বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে এক পর্যায়ে তিনি মন্ত্রিত্বের পদ লাভ করেন।

এরপর ইয়াকুব ﷺ ও তাঁর সন্তানদেরকে তিনি মিসরে ডেকে পাঠান। ইয়াকুব ﷺ, তাঁর এগারো জন সন্তান, সন্তানদের স্ত্রী ও নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে মিসরে চলে আসেন।

কথিত আছে, ইয়াকুব ﷺ-এর সাথে তাঁর পরিবারের যারা মিসর ভূখণ্ডে গমন করেন, তাদের সংখ্যা ছিল নারী-পুরুষ মিলিয়ে ৭২ জন। ইয়াকুব ﷺ-এর এগারো সন্তান এর পর থেকে মিসরেই বসবাস করতে থাকেন। এরাই হলেন সেই বংশধর যারা ইহুদী কাহিনীর মূল হিসাবে বিবেচিত।

আমি বলব, ইয়াকুব ﷺ যখন মিসরে ইউসুফ ﷺ-এর কাছে গমন করেন, তখন ছিল হেকসোসদের আমল। সেটা ফারাওদের আমল ছিল না। তখন মিসরের ভূখণ্ড ছিল হেকসোসদের দখলে। আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হেকসোসদের সাম্রাজ্যে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। তারা ইউসুফ ﷺ, ইয়াকুব ﷺ ও তাঁর সন্তানদেরকে তাওহীদের পথে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া দীনী জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, কুরআন মানব-ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা কুরআনের এক বিস্ময়। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউসুফ ﷺ-এর সময়কার মিসরের শাসক ছিলেন আযীয। কুরআন তাকে ফেরাউন বলেনি। কেননা, তখন ফারাও সম্রাটরা মিসরের শাসনক্ষমতায় ছিল না। মিসর তখন ছিল হেকসোসদের শাসনাধীন।

কুরআনে বলা হয়েছে—

> তারা বলল, হে আযীয! তার একজন অতিশয় বৃদ্ধ পিতা আছে। তার স্থানে আমাদের কাউকে রাখুন। আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা ইউসুফ : ৭৮]

কুরআনে এরূপ বর্ণনা একাধিক জায়গায় এসেছে। আযীয ছিলেন তৎকালীন হেকসোস সম্রাট।

ইউসুফ ﷺ ও তাঁর ভাইয়েরা দীর্ঘকাল মিসরে বসবাস করেন। বর্ণিত আছে, ইউসুফ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ তথা বনী ইসরাইলের এগারো গোত্র প্রায় ১৫০ বছর মিসরে বসবাস করেন। এ দীর্ঘ সময়ে সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না। তারা ছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর একত্ববাদের ঘোষক। সেই দীর্ঘ সময় তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে কোনো তাওরাত ছিল না; ছিল না কোনো ইহুদীবাদ। তারা ছিলেন তাওহীদের উপর অবিচল।

এক পর্যায়ে সম্রাট প্রথম আহমোস-এর হাতে হেকসোসদের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের পর হেকসোসরা মিসরের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়। মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ফারাওরা। প্রথম আহমোস থেকে শুরু হয়ে অন্যান্য ফেরাউন ক্ষমতায় বসে। এ পর্যায়ে মিসরের ভূখণ্ডে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফারাও সম্রাটরা ধারণা করত যে, এসব বনী ইসরাইল হেকসোসদের সহযোগী। ফলে মিসরের ভূখণ্ডে তাদের উপর নেমে আসে নির্মম জুলুম-অত্যাচার। প্রায় ৩০০ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাইলের উপর ফারাও সম্রাটদের এ নির্মম অত্যাচার চলতে থাকে। এ সময়ে বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে দেখা দেয় ব্যাপক পরিবর্তন। তাদেরকে সেই স্বভাবে নিয়ে আসে যে স্বভাবে আজ আমরা তাদেরকে চিনি। তাদের এ উদ্ভট স্বভাব আর চরিত্র পাল্টে দিয়েছে ইতিহাসের অনেক গতিধারা।

কীভাবে ফারাওরা বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রের এ দশা করে?

বনী ইসরাইলের পক্ষ থেকে এর জওয়াব কী?

কখন মুসা ﷺ প্রেরিত হন? মিসরের তৎকালীন ফেরাউনের সাথে তার কী ঘটেছিল?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মুসা ﷺ-এর পরবর্তী ইতিহাস কী?

ফারাও শাসকবর্গ ও বনী ইসরাইল

আগে আমরা ইয়াকুব ﷺ-এর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। যখন তিনি পুত্র ইউসুফ ﷺ-এর আহ্বানে মিসরে হিজরত করেন; তাঁর সাথে তাঁর সন্তানাদি, নাতি-নাতনীসহ পুরো পরিবার ছিল। এভাবেই মিসরের ভূখণ্ডে বনী ইসরাইলের আগমন ঘটে। তারা প্রায় ১৫০ বছর হেকসোস শাসকদের অধীনে বসবাস করেন। হেকসোসদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা। দেশের অভ্যন্তরে ইয়াকুব ﷺ ও তাঁর সন্তানরা কোনো বাঁধা-বিঘ্ন ছাড়া তাওহীদের বাণী প্রচার করতে পারতেন। তখন তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর অবিচল ছিলেন।

কিন্তু ইয়াকুব ﷺ-এর সন্তানদের মিসর গমনের ১৫০ বছর পর ফারাওরা হেকসোসদের পরাজিত করে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সময়টি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ সাল। ফারাও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট প্রথম আহমোসের নেতৃত্বে। শুরু হয় ফারাও শাসন। ফারাওরা বনী ইসরাইলকে হেকসোসদের সহযোগী মনে করত। ফলে মিসরের মাটিতে বনী ইসরাইলের উপর নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। ধারাবাহিক দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে চলতে থাকে এই দুর্দিন। খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ থেকে ১২৫০ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ মুসা ﷺ প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত।

এই ৩০০ বছর বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে নিয়ে আসে বিরাট অধঃপতন। যে জনগোষ্ঠী জুলুম-নির্যাতন ও দমন-নিপীড়নের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তারা স্থবির জাতিতে পরিণত হয়– যাদের কোনো ইচ্ছা, অভিমত, উচ্চাশা বা স্বপ্ন থাকে না। তাদের জীবন হয়ে পড়ে

গোলামের জীবন। বনী ইসরাইলের অবস্থাও এমনই দাঁড়ায়। তারা মানবেতর জীবন-যাপন করে। লাঞ্ছনা, ভীতি ও মিথ্যা হয়ে যায় তাদের জীবনসঙ্গী। দমনপীড়ন তাদেরকে একের পর এক মিথ্যা বলতে বাধ্য করতে থাকে। একপর্যায়ে এ নিকৃষ্ট স্বভাব তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। আর এই স্বভাবেই তারা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে তাদের এই স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন–

> অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ– যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। [সুরা বাকারা :৭৯]

এরপর তারা একত্ববাদ ছেড়ে দিয়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যায়। ডুবে যায় পৌত্তলিকতায়। এমনকি ফারাওদের মত গাইরুল্লাহর উপাসনা তাদেরও অস্তিত্বে মিশে যায়। ফারাওদের উপাস্য ছিল অনেক। কল্যাণের দেবতা, অকল্যাণের দেবতা, সৌন্দর্যের দেবতা, সমুদ্রের দেবতা ও নদী ইত্যাদির দেবতা। প্রতিটি বিষয়ের ছিল আলাদা আলাদা দেবতা। উপাস্যের এই ছড়াছড়ি এবং শিরকের এই মহামারী বনী ইসরাইলের মধ্যেও শিকড় গেড়ে বসে। অথচ আগে তারা ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর অটল-অবিচল। এই দীর্ঘ সময়ে বহু বিকৃতি আর অপব্যাখ্যা বনী ইসরাইলের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে মুসা ﷺ প্রেরিত হন। এমন সময়ে মিসরে তাঁর জন্ম হয়, যখন তৎকালীন ফেরাউন– আল্লাহ ﷻ যেমন উল্লেখ করেছেন– মানুষকে গোলামে পরিণত করত; তাদেরকে দুর্বল করে রাখত; শিশুদের জবাই করত; নারীদের বাঁচিয়ে রাখত। এটা ছিল মানবতার এক বড় বিপর্যয়। আমাদের রব যেমন তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

> ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। [সুরা কাসাস :৪]

ফেরাউন কাদের সন্তান জবাই করত? বনী ইসরাইলের সন্তান।

এমন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেন হারুন ﷺ এবং তিনি নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এরপর জন্ম নেন মুসা ﷺ। তার বেঁচে যাওয়ার ঘটনা আমরা সবাই জানি। কুরআনে যেমন আলোচিত হয়েছে। মুসা ﷺ ফেরাউনের ঘরেই বেড়ে ওঠেন। এরপর এক মিসরীকে হত্যার ঘটনা ঘটে। এবং মুসা ﷺ মিসর থেকে পালিয়ে মাদায়েন চলে যান। যা আমরা সবাই জানি।

এখানে একটু বিরতি নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। একটি মারাত্মক ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করতে চাই, বেশিরভাগ মিসরী যে ভুলে প্রায়ই নিপতিত হন। আমরা দেখতে পাই মিসরীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই ফারাও শাসকদের নিয়ে গর্ব করে থাকেন। বিষয়টি খুবই পরিতাপের। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ফারাওদের অনেক স্মৃতি ও কীর্তি রয়েছে– একথা ঠিক; তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা ছিল মুশরিক। নবী-রসুলের বিপক্ষে তারা যুদ্ধ করেছিল। মুসা ও হারুন ﷺ-এর সাথে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। এমন সব অপকর্ম করেছিল, যেগুলোর কথা আমাদের রব উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে দিয়ে জুলুম ও ঔদ্ধত্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাদের সম্প্রদায়ের জীবনধারাও ছিল তাদের মতই। এমনকি আল্লাহ ﷻ তৎকালীন মিসরের জনগোষ্ঠীকে ফাসেক জনগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন–

> অতঃপর সে (ফেরাউন) তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, এবং তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। [সুরা যুখরুফ : ৫৪]

অতএব, এমন কাউকে নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোন, যে গাইরুল্লাহর দাসত্ব করত। বিষয়টি ওই ব্যক্তির মত, যার বংশ আবু জাহল, আবু লাহাব বা ওয়ালীদ ইবনু মুগীরার সাথে মেলে বলে গর্ব করে। সে বলে, এসব ব্যক্তি ছিল আরব। আর একজন আরব হিসাবে আমি তাদের নিয়ে গর্বিত। সে গর্ব করে বেড়ায় পূর্ববর্তী আরব কাফেরদের নিয়ে। এটা কি কোনো বিবেকবানের কথা হতে পারে?

আলোচনার প্রেক্ষিতে মনে পড়ে গেল। বিশিষ্ট আলেম ড. আবদুল্লাহ আযযাম ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, জর্ডানে এক নাস্তিকের ডাকনাম ছিল আবু লাহাব। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন আপনি নিজের উপনাম আবু লাহাব রেখেছেন?

সে জওয়াব দেয়, আমি একজন আরব। আরবদের নিয়ে আমি গর্বিত। আবু লাহাবও একজন আরব। তাকে নিয়েও আমি গর্ব করি।

কী আজব ব্যাপার! এ লোক সমগ্র আরবদের ছেড়ে গর্ব করার জন্য আবু লাহাবকে বেছে নিয়েছে। এটা একটা বিকৃত চেতনা। তবে কিছু সাধারণ মানুষও এই রোগে আক্রান্ত। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে মিসরীরা ফারাওদের নিয়ে গর্ববোধ করবেন না। আমি আগেই বলেছি, কুরআনে ফারাওদের আলোচনা এসেছে অভিশাপ, লানত আর লাঞ্ছনার সাথে।

মুসা ﷺ 'উলুল আযম' মহান নবী মিসর থেকে বেরিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় মাদায়েনে কাটান। এরপর আবার মিসর ফিরে আসেন। তাঁকে নবুওয়ত দেওয়া হয়। তিনি এসে ফেরাউনকে দাওয়াত দেন।

ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে যাদুকররা ঈমানদার হয়ে যায়। তিনি জনসম্মুখে অখণ্ডনীয় হুজ্জত পেশ করেন। সে সময় মিসরের সব অধিবাসীদের মধ্য থেকে মাত্র তিন/চার জন ঈমানদার হয়। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। ফেরাউনের সেবিকা এবং আরও একজন ঈমানদার হয়, যার কথা সুরা আল-মুমিনে উল্লেখ আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের এক বাবুর্চিও ঈমান গ্রহণ করেছিল। মিসরের অবশিষ্ট জনগণের কেউই ওই সময় ঈমান আনেনি। এমনকি বনী ইসরাইলও না। সুরা ইউনুসে এর বিবরণ দিতে গিয়ে আমাদের রব বলেন—

> আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া— ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। [সুরা ইউনুস : ৮৩]

৩০০ বছর যাবৎ দমন, নিপীড়ন ও ভয়-ভীতিতে নিমজ্জিত বনী ইসরাইল মুসা ﷺ-এর অনুসরণ করতেও দ্বিধাবোধ করতে থাকে। এজন্য মুসা ﷺ তাদেরকে ঘরেই সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন—

> আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ করো। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং সালাত কায়েম করো আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান করো। [সুরা ইউনুস : ৮৭]

তারা ছিল ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ভয়ে ভীত। এভাবে কেটে যায় অনেক বছর। আল্লাহ ﷻ মিসরীদেরকে অনেক অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে পরীক্ষা করেন। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে দেখানো হয় সুস্পষ্ট নয়টি অলৌকিক নিদর্শন। তবুও তারা ঈমান আনে না। জুলুম ও ত্রাসের উপর চলতে থাকে। একবার, দুইবার, তিনবার এমনকি নয় নয়বার তারা মুসা ﷺ-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। আমাদের রব যেমন উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ ﷻ তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেন। এরপর তিনি মুসা ﷺ-কে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে মিসর ত্যাগ করার অনুমতি দেন। মুসা ﷺ বনী ইসরাইলকে তার সাথে দেশ ত্যাগের প্রস্তাব দেন। তখন এক মহা প্রস্থান সংঘটিত হয়।

বনী ইসরাইল মিসর থেকে সুয়েজ উপসাগর অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। সুস্পষ্ট এক মুজিযার মাধ্যমে তারা উপসাগর অতিক্রম করে। এ মুজিযার মাধ্যমে মুসা ﷺ লালিত একীন এবং বনী ইসরাইলের ভীরুতা, দুর্বলতা ও হীনমন্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন আমাদের রব ﷻ উল্লেখ করেছেন—

> যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। [সুরা শুআরা : ৬১]

আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্যের উপর তাদের কোনো বিশ্বাসই ছিল না। তখন মুসা ﷺ বলেন—

> কখনও নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। [সুরা শুআরা : ৬২]

এরপর মুসা ﷺ লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন। তখন দুইপাশ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে মাঝখান দিয়ে রাস্তা হয়ে যায়। মুসা ﷺ বনী ইসরাইলকে নিয়ে সাগরে প্রবেশ করেন এবং পার হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে যান। তাদের পেছনে পেছনে ফেরাউনও তার সর্বশক্তি নিয়ে প্রবেশ করে। সে ধ্বংস হয়ে যায়; ধ্বংস হয় তার সেনাবাহিনী। আল্লাহ ﷻ ফেরাউনের দেহ বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শনহিসাবে অক্ষত রাখেন। মিসরের ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্রের বিবরণ মুসা ﷺ-এর কাহিনীর সাথে মিলে যায়। এই ঘটনা সংঘটিত হয় ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় রামসিসের আমলে। তবে প্রকৃত সত্য আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন। তার দেহ আজও বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শনহিসাবে মমি আকারে অক্ষত আছে।

বড় আফসোসের বিষয়, আমরা অনেক মানুষকে দেখি দ্বিতীয় রামসিসকে দেখে তাজ্জব হয়। মমি সংরক্ষণ দেখে চমকে ওঠে। চত্বরে চত্বরে স্থাপিত বড় বড় ভাস্কর্য দেখে থমকে যায়। অথচ মানুষ চিন্তাও করে না যে, এ লোক এবং এর মত অন্যদের— চাই সে ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় রামসিস হোক বা অন্যকেউ— আল্লাহ ﷻ ভয়ঙ্কর মুজিযা দিয়ে ধ্বংস করেছেন। তার দেহ অদ্যাবধি অক্ষত রেখেছেন, যেন তা বিশ্ববাসীর কাছে রব্বুল আলামীনের কুদরতের নিদর্শন হয়ে থাকে।

মুসা ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায় যখন সিনাই পৌঁছে, তখন তাদের সাথে কী ঘটে?

দেখা যাক, বনী ইসরাইলরা কতজন মুসা ﷺ-এর সাথে সাগর পাড়ি দেয়?

মিসরের ভূখণ্ডে বনী ইসরাইলের অবস্থানের এ দীর্ঘ সময়ে তাদের জনসংখ্যা কতজন হয়েছিল?

কিছুকিছু গ্রন্থের ভাষ্য— ইসলামের তাফসীর-বিষয়ক গ্রন্থাবলিতেও এমন তথ্য রয়েছে— সাগর পাড়ি দেওয়া বনী ইসরাইলের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ। কোনো কোনো বর্ণনা বলে, ৬ হাজার বা ১৫ হাজার। দ্বিতীয় বর্ণনাটি বেশি সঠিক বলে মনে হয়। আমার কাছে অনেক দলিল-প্রমাণ আছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, তৎকালীন বনী ইসরাইলের সংখ্যা ৬ লক্ষ হওয়াটা কিছুতেই বোধগম্য নয়। ইহুদীরা স্বভাবত সংখ্যা মোটা করে দেখায়, যাতে তারা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তারা এক বিরাট জনসংখ্যা নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেছিল।

সুরা ইউনুসে আল্লাহ ﷻ বলেন—

> আর কেউ ঈমান আনল না মুসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া— ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। [সুরা ইউনুস : ৮৩]

কুরআনের এই বর্ণনাশৈলী প্রমাণ করে যে, তৎকালীন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা অধিক হওয়া অসম্ভব! ৬ লক্ষ তো বিরাট সংখ্যা। আরবী ভাষায় 'যুররিয়্যাহ' শব্দটি বলা হয় স্বল্পতা বোঝানোর জন্য। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মুসা ﷺ-এর বাহিনীকে ধাওয়া করার সময় ফেরাউন নিজেই বলেছিল—

> নিশ্চয়ই এরা ক্ষুদ্র একটি দল। [সুরা শুআরা : ৫৪]

অর্থাৎ মুসা ﷺ-এর সহগামী বনী ইসরাইলের সংখ্যা খুবই কম।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে মিসর প্রবেশকালে বনী ইসরাইলের সংখ্যা কত ছিল? ইয়াকুব ﷺ-এর যুগে তাদের জনসংখ্যা ছিল কতজন? আমরা আগেই বলেছি, আনুমানিক ৭২ জন লোক নিয়ে ইয়াকুব ﷺ মিসর এসেছিলেন। ইয়াকুব ﷺ-এর ১২ সন্তান। সাথে ছিল তাদের স্ত্রীরা ও সন্তান-সন্ততি। তা হলে মাত্র ৪৫০ বছরের মাথায় (ইউসুফ ﷺ ও তার পরবর্তী হেকসোস শাকদের অধীনে ১৫০ বছর, ফারাও আমলের ৩০০ বছর। এ হল মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ) ৭২ জন ব্যক্তি ৬ লক্ষ হয়ে যাবে? অসম্ভব একটা বিষয়। এ সময় বনী ইসরাইলরা মিসরীদের বিবাহ করতে পারত না। অর্থাৎ তৎকালীন বনী ইসরাইলের প্রত্যেক ব্যক্তি ছিল খাঁটি বনী ইসরাইল। সামনে আমরা দেখব ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে তাদের ভীতি। এই ভীতি প্রমাণ করে তাদের সংখ্যা তখন ৬ লক্ষ ছিল না।

আমরা আরও দেখব, তারা যখন ইউশা ﷺ-এর সাথে ফিলিস্তিন প্রবেশ করে, তখন জনশক্তির স্বল্পতার দরুণ সব জায়গা দখল করার

সামর্থ্যও তাদের ছিল না। এতেও প্রমাণিত হয়, তাদের জনসংখ্যা তেমন একটা বড় ছিল না।

মুসা ﷺ-এর সাথে তাদের সিনাই উপত্যকায় আসার পরবর্তী অবস্থা আমাদের রব বয়ান করেছেন। যখন তারা সিনাই উপত্যকায় আসে, তখন সেখানে তারা এক পৌত্তলিক সম্প্রদায় পায়। ওই সম্প্রদায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাছের পূজা করত। বনী ইসরাইল তখন কি বলেছিল? দেখুন, সেই প্রজন্মের স্বভাব-চরিত্র, যারা লাঞ্ছনা, দাসত্ব আর জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। তারা এমন এক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছিল, যেখানে পৌত্তলিকতা ও নানান উপাস্যের ছিল ছড়াছড়ি। কাজেই গাছপূজারী সম্প্রদায় দেখে তারা যা বলে উঠেছিল, কুরআন মাজীদ তা উল্লেখ করেছে–

> আমি সাগর পার করে দিলাম বনী ইসরাইলকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দাও। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড় অজ্ঞতা রয়েছে। [সুরা আরাফ :১৩৮]

কয়েক মিনিট আগে আমাদের রব বনী ইসরাইলকে সুস্পষ্ট মুজিযার মাধ্যমে মহাবিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত মুজিযার মাধ্যমে যে সমুদ্র তারা পাড়ি দিয়ে এসেছে, তার পানি এখনও তাদের পা থেকে শুকায়নি; কিন্তু এখনই তারা মুসা ﷺ-কে বলছে, আমাদেরকে ওদের মত ইলাহ বানিয়ে দাও! তাই মুসা ﷺ তাদেরকে বলেন– নিশ্চয়ই তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়। [সুরা আরাফ :১৩৮]

এরপর ঘটে যায় অনেক ঘটনা। যেগুলো আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। মুসা ﷺ তাওরাত লিখিত 'লাওহ' (কাঠখণ্ড) গ্রহণ করতে তুর[৩] পাহাড়ে যান।

[৩] তুর পাহাড় বর্তমান মিসরের সিনাই উপদ্বীপে অবস্থিত। মিসরের 'জানুব সিনাই' জেলার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ পাহাড় এটা। 'জাবালু মুসা' ও 'মাউন্ট সিনাই'

তুর পাহাড়ে গমনকালে তিনি বনী ইসরাইলকে আল্লাহর প্রেরিত একজন নবীর সাথে রেখে যান। তিনি হারুন ﷺ। এরপরও বনী ইসরাইল কী করেছিল? আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা বাছুর পূজা শুরু করে দিয়েছিল। মুসা ﷺ এদেরকে রেখে মাত্র ৪০ রাতের জন্য দূরে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাদেরকে ৩০ রাতের কথা বলেছিলেন। এরপর আরও ১০ রাত বাড়ানো হয়। এদিকে ৩০ রাত যেতে না যেতেই বনী ইসরাইল অবাধ্য হয়ে ওঠে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা বাছুর পূজা শুরু করে।

দেখুন মানসিকতা! দেখুন বিবেক!! এরাই পরবর্তীতে জন্ম দিয়েছে আমাদের পরিচিত আজকের ইহুদীদের। এরাই তারা, যারা বহু যন্ত্রণা দিয়েছিল মুসা ﷺ-কে। মুসা ﷺ তাঁর কওমে একদিনও শান্তি অনুভব করেননি সেই সময়, যখনকার কথা আমরা ভাবি যে, তাঁর সাথী-সঙ্গী অনেক সহায়তা করে থাকবেন। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদেরকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে। অথচ তারাই তাকে সারা জীবন নিকৃষ্টতর কষ্ট দিয়েছে। হারুন ﷺ যখন তাদেরকে বাছুর পূজা থেকে বারণ করেন, তখন তারা হারুনকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। আল্লাহ যেমন তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

> মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা : ২৫]

আমরা যেমন তাদের ইতিহাস জানি যে, তারা পরবর্তীতে অনেক নবীকে হত্যা করেছিল।

এই পুরো কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে শুধু মুসা ও হারুন ﷺ-ই সত্যের উপর ছিলেন। আর ছিলেন মুসা ﷺ-এর

=নামেও পাহাড়টি পরিচিত। এই পাহাড়ে আল্লাহ ﷻ-এর সাথে মুসা ﷺ-এর কথোপকথন হত। উল্লেখ্য, এখানে তুর পাহাড় বলে ফিলিস্তিনের 'জাবালুত তুর' বা 'জাবালুত তবুর' উদ্দেশ্য নয়।

গোলাম ইউশা ইবনু নুন। আমরা জানি না, তিনি কি মুসা ﷺ-এর সাথে সাগর পার হয়ে এসেছিলেন, নাকি পরবর্তীতে সিনাই উপত্যকায় তাদের আটকে থাকার দিনগুলোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বনী ইসরাইলই সেই ব্যর্থ জাতি, যারা সর্বপ্রথম কোনো নবীকে উপাসনার জন্য ইলাহ বানিয়ে দিতে বলেছিল। এরপর মুসা ﷺ যখন তার রবের কাছ থেকে 'লাওহ' আনতে যান, তখন তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি বাছুর পূজা শুরু করে দেয়। মুসা ﷺ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে বাছুরটি জ্বালিয়ে দেন। এরপর এদেরকে নিয়ে মুসা ﷺ আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে পবিত্র ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রা করেন।

মুসা ﷺ সেই বনী ইসরাইলকে নিয়ে যাত্রা করেন, যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল সুস্পষ্ট মুজিযার মাধ্যমে। তাদের সাথে ছিলেন আল্লাহর মদদপ্রাপ্ত রসুল। এক পর্যায়ে তারা পৌঁছে যায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে। শহরের প্রাচীরের সামনে তারা যাত্রা বিরতি করে। এরপর মুসা ﷺ তার কওমকে উদ্দেশ করে আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ শোনান–

> হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। [সুরা মায়েদা : ২১]

মুসা ﷺ বনী ইসরাইলকে অবগত করেন যে, আল্লাহ ﷻ তোমাদের জন্য এ ভূখণ্ড লিখে দিয়েছেন। কারণ, তোমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হও, তা হলে এ ভূখণ্ড আর তোমাদের থাকবে না। এটা নিঃশর্তভাবে শুধু মুমিনদের জন্যই। অতএব, যারাই আল্লাহর শরীয়ত আকড়ে ধরবে এ ভূখণ্ড তাদেরকে লিখে দেওয়া হবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে কুফরে লিপ্ত হবে তারা কিছুতেই এ ভূখণ্ডের হক দাবি করতে পারবে না–

> হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে

> প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। [সুরা মায়েদা : ২১]

বনী ইসরাইলের জওয়াব–

> তারা বলল, হে মুসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিত আমরা প্রবেশ করব। [সুরা মায়েদা : ২২]

তা হলে এখানে দক্ষতা কোথায়? তারা বেরিয়ে যাওয়ার পর বনী ইসরাইল এসে প্রবেশ করবে। পরীক্ষা কোথায়? জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কোথায়? কুরবানী ও আত্মত্যাগ কোথায়? এই ঈমান শুধু মুখের ঈমান! কাজ-কর্মের সাথে যার কোনো মিল নেই। তাদের এ কর্মকাণ্ড কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? কুরআনের ভাষায়–

> মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? [সুরা আনকাবুত : ২]

অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় বনী ইসরাইল মুসা ﷺ-কে জওয়াব দেয়–

> তারা বলল, হে মুসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিত আমরা প্রবেশ করব। [সুরা মায়েদা : ২২]

এই প্রতাপশালী সম্প্রদায় কারা? তারা হল এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কেনানী সম্প্রদায়। তারা ছিল পৌত্তলিক। ইহুদীদের এই ভূখণ্ডে আসার প্রায় ১৪০০ বছর আগ থেকে তারা এখানে বসবাস করে আসছিল। তারা ছিল শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি। এজন্য ইহুদীরা উক্ত ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

অনেক ইসরাইলী বর্ণনা– খুব আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, সেগুলো অনেক ইসলামী বই-পুস্তকেও বিদ্যমান রয়েছে– তৎকালীন

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী এ সম্প্রদায় সম্পর্কে কত যে আজগুবি কথা বয়ান করে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেক মুসলমান ওইসব কথা প্রচারও করে থাকেন। এসব বর্ণনা বলে, এরা ছিল আমালেকা সম্প্রদায়। এদের দেহ এমন ভারী আর দীর্ঘ ছিল যে, আমরা ধারণাও করতে পারি না। ইসরাইলী বর্ণনাতে আছে, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে গিয়ে সংবাদ জানার জন্য মুসা ﷺ বনী ইসরাইলের কয়েক জন গুপ্তচর পাঠান। তারা এক আমালেকের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে এদেরকে ধরে জামার হাতার মধ্যে ভরে ফেলে এবং সরদারের সামনে গিয়ে ঢেলে দেয়।

বিবেক লক্ষ্য করুন, আমালেকার লোকজনের দেহ এত বড় ছিল যে, একাধিক গুপ্তচরকে তারা জামার হাতার মধ্যে ভরে ফেলতে পারত।

তারা বলে থাকে, এ আমালেকা সম্প্রদায় উস (ইসু) ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাকের বংশধর। সে এই ভূখণ্ডেই বসবাস করত। উস ছিল 'আমলাক' তথা বিরাটকায়। সে যখন পানি পান করতে চাইত, তখন মেঘ নিংড়ে পানি বের করত। যখন খেতে চাইত, তখন সাগরে হাত ফেলত এবং মাছ ধরে আনত। এরপর সূর্যের দিকে হাত উঁচু করে সেই মাছ ঝলসে খেয়ে নিত। দেখুন, কী বিবেক। আফসোস, ইসলামী তাফসীরের গ্রন্থাদীতেও এসব অদ্ভুত কথা বিদ্যমান রয়েছে। এসব ইসরাইলী ভ্রান্ত বর্ণনা থেকে আমাদের তাফসীরের গ্রন্থগুলোকে পরিষ্কার করা উচিত।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, কিছু কিছু তাফসীর গ্রন্থে এমন অবান্তর ইসরাইলী বর্ণনা কীভাবে এসেছে?

এসব কাহিনী বানানো হয়েছে, যাতে ইহুদীরা তাদের কাপুরুষতা ঢাকতে পারে। তারা যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ এবং সেখানে যুদ্ধসংক্রান্ত নববী নির্দেশ অমান্য করেছিল, তা যেন লুকাতে পারে। তারা তাদের নবীকে জওয়াব দিয়েছিল, এরূপ দৈত্যাকৃতির মানুষের সাথে কে যুদ্ধ করতে পারে?

কুরআনে বর্ণিত আছে—

> আল্লাহভীরুদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ করো। অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [সুরা মায়েদা : ২৩]

বনী ইসরাইল কী জওয়াব দিয়েছিল? তারা জওয়াব দিয়েছিল—

> তারা বলল, হে মুসা, আমরা জীবনে কখনও সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসলাম। [সুরা মায়েদা : ২৪]

'তারা যতক্ষণ সেখানে আছে আমরা কিছুতেই ঢুকব না।' দেখুন, তাদের বাক্যগুলো। এটা সুস্পষ্ট কুফর। 'আপনি এবং আপনার রব যান।' যেন আল্লাহ ﷻ শুধু মুসার রব; তাদের রব নন। মুসা ﷺ তখন তাদের কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন—

> হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা : ২৫]

দেখুন, তাদের পুরো জনগোষ্ঠীর কী অবস্থা! একজন শক্তিশালী 'উলুল আযম' নবী মুসা ﷺ নিজের সম্প্রদায় নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন। অথচ তিনি শুধু নিজের এবং হারুন ﷺ-এর উপরই ক্ষমতা রাখেন। খুব বেদনাহত হয়ে তিনি বলেছিলেন—

> হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। [সুরা মায়েদা : ২৫]

আল্লাহ ﷻ-এর ভাষ্যমতে ইহুদীরা ছিল ফাসেক। ফিলিস্তিন প্রবেশের প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ছিল অত্যাধিক ভীরু, কাপুরুষ আর অবাধ্য। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের ভাগ্যে লিখে দেন (তীহ তথা) সিনাই উপদ্বীপে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকার শাস্তি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বনী ইসরাইল সিনাই উপদ্বীপে দুর্ভোগ-যন্ত্রণার মধ্যে ঘুরতে থাকে। যখনই তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হত, তখনই আল্লাহ ﷻ তাদের পথ ভুলিয়ে দিতেন। দিশেহারা হয়ে তারা বারবার ফিরে আসত। একবার, দুইবার, তিনবার, দশবার, বহুবার। এমনকি কখনও কখনও তারা ফিলিস্তিনের খুবই কাছে চলে যেত। কিন্তু তারপর আর পথ খুঁজে পেত না। এই সময়ে মুসা ﷺ ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর রবের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তাকে পবিত্র ভূখণ্ডের নিকটবর্তী করে দেওয়া হয়। আল্লাহ ﷻ তাঁর আবেদন কবুল করেন। রসুল ﷺ-এর ভাষ্যমতে আল-কুদসের লাল টিলার কাছে তাকে দাফন করা হয়। আল-কুদসের এতটা নিকবর্তী হওয়ার পরও তারা পথ খুঁজে পায় না। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাদের জন্য লিখে রেখেছিলেন 'তীহ' এর শাস্তি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এভাবেই বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, গুমরাহী, লাঞ্ছনা ওইসব লোকের ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করে। অবজ্ঞা করে তাদের রসুলের নির্দেশ এবং বর্জন করে নবীদের পথ।

আসুন দেখি, 'তীহ' প্রান্তরে বনী ইসরাইলের কি পরিণতি হয়?

যখন ইউশা ﷺ তাঁর কওমকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেন, তখন কী ঘটে?

আর সেখানে প্রবেশের কী ঘটে?

তীহ প্রান্তরে বনী ইসরাইল

আমরা মুসা ﷺ-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইবরাহীম ﷺ-কে নিয়ে। এখন আমরা ফিলিস্তিনের ইতিহাসে অতিক্রান্ত কাহিনীমালা একসাথে পর্যালোচনা করে নেওয়া ভালো মনে করছি। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় অব্যাহতভাবে অবশিষ্ট ইতিহাস পূর্ণ করব।

মানুষ যা আবিষ্কার করেছে, সেগুলো বিচারপূর্বক আমরা ফিলিস্তিনের প্রাচীন ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলাম। সর্বাধিক প্রাচীন যুগকে আমরা প্রস্তর যুগ বলে আখ্যায়িত করেছি। যে যুগে কোনো খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়নি। আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে এই প্রস্তর যুগে দুনিয়ার প্রথম নগরী আরিহার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

আমরা উল্লেখ করেছি, ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল ব্রোঞ্জ যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ২০০০ বছর হচ্ছে ব্রোঞ্জ যুগ। সে যুগে মানুষ টিন আবিষ্কার করে এবং টিন তামার সাথে মিলিয়ে ব্রোঞ্জে পরিণত করে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের হাতিয়ার আবিষ্কার করা সম্ভব হয়।

আমরা ব্রোঞ্জ যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ এবং আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ। প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তখন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর আবির্ভাব ঘটে। তারা সবাই আরব উপদ্বীপ থেকে এসেছিল। কেনানী, ফিনিশিয়ান, আমোরীয় ও জেবুসিট। এরাই ফিলিস্তিনের মাটিতে বেশিরভাগ শহর প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা সবাই ছিল পৌত্তলিক।

এরপর ৪৫০ বছর ছিল মধ্য ব্রোঞ্জ যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫৫০ সাল পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এ সময়ে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাওহীদের আবির্ভাব ঘটে। ইবরাহীম ﷺ-এর আগমনের মাধ্যমে। ক্রমেই তাওহীদ বিস্তার লাভ করে। ইসমাঈল ﷺ এবং তারপর ইসহাক ﷺ-এর জন্ম হয়। ইসহাক ﷺ-এর ঔরসে জন্ম হয় ইয়াকুব ﷺ-এর।

এরপর ইউসুফ ﷺ-এর কাহিনীর সূচনা হয়। তাকে মিসর নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার পর শুরু হয় তাঁর মিসরের জীবন। ইউসুফ ﷺ তার পরিবার-পরিজনকে মিসরে নিয়ে আসেন। সেখানে ইয়াকুব ﷺ-এর সাথে তারা ১২ ভাই জীবন-যাপন করতে থাকেন, যারা বনী ইসরাইলের মূল। তারা ১৫০ বছর বাস করেন, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ সালে শেষ হয়। এখানে মধ্য ব্রোঞ্জ যুগেরও সমাপ্তি।

আমরা আগে যেমন বলেছি, হেকসোসদের পরাজয় ঘটেছিল ফারাও সম্রাট প্রথম আহমোসের হাতে। তখন থেকে শুরু হয় নতুন ফারাও যুগ। পরবর্তী ৩০০ বছর, যেটা শেষ ব্রোঞ্জ যুগ– খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সাল পর্যন্ত। এটাই মুসা ﷺ-এর সময়। খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালে তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। দীর্ঘ সময় ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহর পথে দাওয়াতের নবুওয়তী জীবন-যাপন করেন। এরপর ঘটে মহাপ্রস্থানের ঘটনা। মুসা ﷺ সিনাই উপদ্বীপে প্রবেশ করেন এবং পরিবার ও সম্প্রদায়কে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশে উৎসাহিত করেন। কিন্তু বনী ইসরাইল তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে সিনাই উপত্যকার মরু অঞ্চলে ঘুরতে বাধ্য হয়। মুসা ও হারুন ﷺ তাদের সাথে সেখানেই জীবন-যাপন করতে থাকেন। এ সময় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালে মুসা ﷺ ইন্তেকাল করেন। বনী ইসরাইল সিনাই উপত্যকার ধু-ধু মরু প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকার এ সময়েই সমাপ্ত হয় আধুনিক ব্রোঞ্জ যুগ।

বনী ইসরাইল এতদিন পর্যন্ত মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর থেকে আল্লাহর এবাদত করছিল। সাগর পাড়ি দিয়ে আসার পর মুসা ﷺ তুর পাহাড়ে গমন করেন এবং তাওরাতের বোর্ড প্রাপ্ত হন। তাওরাতের বোর্ডে ছিল নতুন শরীয়তের বিধান। ইহুদীরা তখন নতুন শরীয়তে প্রত্যাবর্তিত হয়।

এরপর মুসা ﷺ ইন্তেকাল করেন। পবিত্র ভূখণ্ড দেখতে না পারায় তিনি ছিলেন মর্মাহত। পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রতি তিনি ছিলেন খুব উদগ্রীব। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে লাঞ্ছিত করে এবং তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সিনাই উপদ্বীপের মরু প্রান্তরে ৪০ বছর উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরাতে থাকেন। এ সময়ের মধ্যে সেই প্রজন্মের মৃত্যু ঘটে, যারা লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, জুলুম ও নিপীড়ন সয়ে বেড়ে উঠেছিল। মিথ্যা যাদের আপদমস্তক ছেয়ে ফেলেছিল। যাদের অন্তরে পৌত্তলিকতার বিভিন্ন লক্ষণ শিকড় গেড়ে বসেছিল। আবার এর মধ্যে এমন এক প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে, যারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল।

এই নতুন প্রজন্মও যেহেতু পূর্ববর্তী প্রজন্মের হাতে প্রতিপালিত হয়েছিল, এজন্য তারা পূর্ববর্তীদের অনেক নিকৃষ্ট স্বভাব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায়। তবে এ প্রজন্মের মধ্যে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের কিছুটা হলেও আগ্রহ ছিল। ইউশা ইবনু নুন ﷺ এই নতুন প্রজেন্মের নবী মনোনীত হন। তাওরাতে তার নাম 'ইয়াশু' বলা হয়েছে। হাদীসে তাঁর কাহিনী আলোচিত হয়েছে। তবে কুরআনে তাঁর উল্লেখ নেই।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের জন্য আহ্বান করেন এবং বনী ইসরাইল আরিহা শহর হয়ে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। তবে সেখানে প্রবেশের আগে তারা জর্ডান নদী ও জর্ডান ভূখণ্ড অতিক্রম করে।

তাদের পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের দিনটি ছিল শুক্রবার। ইহুদীদের রীতি ছিল তারা শনিবার সবকিছু স্থগিত রাখত। তাই শুক্রবারেই তাদের যুদ্ধ শেষ করা ছিল আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হতে থাকে। এমনকি সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়। তৎকালে সৈন্যরা রাতে যুদ্ধ করত না। ওদিকে শনিবারও তারা যুদ্ধ করতে পারবে না, তাই তাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। ইউশা ইবনু নুন ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেন, যেন সূর্য থেমে যায়, অস্তমিত না হয়। আল্লাহ ﷻ সূর্য থামিয়ে রাখেন। এটা ছিল বনী ইসরাইলের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন। এক পর্যায়ে বনী ইসরাইলের বিজয় হয়। এই তথ্য আমাদের রসুল ﷺ-এর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

ঈমানদার ইহুদী বাহিনী ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করে। এই প্রথম বারের মত যেনো তারা নবীর আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তাদের পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত অবাধ্যতা ও কুফর আবার তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আল্লাহ ﷻ তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অবনত হয়ে ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে এবং 'হিত্তা' বলতে। অর্থাৎ আমাদের ভুলগুলো মিটিয়ে দিয়ে আমাদের ক্ষমা করে দিন।

কিন্তু তারা কি করেছিল? আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ অনুপাতে তারা নত হয়ে প্রবেশ করেনি; বরং পিঠ দিয়ে প্রবেশ করে। অথচ তাদের উপর ফরজ ছিল নতশিরে সম্মুখপানে প্রবেশ করা। তারা মুখের কথাও বদলে ফেলেছিল। তাদের নবী ইউশা ﷺ-এর কথা ব্যাঙ্গ করে 'হিত্তা' (ক্ষমা চাই) শব্দের পরিবর্তে তারা 'হিনতা' (গম চাই) বলতে থাকে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ করো এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশি খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাকো এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢোকো, আর বলতে থাকো– আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও– তা হলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। [সূরা বাকারা : ৫৮]

কারা এরা?

এরা তারা, যারা একটু আগে একটি ঈমানী ক্ষেত্রে পৌত্তলিক শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এরাই তারা, যাদের জন্য আল্লাহ ﷻ সূর্য থামিয়ে দিয়েছিলেন। এরাই তারা, চল্লিশ বছর উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরার পর যাদের জন্য আল্লাহ ﷻ ইউশা ইবনু নুন ﷺ-কে প্রেরণ করেছিলেন। এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ ﷻ দেখিয়েছেন একের পর এক অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা, কুফর আর হঠকারিতাতে লিপ্ত থাকে। অথচ এই প্রজন্ম মুসা ﷺ-এর সময়কার

ফেতনাবাজ প্রজন্ম থেকে পরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু বনী ইসরাইল বলে কথা। তারা কুফর আর অবাধ্যতা ছাড়া কীভাবে থাকতে পারে?

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১৯০ সালে ইউশা ইবনু নুন ﷺ ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। মুসা ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০ বছর পর। দীর্ঘকাল তিনি বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন।

যেমন রাজা-বাদশাহরা মানুষের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তেমনই বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন নবী-রসুলগণ। যেমন রসুল ﷺ বলেছেন। যখনই তাদের কোনো নবী মারা যেতেন, তখনই আরেক জন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন।

ইহুদীরা ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপ্রবণ সম্প্রদায়। বনী ইসরাইলের মধ্যে নবীদের এমন আধিক্য কখনও তাদের ভালোর লক্ষণ নয়। মুসলমানদের মধ্যে শুধু একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। আজও তারা বিশুদ্ধ তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষ সত্যকে সমুন্নত করে আসছেন। আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নত আকড়ে ধরে আছেন।

কিন্তু বনী ইসরাইলের কোনো নবী মারা গেলেই তারা অবাধ্য হয়ে উঠত। এমনকি নবীর জীবদ্দশায়ও তারা হঠকারিতা করত। কখনও কখনও তাদের কাছে আল্লাহ ﷻ একাধিক নবীও পাঠিয়েছেন। অধিক বিশৃঙ্খলার কারণে কখনও পাঠিয়েছেন একই সাথে তিনজন নবীকেও।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশায়ও বনী ইসরাইল একাধিকবার বিশৃঙ্খলা করে। এক পর্যায়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ ﷻ অপর একজন নবীকে প্রেরণ করেন। তারপর আরেকজন...।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়। বনী ইসরাইলের অবাধ্যতা চরমে পৌঁছে। একপর্যায়ে আল্লাহ ﷻ তাদের উপর পৌত্তলিকদের চাপিয়ে দেন। পৌত্তলিকরা বনী ইসরাইলকে তখন এতটাই পর্যুদস্ত করে ফেলে যে, তাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু 'তাবুত' পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কি সেই তাবুত?

'তাবুত' একটি বিশেষ বাক্স। যাতে বনী ইসরাইল তাওরাতের ফলক, মুসা ﷺ-এর লাঠি ও আরও কিছু পবিত্র বস্তু রেখেছিল। এর উসিলা দিয়ে তারা বরকত কামনা করত। সব জায়গায় তারা এটা নিজেদের সাথে রাখত। যখন তারা আল্লাহর না-ফরমানী করে এবং দুনিয়াতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন কেনানীরা তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী কেনানীরা তাদের থেকে তাবুতও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এটা ছিল বনী ইসরাইলের জন্য চরম লাঞ্ছনার বিষয়। তাবুত হারিয়ে নিজেদের অধঃপতন তারা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে।

ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০০ বছর পর তাদের মধ্যে আরও একজন নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর নাম ছিল 'সামুয়িল'। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁর নাম জানি না। কেননা, তাঁর নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাওরাতে তার নাম সামুয়িল বলা হয়েছে। এই নতুন নবীর আবির্ভাব হলে বনী ইসরাইল তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। তাবুত ফিরিয়ে আনতে তারা নবীকে জিহাদ করার আবেদন জানায়। কেনানীরা তাবুত ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে তারা যে লাঞ্ছনার শিকার হয়, তার গ্লানী মুছতে তারা জিহাদ করতে চায়। কুরআনের ভাষায়—

> মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীর কাছে গিয়ে বলল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় না যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তা হলে তোমরা লড়বে না?

> তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হল, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল। আর আল্লাহ ﷻ জালেমদের ভালো করেই জানেন। [সুরা বাকারা : ২৪৬]

আল্লাহ ﷻ ইহুদীদের কাছে নতুন নবী প্রেরণ করেন। নবীর কাছে তারা জিহাদের আবেদন করে; কিন্তু যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়, তখন সামান্য কিছু বাদে সবাই পিছপা হয়ে যায়। অবশিষ্টদেরকে নবী বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তালুতকে তোমাদের বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন।

ইহুদীরা তালুতের সাথে কী আচরণ করে?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তার ইতিহাস কী?

বনী ইসরাইলের নতুন নবী তাদের কাছে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের আগ্রহ সম্পর্কে জানতে চান। তোমরা কেন যুদ্ধ করতে চাও? তোমরাই তো বছরের পর বছর তোমাদের দীনকে লাঞ্ছিত করে আসছ। তারা জওয়াব দেয়, আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তা হলে কেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এরপর জিহাদ ফরজ করামাত্রই তাদের স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই পিছপা হয়ে যায়। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আগেই তারা এ কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

তাদের নবী তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ হিসাবে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ ইহুদীদের সেনাপ্রধান হিসাবে আল্লাহ ﷻ তালুতকে নির্বাচন করেছেন।

দেখুন, তাদের জওয়াব। তারা কী বলেছিল নবীর উদ্দেশে?

কুরআনের ভাষ্যমতে তারা বলেছিল—

> আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল,

তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। [সুরা বাকারা : ২৪৭]

ইহুদীদের একটি শাখার নাম ছিল 'লেভি'। এই শাখা নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হত। আরেক শাখার নাম ছিল 'ইয়াহুযা'। তারা রাজত্বের উত্তরাধিকারী হত। ইয়াহুযা ও লেভি উভয়ই ছিল ইয়াকুব ﷺ-এর সন্তান। এদিকে তালুত ছিলেন বিনইয়ামিন ইবনু ইয়াকুবের বংশধর। বনী ইসরাইলকে পরীক্ষা করার মানসে আল্লাহ তাকে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ইয়াহুযা শাখার লোক না হওয়ায় বনী ইসরাইল তাকে নেতৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তারা একটি অবান্তর প্রশ্ন তোলে। তাকে তো ধন-সম্পদের ঐশ্বর্য দেওয়া হয়নি। কেমন যেন তিনি ধনী হলে তারা তাকে মেনে নিত। কিন্তু তিনি দরিদ্র। আবার তিনি রাজবংশেরও নন। তা হলে কিভাবে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করবেন? এ বিষয়টি সেনাবাহিনীর মধ্যে মারাত্মক সংশয় সৃষ্টি করে এবং বড় এক সংখ্যা যুদ্ধ থেকে পিছপা হয়ে যায়।

তালুত বনী ইসরাইলের স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়েই বেরিয়ে পড়েন। পথে একটি নদী পড়ে। আপনারা সবাই জানেন যে, এই নদীর কাছে গিয়ে বনী ইসরাইল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তালুতের নির্দেশ অমান্য করে তাদের বেশিরভাগ নদীর পানি পান করে। যারা এ নদীর পানি পান করে, তারাও যুদ্ধ থেকে ছিটকে পড়ে। ফলে যৎসামান্য সৈন্য তালুতের সাথে অবশিষ্ট থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমরা নিজেদের সংখ্যা তালুতের সৈন্যসংখ্যার সমপরিমাণ বিবেচনা করতাম। বদর যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা ৩১৪ জনের মত। হাদীসে বর্ণিত সর্বোচ্চ সংখ্যা ৩১৭। এ পরিমাণ লোকই তালুতের সাথে অবশিষ্ট

ছিল। একটি পরিপূর্ণ জাতির হাজার হাজার জনসংখ্যা থেকে মাত্র তিনশতাধিক লোক। তারপর তালুতের সাথে যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদেরকে যখন জালুতের নেতৃত্বে আগত জালেম কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারাও তার নির্দেশ ফিরিয়ে দেয়। তারা জওয়াব দেয় (কুরআনের ভাষায়)–

অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হল এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, কত ছোট দল বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। [সুরা বাকারা : ২৪৯]

এ তিনশতাধিক বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে মাত্র একজন লোক অগ্রসর হন। তিনি হলেন, দাউদ ﷺ। (ফিলিস্তিন নিয়ে) আমাদের ইতিহাস বর্ণনায় এই প্রথম দাউদ ﷺ-এর নাম এল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০২৫ সালে। দাউদ ﷺ-এর বয়স তখন মাত্র ১৬ বছর। তখন তাঁর সাথে ছিল একটি গুলতি। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি জালুতকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। নিহত হয় আল্লাহর দুশমন জলুত। দাউদ ﷺ, তালুত ও স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের হাত ধরে ঈমানের বিজয় হয়।

দাউদ ﷺ দীর্ঘ সময় পূর্ব বর্ণিত নবী সামুয়িল-এর সাথে জীবন-যাপন করেন। সামুয়িল-এর মৃত্যুর পর দাউদ ﷺ নবুওয়তপ্রাপ্ত হন এবং বনী

ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ সালে দাউদ عليه السلام ফিলিস্তিনের একাধিক শহরে প্রবেশ করেন। সেগুলোর মধ্যে আল-কুদস শহর অন্যতম। তিনি সর্বজন পরিচিত ইহুদী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। দাউদ عليه السلام এ সাম্রাজ্য শাসন করেন।

এখানে আমরা একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজন অনুভব করছি। তা হল, দাউদ عليه السلام যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা ফিলিস্তিনের ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। আর ফিলিস্তিনের মোট আয়তন ২৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের মোট আয়তনের ৭৪%। এর মানে হল ইহুদীদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যও ফিলিস্তিনের ৭৪% ভূখণ্ডের অধিক অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি।

ইতিহাসের পাতায় এটাই ছিল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রকৃত ঈমানের প্রথম আধিপত্য। ইবরাহীম عليه السلام-এর সময় এ ভূখণ্ডে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হলেও তা ঈমানের আলোকে শাসিত হত না। তিনি শুধু দাওয়াত ইলাল্লাহর অনুমতিই পেয়েছিলেন। সেটা ছিল পৌত্তলিক হেকসোসদের শাসনামল। ইউশা ইবনু নুন عليه السلام যখন পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন, তখন তিনিও খুব বেশি জায়গায় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হননি। তিনি আরিহা প্রবেশ করেছিলেন এমন একটি বাহিনী নিয়ে, প্রকৃত ঈমান থেকে যারা ছিল অনেক দূরে। প্রথম বারের মত ঈমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় দাউদ عليه السلام-এর সময়ে। সেই ঈমানী শাসন খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯৬৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর স্থায়ী হয়।

দাউদ عليه السلام-এর ইন্তেকালের পর তার সন্তান সুলাইমান عليه السلام তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোক সকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে দেওয়া হয়েছে সব কিছু। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। [সুরা নামল : ১৬]

সুলাইমান عليه السلام-এর সময়টি ছিল ইহুদী সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগ। সুলাইমান عليه السلام তাঁর পিতার অধিকৃত সমগ্র ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন। আমরা দেখতে পাই কুরআন বিভিন্ন জায়গায় সুলাইমান عليه السلام-এর শক্তির উল্লেখ করে; কিন্তু সেটাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে। যেমন, কুরআন বলে, 'তিনি তার অনুগত করে দিয়েছেন...' বা 'আমি (আল্লাহ) তার অধীন করে দিয়েছি...'। ঈমান ও শরীয়তের জন্য ইহুদীদের কোনো সহযোগিতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনে শুধু পাখি, জিন, বায়ু প্রভৃতির আলোচনাই এসেছে। বনী ইসরাইল সুলাইমান عليه السلام-এর দাপট ও প্রভাবের কাছে বশীভূত ছিল। তবে সন্দেহ নেই তাদের অন্তর ছিল হিংসা, বিদ্বেষ, অবাধ্যতা ও কুফরে পরিপূর্ণ। সুলাইমান عليه السلام-এর ইন্তেকালের পরই যা প্রকাশ পেয়েছিল। সুলাইমান عليه السلام-এর ইন্তেকালের পরপরই তারা তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। নবীদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকার তারা ভঙ্গ করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৯৬৩ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর ছিল তাঁর শাসনামল। সুলাইমান عليه السلام-এর এ শাসনামলকে ঘিরেই রচিত হয়েছে হাজার হাজার কল্পকাহিনী ও বানোয়াট কিচ্ছা। আজ পর্যন্ত সেই মিথ্যা অব্যাহত রয়েছে।

ওইসব বানোয়াট কল্প-কাহিনীর মধ্যে হয়তো সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ 'সুলাইমানি টেম্পল' কাহিনী। ইহুদীরা আজও সেই টেম্পল খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা যেসব জায়গায় এই মন্দির খুঁজে বেড়ায়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মসজিদে আকসার তলদেশ। আমরা মনে করি, এটা মসজিদে আকসা ধ্বংস করার একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইহুদীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মসজিদে আকসার তলদেশে যে পরিমাণ খননকার্য চালিয়েছে তাতে যে কোনো সময় মসজিদটি ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিঃসন্দেহে টেম্পলেরে এই কাহিনি সম্পূর্ণ বানোয়াট। কেননা, রসুল ﷺ বিষয়টি আলোচনা করেছেন—

> আব্দুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেন, যখন সুলাইমান ইবনু দাউদ عليه السلام বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণকার্য শেষ করেন, তখন আল্লাহর কাছে তিনি তিনটি বিষয়ের আবেদন জানান...। [ইবনু মাজাহ : ১৪০৮]

সুলাইমান ﷺ যে কাজটি করেন, তা হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি পুনরায় উত্তোলন ও নব নির্মাণ। তিনি সেই মসজিদে আকসা-ই পুনঃনির্মাণ করেন, যা আজও আমাদের সামনে বিদ্যমান। সেখানে টেম্পল নামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

তাওরাতে ও ইহুদী পণ্ডিতদের মধ্যেও কথিত টেম্পলের অবস্থান ও আকৃতি নিয়ে অনেক মতানৈক্য ও ধোঁয়াশা রয়েছে। কেউ বলেন, সেই টেম্পল পাথর দ্বারা নির্মিত। কেউ বলেন, খাটি স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। কেউ বলেন, স্বর্ণখচিত তামা দ্বারা নির্মিত।

এর অনুসন্ধানে ইহুদী পণ্ডিতরা এবং আরও অনেকে প্রচুর খননকার্য চালিয়েছে। কিন্তু আজও টেম্পলের কোনো নাম-নিশানা তারা পায়নি। বাস্তবে বিষয়টি নিতান্তই কল্পনা। সুলাইমান ﷺ-এর ব্যাপারেও অনেক স্পর্ধকাতর ও অবান্তর কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে। অথচ তিনি ছিলেন বনী ইসরাইলেরই একজন মহান নবী, যার শাসনামল নিয়ে তারা গর্ব করে থাকে। প্রিয় পাঠক! তা হলে ওইসব নবী সম্পর্কে তারা কী বলতে পারে বলে মনে করেন, যারা বনী ইসরাইলের দুঃসময়ে আগমন করেছিলেন?

এখানে আমি সেই কথাটি পুনরাবৃত্তি করব, যা আমি আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি– আমরা তাদের চেয়ে তাদের নবীদের বেশি আপনজন। আমরা বনী ইসরাইলের নবীদের বেশি আপনজন বনী ইসরাইলের চেয়ে। কেননা, আমরাই আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করি।

সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে কি ঘটে?

এ বিশাল সাম্রাজ্যের কী পরিণতি হয়, যা তিনি ও তাঁর পিতা গড়ে তুলেছিলেন?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে পরবর্তীতে গড়ে ওঠা গ্রিক, রোমান অন্যান্য সাম্রাজ্য ইহুদীদের সাথে কী আচরণ করে?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইহুদী সম্প্রদায়

আমরা দীর্ঘ সময় ইহুদী সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলাম। যা গড়ে তুলেছিলেন দাউদ ও সুলাইমান ﷺ। আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ সাম্রাজ্য প্রায় ৮০ বছর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড শাসন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সাল পর্যন্ত। ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাসে এটাই পরিপূর্ণ ঈমানী শাসনের সময়কাল। আমরা দেখেছি, মুসা ﷺ-এর যুগে বনী ইসরাইলের চরম বিপর্যয়। বিপর্যয় দেখেছি, ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর সময়ে এবং ইউশা ইবনু নুন ﷺ-এর ১৫০ বছর পর প্রেরিত নবী সামুয়িলের সময়েও। তাদের অধিকাংশ লোকই ফেতনা-ফাসাদ করেছে এবং তালুতের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেনি। একপর্যায়ে ছোট্ট বালক দাউদের হাতে আল্লাহ ﷻ তাদের বিজয় দান করেন। পরবর্তীতে দাউদ ﷺ-কে নবুওয়ত দেওয়া হয়। এরপরই সেই সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, যে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। যা ফিলিস্তিনের মূল আয়তনের মাত্র ৭৪% ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ফিলিস্তিনের পুরো ভূখণ্ড এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সালে সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পর এ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বদ অভ্যাসগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দীর্ঘ সময় যারা সুলাইমান ﷺ ও তাঁর আগে দাউদ ﷺ-এর শক্তির কাছে বশীভূত ছিল। তাদের অন্তরে কখনও ঈমান বদ্ধমূল হয়নি। এজন্য শুধু সুলাইমান ﷺ-এর মৃত্যুর সুযোগেই তারা আবার তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যায়। উত্তম ও প্রশংসনীয় সব কিছু পরিত্যাগ করে তারা আবার বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়।

আমরা জানি, ইয়াকুব ﷺ-এর ছিল ১২ ছেলে। সেই ১২ জন থেকেই বনী ইসরাইলের ১২টি শাখা গোত্রের উৎপত্তি। ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভক্তিতে লিপ্ত হয়ে ১০ গোত্র একজনের নেতৃত্বে সমবেত হয়। অপর ২ গোত্র সমবেত হয় আরেকজনের নেতৃত্বে। ১০ গোত্রের মিলিত জোট উত্তর ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে ইসরাইলী সাম্রাজ্য। সুলাইমান ﷺ-এর ইন্তেকালের পরপরই এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাকি দুই গোত্র মিলে দক্ষিণ ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে ইয়াহুযা সাম্রাজ্য। এই দুই গোত্র ছিল ইয়াহুযা ও বিনইয়ামীনের বংশধর। উভয় সাম্রাজ্যের সমস্যা ছিল অভিন্ন। অভিন্ন বিশৃঙ্খলা আর পৌত্তলিকতা ছিল উভয় সাম্রাজ্যে। আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তারা। কেনানীরা যেসব দেবতার পূজা করত, সিরিয়া, লেবানন ও আশপাশের ফিনিশিয়ানরা যেসব দেবতার আরাধনা করত, সুলাইমান ﷺ-এর মৃত্যুর সাথে সাথে বনী ইসরাইলও সেগুলোর উপাসনা শুরু করে দেয়।

উত্তর ফিলিস্তিনে ইসরাইল সাম্রাজ্য ২০২ বছরের জন্য টেকসই হয়। ফিতন-ফাসাদ, মতানৈক্য, অবাধ্যতা, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন ছিল সেই সাম্রজ্যের মজ্জাগত বিষয়। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাদের উপর অ্যাসিরিয়ানদের চাপিয়ে দেন। অ্যাসিরিয়ানরা ছিল ইরাকের অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ সালে তারা হামলা করে। এবং ইসরাইল সাম্রাজ্য তছনছ করে দেয়। এই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ইসরাইলীকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে দাস হিসাবে বিক্রি করে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে দশগোত্রের ইহুদীরা দুনিয়ার ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর ইতিহাসের কোথাও এই দশ গোত্রের ইহুদী বলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বাকি থাকে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের ইয়াহুযা সাম্রাজ্য। যা বিনইয়ামিন ও ইয়াহুযা গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, বনী ইসরাইলের রাজত্ব ছিল ইয়াহুযা গোত্রের মধ্যে। তাই বনী ইসরাইল নিজেদেরকে ইয়াকুব ﷺ-এর পুত্র ইয়াহুযার দিকে সম্বন্ধ করে 'ইয়াহুযী' বা 'ইয়াহুদী' পরিচয় দিয়ে থাকে। এই নাম মুসা ﷺ-এর সময়ে পরিচিত ছিল না। অন্যান্য নবীদের যুগেও না। ইয়াহুযা সাম্রাজ্য ইসরাইল সাম্রাজ্যের চেয়েও

দীর্ঘস্থায়ী হয়। আরও ১৫০ বছর বা তারও বেশি সময় তা টিকে থাকে। নির্ধারিত করে বললে, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সাল পর্যন্ত।

এরপর আল্লাহ ﷻ তাদের উপর লেলিয়ে দেন এমন এক সম্প্রদায়কে যারা এ রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। কেননা, ইহুদীরা দীর্ঘকাল থেকে না-ফরমানী করে আসছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে ইরাক থেকে আল্লাহ ﷻ এক কওম প্রেরণ করেন। তারা ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। পুরো সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার হুংকার দেয়। কিছু জনপদ তারা তখনই ধ্বংস করে দেয়। এবং এ সাম্রাজ্য থেকে প্রায় ১০ হাজার ইহুদীকে বন্দী করে ইরাকের ব্যাবিলন শহরে নিয়ে যায়।

এ লাঞ্ছনাকর দাসত্ব ও বন্দীত্ব সত্ত্বেও তারা আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচার অব্যাহত রাখে। ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে আল্লাহ ﷻ তাদের উপর দ্বিতীয় ধ্বংসযজ্ঞ চাপিয়ে দেন। এ ধ্বংসলীলার সেনাপতি ছিল 'নেবুচাদনেজার'। কোনো কোনো বর্ণনায় তার নাম এসেছে 'বখতনসর'। বখতনসর ছিল ইরাকের ব্যাবিলনদের সেনাপতি। সে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড থেকে ইহুদীদের নাম নিশানা পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়। ইয়াহুযা সাম্রাজ্য তছনছ করে ফেলে। মসজিদে আকসা ধ্বংস করে ফেলে, যাকে তারা টেম্পল বলত। এ ধ্বংসলীলার পর প্রায় ৪০ হাজার ইহুদী নিয়ে সে ফিলিস্তিন ত্যাগ করে। ইতিহাসে এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয় দ্বিতীয় ব্যাবিলন বন্দীদশা। এর মাধ্যমে ইহুদী সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ পতন সম্পন্ন হয়।

এ পতনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তৎকালীন ইহুদী শাসনের সমাপ্তি ঘটে, যা খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪১৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর মধ্যে ৮০ বছর ছিল ঈমানী শাসন। দাউদ ও সুলাইমান ﷺ ও তাঁদের সৈন্যবলের সামনে ইহুদীরা তা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। তখনও তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। এরপর ৩৩৮ বছর ইহুদীরা শাসন করে ফেতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে। নবীদের উপস্থিতিতেও তারা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হত। এমন কি তারা অনেক নবী-রসুলকে হত্যাও করে। আল্লাহর কিতাব ও প্রিয় নবী ﷺ-এর হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত।

বখতনসর ইহুদীদের উপর ধ্বংসলীলা চালানোর দীর্ঘকাল পর তারা আবার ফিলিস্তিনে ফিরে আসে। তবে ফিলিস্তিনের শাসকবেশে ফিরে আসতে পারেনি। মোটকথা, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে তাদের ঈমানী শাসন ছিল মাত্র ৮০ বছর। ইহুদীরা এ ভূখণ্ডে তাদের অগ্রাধিকার ও মালিকানাসহ সকল দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে এই ৮০ বছরের শাসনামলের উপর নির্ভর করে। তারপরও দেখুন, এই ঈমানী যুগে যারা এ ভূখণ্ড শাসন করেছেন সেই মহান নবী-রসুলের ব্যাপারে তারা কী সব অবান্তর কথা বলে থাকে।

যাইহোক, বখতনসরের ধ্বংসলীলার পর ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বাকি বনী ইসরাইল মিসর পালিয়ে যায়। তাদের বেশিরভাগকে আগেই বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রথম বন্দীত্বের সময় ১০ হাজার। দ্বিতীয় বন্দীত্বের সময় ৪০ হাজার।

এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হচ্ছে এসব ইহুদী ইরাকের ভূখণ্ডে যাওয়ার পর তাওরাত সংকলন শুরু করে। যখন তারা তাওরাত সংকলন শুরু করে, তখন থেকে মুসা ﷺ-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের দূরত্ব প্রায় ৭০০ বছর। চিন্তা করুন, নাযিল হওয়ার পর ৭০০ বছর পর্যন্ত তাওরাতের সংকলন হয়নি। তার মানে এই দীর্ঘ সময় তাদের সামনে তাওরাত ছিল না। কারণ, তাবুত ও তাওরাতের ফলকসমূহ চুরি হয়েছিল। তাদের কাছে শুধু কিছু স্মৃতিকথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যেগুলো তারা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করত। এবার ভেবে দেখুন, তাওরাতে কী পরিমাণ বিকৃতি ঘটতে পারে? বিশেষত যখন তা মিথ্যাবাদী ভবঘুরে ইহুদীদের হাতে পড়েছে। উপরন্তু তারা দুই-এক বছরে এর লেখা সম্পন্ন করেনি; বরং ধারাবাহিক ৪০০ বছর পর্যন্ত লিখে তাওরাতের বর্তমান রূপ দাঁড় করিয়েছে।

সুতরাং এখানে এমন একটি গ্রন্থের কথা আলোচনা করা হচ্ছে বিবেক ও দলিল-প্রমাণের আলোকে যা বিশুদ্ধ হওয়া একেবারে অসম্ভব। বিশেষ করে সুস্থ বোধ থেকে দূরত্ব এবং নবীদেরকে অভিযুক্ত করার পর তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। এর শ্লোকে শ্লোকে সংঘর্ষ, এক বক্তব্যের সাথে আরেক বক্তব্যের অমিল, আগের অংশের সাথে পরের

অংশের সমন্বয়হীনতা এবং দুর্বল উপস্থাপনসহ অসংখ্য অসঙ্গতি রয়েছে বিকৃত এই গ্রন্থে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনের একটি আয়াতে ইহুদীদের উল্লিখিত বিপর্যয়ের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন—

> অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময় এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। [সুরা বনী-ইসরাঈল :৫]

অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এখানে বনী ইসরাইলের প্রথম ফেতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও ঔদ্ধত্য উদ্দেশ্য, যা সুলাইমান ﷺ-এর পরে ঘটেছিল। এই ফেতনা-ফাসাদের কারণে আল্লাহ ﷻ তাদের উপর বখতনসরকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বনী ইসরাইলের উপর ধ্বংসলীলা চালায়। তাদের শক্তি ও রাজত্ব নিঃশেষ করে দেয়।

কতিপয় মুফাসসিরের মতে এ বিপর্যয় বখতনসরের মাধ্যমে হয়নি। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে 'ইবাদান লানা' বা 'আমার বান্দাগণ' বলেছেন। আর বখতনসর ছিল পৌত্তলিক। আল্লাহর মুমিন বান্দা ছিল না।

আমরা বলব, কোনো জালেম কর্তৃক আল্লাহ ﷻ-র এবাদত প্রত্যাখ্যান তার বান্দা হওয়ার বৈশিষ্ট্য নাকচ করে না। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর বান্দা। সে স্বীকার করুক বা না করুক। আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। চাই সে অবাধ্য হোক বা অনুগত। কাফের হোক বা মুমিন।

তাছাড়া আল্লাহ ﷻ 'আমার বান্দা' বলেছেন, 'আমার ইবাদাতকারী' বলেননি।

এ ক্ষেত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর বাণীতে একটি সুন্দর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ইরাক অভিমুখে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণের সময় বলেছিলেন—

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যাচ্ছ। তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ো না এবং একথা বলো না যে শত্রুরা যেহেতু আমাদের চেয়ে খারাপ, তাই তাদেরকে আমাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে না। আল্লাহ ﷻ বনী ইসরাইলের উপর অগ্নিপূজকদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ছিল কাফের। আর বনী ইসরাইল ছিল আল্লাহর এবাদাতকারী। যখন বনী ইসরাইল দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা করেছিল। শত্রুরা জনপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আর এ ছিল কার্যকর ওয়াদা। [আল ইকদুল ফারীদ : ১ম খণ্ড ১১৭পৃষ্ঠা]

লক্ষ্য করুন, কীভাবে উমার ﷺ আয়াতের শব্দগুলোই ব্যবহার করেছেন। তিনি আয়াতের মতলব এটাই বুঝেছেন যে, বখতনসর মুমিন ছিল না; কিন্তু তাকেই আল্লাহ ﷻ বনী ইসরাইলকে ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এটা ছিল ইহুদীদের প্রথম উত্থান, দেখা যাক, তাদের দ্বিতীয় উত্থান কী?

সম্ভবত বর্তমান ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যা ঘটছে, সেটাই তাদের দ্বিতীয় উত্থান। বর্তমান উত্থানে তারা ফিলিস্তিনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের হাত প্রসারিত হয়েছে বহু দূর পর্যন্ত। মিসর, লেবানন ও জর্ডানের বহু জায়গা তারা জবরদখল করেছে। দখল করেছে সিরিয়ার কিছু অংশ। এখনও তাদের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার নীল নকশায় তারা আজও আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে তাদের রয়েছে অর্থনৈতিক যোগাযোগ। রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সামাজিক রূপরেখা। রয়েছে উদ্দেশ্য সাধনের নানা নীল নকশা। আমরা সবাই জানি, আশপাশে অনেকগুলো মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে এই ক্ষুদ্র বিষফোড়া। এগুলো সবই উত্থান। আল্লাহ ﷻ-এর কিতাবে আগত সুসংবাদের ভিত্তিতে আমরা আশা রাখি, অসত্বর তিনি এসব ইহুদীদের উপর আবার তাঁর বান্দাদের চাপিয়ে দিবেন। আবার তাদের বিপর্যয় ঘটবে। সীমাহীন ফেতনা-ফাসাদ, জুলুম-অত্যাচার ও কুকর্মের দরুন আগে তারা যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এখানে আমি তাওরাত ও তালমুদে বর্ণিত বখতনসরের হাতে বনী ইসরাইলের বিপর্যয়ের কারণ সংশ্লিষ্ট স্বয়ং ইহুদীদের ব্যাখ্যা তুলে ধরছি। যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, বিষয়টি তাদের ভালোভাবেই জানা আছে। তবে তারা স্বেচ্ছায়ই ভ্রান্তির পথ বেছে নিয়েছিল।

ইহুদীদের কাছে তাওরাতের একটি পবিত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ হল 'তালমুদ'। সেখানে রয়েছে– *এটা* (বখতনসর কর্তৃক ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের ধ্বংস) *তখন সংঘটিত হয়, যখন বনী ইসরাইল তাদের পাপাচারের শেষ সীমানায় উপনীত হয়। মহান প্রভুর সহ্যসীমাকেও তারা অতিক্রম করে। যখন তারা জেরিমিয়ার নির্দেশ ও সতর্কবাণী শুনতে অস্বীকৃতি জানায়।*

জেরিমিয়া তাওরাত বর্ণিত ইহুদীদের একজন নবী। তাওরাতের ভাষ্যমতে জেরিমিয়া বখতনসরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন– *তুমি ধারণা করো না যে, শুধু নিজের শক্তিবলে তুমি আল্লাহর নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর উপর বিজয়ী হতে পেরেছ। এটা তাদের পাপাচার ও কুকর্মের ফল, যা তাদের উপর এই শাস্তি টেনে এনেছে।*

ইহুদীদের পবিত্র তালমুদে একথা বর্ণিত আছে। এমনিভাবে ইশইয়া-এর বাণীও তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। তিনিও বনী ইসরাইলের একজন নবী। তাওরাতের ইশইয়া অংশে তিনি বলেন– *বিভ্রান্ত জাতির প্রতি দুর্ভোগ! পাপের সাগরে নিমজ্জিত জনগোষ্ঠী। কুকর্মকারীদের বংশধর। ফাসাদ সৃষ্টিকারী সন্তান। যারা রবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসরাইলের পবিত্রতার অবমাননা করেছে। পশ্চাদপদ হয়েছে। ...*

এসব কথা তাওরাতে রয়েছে। আরও বর্ণিত আছে–

দুনিয়া তার বাসিন্দাদের নীচে কলুষিত হয়ে উঠেছে। কেননা, তারা শরীয়তের সীমা লংঘন করেছে। ফরজ বিধান পরিবর্তন করেছে। চিরন্তন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

একথা রয়েছে তাদের নিজেদের গ্রন্থে। তা হলে চিন্তা করুন যে, বাস্তবতা কেমন ছিল। যখন তারা তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে নিজেরাই এসব কথা বলেছে, তখন বাস্তবরূপ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

তারা পৌত্তলিকতা ও গুমরাহীতে লিপ্ত হয়েছিল। দীন থেকে এত দূরে সটকে গিয়েছিল যে, কোনো বিবেক তা ধারণা করতে পারবে না এবং তার বিবরণ দিতে পারবে না কোনো কলম। মুসা ﷺ থেকে শুরু করে অন্যান্য নবীর কাহিনীতে তাদের স্বভাব সম্পর্কে আমাদের রব যে বিবরণ দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট।

বখতনসরের অভিযান ও ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। শুরু হয় ব্যাবিলন শাসন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৭ বছর তা স্থায়ী হয়। কেমন যেন তারা শুধু বনী ইসরাইল আর জালেম ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতেই এসেছিল। যারা ছিল আল্লাহ ﷻ-এর শরীয়ত থেকে অনেক দূরে। ব্যাবিলন শাসনের পর শুরু হয় পারসিক শাসন। যারা ইরানের ভূখণ্ড থেকে এসেছিল। ইরাক ও ইরানের ভূখণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আজও যা বিদ্যমান। ইসালামী সাম্রাজ্য সূচিত হওয়ার আগে এবং পরেও।

পারসিক ও ব্যাবিলনদের মধ্যে যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে। ইহুদীরা সাইরাস দ্যা গ্রেটের নেতৃত্বাধীন পারসিকদের সহায়তা করলে যুদ্ধে পারস্য বিজয় লাভ করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইহুদীরা বন্দী হয়ে ব্যাবিলন এসে দাসত্বের জীবন যাপন করছিল। কাজেই তারা ব্যাবিলনদের বিরুদ্ধে পারসিকদের সাহায্য করে। এ বিজয়ের পর ফিলিস্তিন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এ শাসনামল ২০৭ বছর স্থায়ী হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সালে প্রসিদ্ধ রোমান সেনাপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পারস্যকে পরাজিত করে। প্রতিষ্ঠা করে গ্রিক শাসন। তারাও ছিল পৌত্তলিক।

ইহুদীরা বিজয়ী সেনাপতি আলেকজান্ডারের অধীনে বসবাস করতে থাকে। ফিলিস্তিন বিজয়ের এ যাত্রায় আলেকজান্ডার মিসর ও ইরাকসহ এশিয়ার বহু অঞ্চল জয় করে। এতে তার সাম্রাজ্য ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়।

এখানে আমি প্রসিদ্ধ একটি ভুলের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। অনেকেই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে 'যুলকারনাইন' বলতে চান। তার কাহিনীকে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের কাহিনীর সাথে মিলিয়ে ফেলেন। আমরা এখানে বলি, কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইন ছিলেন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। একজন নেককার বান্দা। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার ছিল একজন পৌত্তলিক। সে ওইসব দেব-দেবীরই পূজা করত, যেগুলোর পূজা করত গ্রিকরা। তাই উভয়কে মিলিয়ে ফেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

আলেকজান্ডার ও তার পরবর্তী প্রজন্ম দীর্ঘ ২৬৯ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তিন শাসন করে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল পর্যন্ত। গ্রিকরা ছিল উন্নত সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী। যা দেখে ফিলিস্তিনের ইহুদীরা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা গ্রিকদের ভাষা ও জীবনধারা অধ্যয়ন করতে শুরু করে। ফিলিস্তিনে বসবাসকারী স্বল্পসংখ্যক ইহুদী তখন দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একদল গ্রিকদের অনুসরণ করে তাদের মধ্যে মিশে যায়। গ্রিকদের স্বভাব-চরিত্র ও জীবনধারা গ্রহণ করে। গ্রিক দেব-দেবীর উপাসনাও শুরু করে দেয়। এসব ইহুদীরা বিকৃত মূল তাওরাতের মধ্যে আরও পরিবর্তন-পরিবর্ধনে লিপ্ত হয়।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, রব সম্পর্কে তারা কীভাবে মন্তব্য করে। এই শ্রেণির ইহুদীদের মতে রব পবিত্র কোনো সত্তা নন। তাদের মতে রব কখনও মানুষের কাছে পরাজিত হন। এমন কি অনেক কিছু তিনি ভুলেও যান। কখনও তাঁর চরিত্র হয় অসম। এরূপ আরও অসংখ্য ভ্রান্তি রয়েছে, যেগুলো গ্রীক চেতনা থেকে বের হয়ে ইহুদী ধর্মকে আচ্ছন্ন করেছে।

ক্ষুদ্র আরেকটি দল আগের বিকৃত ইহুদী ধর্মের উপর অটল থাকে। অন্য দলটির মত তারা গ্রিকদের মধ্যে নিজেদের বিলীন করেনি। তারা তাদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশকারী 'জুডাস ম্যাকাবি'-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে সে ছিল একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার নেতৃত্বে এ দলটি কয়েকটি বিপ্লবও ঘটায়।

গ্রিকরা এ বিপ্লবকে মূল্যায়ন করে। তারা জুডাস ম্যাকাবিকে আল-কুদস শহরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। এই প্রবেশ ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১১৬ সালের ২৫ জানুয়ারি। এ দিনটি ইহুদীদের একটি প্রসিদ্ধ আনন্দের দিন। এর নাম আলোর উৎসব বা 'হানুকা'। কেননা, এক ইহুদী বিকৃত তাওরাতকে সংরক্ষণ করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল পর্যন্ত এমনই ছিল ফিলিস্তিনের অবস্থা। এরপর নতুন শাসনের উত্থানে পরিস্থিতি একেবারে বদলে যায়। সেই আধিপত্য চলতে থাকে ধারাবাহিক ৭০০ বছর।

আসুন, দেখে নিই কী ছিল সেই নতুন শাসন?

ওই সময়কালে কী কী ঘটনা ঘটে?

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ঈসা ﷺ-এর ইতিহাস কী?

মসীহের জন্ম ও ইহুদী অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি

ঈসা ﷺ-এর জন্মের ৩২৪ বছর পর এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যা তৎকালীন দুনিয়ার পুরো প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে দেয়। তা হল রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। তার মা আগেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। কনস্টানটাইন রোমান সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। কনস্টান্টিনোপল শহরের স্থপতি সে। যা পরবর্তীতে প্রসিদ্ধ বাইযান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। যেটা বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর। সম্রাট কনস্টানটাইন রোম শহরে অবস্থান করে বিস্তীর্ণ রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করত। ভূমধ্য সাগরের পার্শ্ববর্তী সবগুলো দেশ ছিল এ সাম্রাজ্যের অধীনে। রোম সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি উপসাগরের নামে এই সাগরের নামকরণ করা হত। এজন্য পুরানো কাগজ-পত্রে এ সাগরকে রোম সাগরও বলা হয়েছে। ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানীসহ পূর্ব ইউরোপ পুরোটা ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। সেই সাথে জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ শামের পুরো উপকূল। মিসর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো ও আলজেরিয়াসহ আরও অনেক ভূখণ্ড। তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর খ্রিস্টধর্মই হয়ে ওঠে এসব ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ফলে বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টধর্ম দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পৌত্তলিকতা থেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের হিরিক পড়ে যায় সর্বত্র। কিন্তু এসব অঞ্চলের পৌত্তলিক চেতনার প্রভাব তখনও অবশিষ্ট থেকে যায়। ধীরে ধীরে তা নতুন খ্রিস্টান ধর্মে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ওইসব অঞ্চলে যেসব কু-সংস্কার বিদ্যমান ছিল– একাধিক ঈশ্বরের ধারণা, ঈশ্বরের আকৃতি, ঈশ্বরের বিবাহ করা ও সন্তান জন্ম দেওয়াসহ দীর্ঘকাল যেসব

পৌত্তলিক মতাদর্শে জীবনাতিপাত চলে আসছিল, তার সবই নতুন ধর্মে অনুপ্রবেশ করে। ফলে খ্রিস্টধর্ম তার এ বিকৃত রূপ নিয়েই রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করা এসব অঞ্চলের মধ্যে ফিলিস্তিন ছিল অন্যতম। কারণ, এ ভূখণ্ডও তখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় তিন শতাধিক বছর এখানে খ্রিস্টধর্ম অবশিষ্ট থাকে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাব পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, ঈসা عليه السلام-এর জন্মের পরবর্তী দীর্ঘ ৩০০ বছরে ফিলিস্তিনের যৎসামান্য লোকই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার প্রসিদ্ধ সম্রাট কনস্টানটাইনের কৃতিত্ব। তার মা একবার ফিলিস্তিন পরিদর্শনে গিয়েছিল। সেখানে সে অনেক গির্জা নির্মাণ করে। কেননা, সে তখন নতুন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ নতুন ধর্মের সেবায় ব্রতী ছিল সে। আল-কুদস শহরে সে নির্মাণ করেছিল আজকের প্রসিদ্ধ 'পুনরুত্থান গির্জা'। এ গির্জা নির্মাণের পিছনে যে কাহিনী তারা দাবি করে, তা হল ঈসা عليه السلام-কে হত্যা করা হলে তিনি তিনদিন মৃত ছিলেন। এরপর ফিলিস্তিনের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ঈসা عليه السلام-এর আত্মপ্রকাশের এই জায়গায় তারা 'পুনরুত্থান গির্জা' নির্মাণ করে। পুনরুত্থান মানে ঈসার নিহত হওয়ার তিনদিন পর পুনরায় আত্মপ্রকাশ। এই কাহিনী নিতান্ত বানোয়াট। বিশুদ্ধতার লেশমাত্রও এতে নেই। আমরা জানতে চাই, প্রভু যেই তিনদিন অদৃশ্য ছিলেন, সেই তিনদিন দুনিয়ার অবস্থা কী হয়েছিল?

রোমান বাইযান্টাইন বিশ্বাসে দেখতে পাবেন, তারা বলে, ঈশ্বর যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তখন দুনিয়াতে ভূমিকম্প হয়। তা হলে আপনিই অনুমান করুন, ঈশ্বর গায়েব হচ্ছেন এবং তিনদিনের জন্য মারা যাচ্ছেন...!!

এটা এমন এক ফালতু বক্তব্য, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউই পেশ করেনি। বড় আফসোসের কথা, খ্রিস্টানরা বলে থাকে, সম্রাট কনস্টানটাইনের মা হেলেনা এই জায়গাতেই পুনরুত্থান গির্জা নির্মাণ

করেছে। এমনইভাবে বেথেলহেমে সে নেটিভিটি গির্জা নির্মান করে এবং নাজারেথে নির্মাণ করে এ্যানাসিয়েশন গির্জা। যেখানে ঈসা عليه السلام বেড়ে উঠেছিলেন।

এভাবে পুরো ফিলিস্তিনে খ্রিস্টবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তবে রোমানরা মসজিদে আকসার কাছে যায়নি। মসজিদে আকসা এমন একটি স্থান, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী আল্লাহর উপাসনা হয়ে আসছে। যেখানে ঈসা عليه السلام তাঁর রবের এবাদত করেছেন। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী বনী ইসরাইলের প্রথম নবী ইউশা عليه السلام যেখানে আল্লাহর এবাদত করেছেন। এমনইভাবে দাউদ ও সুলাইমান عليه السلام-সহ বনী ইসরাইলের সমস্ত নবী যেখানে আল্লাহর এবাদত করেছেন। হয়তো এজন্যই বাইযান্টাইনরা তার কাছে ঘেঁষেনি। আমরা আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করি যে, খ্রিস্টানদের বর্ণনাগুলো একথা স্বীকার করে যে, তারা মসজিদে আকসার কাছে যায়নি। এবং সেটা গির্জায় পরিণত করেনি। অন্যথায় পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য এটাকে মসজিদে রূপান্তর করা মুশকিল হয়ে যেত। এ ছিল রব্বুল আলামীনের কুদরত।

ফিলিস্তিনে খ্রিস্টীয় সময়কাল ৩১২ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইসলামী বিজয়ের আগ পর্যন্ত। এখানে একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে খ্রিস্টবাদের একটি কাহিনী বর্ণনা করি। খ্রিস্টীয় ৩২৪ সালে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর পঞ্চাশেরও অধিক সংখ্যক ইঞ্জিল দেখতে পায় সে। আয়াত সম্বলিত অগনিত পত্রও পায়। যেগুলো সম্পর্কে বলা হত যে, এগুলো ঈসা عليه السلام-এর উপর অবতীর্ণ ওহী কিংবা তাঁর বাণী। কাজেই সম্রাট কনস্টানটাইন একটি সম্মেলনের নির্দেশ দেয়। যেখানে সমগ্র দুনিয়া থেকে খ্রিস্টানরা সমবেত হবে। তারা ওইসব ইঞ্জিল পেশ করবে, যার নিয়মে প্রভুর উপাসনা করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় 'নিকিয়া সম্মেলন'। বর্তমান তুরস্কে সেই নিকিয়া শহর আজও বিদ্যমান। সে সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক উচ্চপদস্থ খ্রিস্টান পাদ্রী, যাযক ও বীশপ একত্র হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। কোনো কোনো বর্ণনায় ৪০০ জন। কোনো কোনো বর্ণনায় ৫০০ জন। তারা আলোচনা করে যে, সেই ইঞ্জিল কোনটি, যার অনুসরণ করা আবশ্যক।

প্রত্যেকে নিজের সাথে থাকা ইঞ্জিল বের করে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশেরও অধিক ইঞ্জিল ও অসংখ্য পত্র পাওয়া যায়। এসব ইঞ্জিলের মধ্য থেকে তারা চারটি ইঞ্জিলের ব্যাপারে একমত হয়। সেগুলো হল মথি (Matthew), মার্ক (Mark), লুক (Luke) ও যোহন (John)। এছাড়াও আরও অনেক প্রসিদ্ধ ইঞ্জিল রয়েছে, যেগুলো নিকিয়া সম্মেলনে গৃহীত হয়নি।

অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগামীতে এই চারটি ইঞ্জিলেরই শুধু অনুসরণ করা হবে। স্বভাবত এসব ইঞ্জিলের পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে অনেক দ্বন্দ্ব। এমনকি একই ইঞ্জিলের বাণীসমূহের মধ্যেও রয়েছে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব। কেননা, এগুলো মানুষের হাতে রচিত এবং ঈসা ﷺ-এর অদৃশ্য হওয়ার কয়েক শত বছর পর সংকলিত। আগে আমরা তাওরাত সম্পর্কে বলেছি যে, যেই মুসা ﷺ-এর উপর তা নাযিল হয়েছিল, তাঁর ইন্তেকালের ৭০০ বছর পর সেটা সংকলিত হয়। সেটা তারা ৪০০ বছর সময় লাগিয়ে লেখে। এবার চিন্তা করুন যে, কী পরিমাণ বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্ট (তাওরাত) এবং কী পরিমাণ বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছে নিউ টেস্টামেন্ট (ইঞ্জিল)?

দীর্ঘকাল ফিলিস্তিনে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জেনে রাখা উচিত। তা হল ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল। আর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম। রসুল ﷺ-এর জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এবং যাবতীয় বিষয়াদি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়, যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। ফিলিস্তিনসহ সিরীয় ভূখণ্ডগুলো সব এ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যা হোক, ৪৭৬ সাল থেকে ফিলিস্তিনে শুরু হয় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শাসন। যা নবী ﷺ-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত প্রায় ১৬০ বছর স্থায়ী হয়।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও তা ছিল রোম ও পারস্যের দ্বন্দ্বের জায়গা। এ রেষারেষির জের ধরে ৬১৪ সালে

নববী যুগে সংঘটিত হয় সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। যাতে পারস্য বিজয় লাভ করে। পারসিকরা রোমানদের থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেয়। এর বিবরণ নিয়ে আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন—

> আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে। [সুরা রুম : ১, ২]

রোমানদের এ পরাজয় মক্কার মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলে। এর সাত বা নয় বছর পর রোমানরা আবার পারসিকদের পরাজিত করে। তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আধিপত্য ফিরিয়ে আনে। যেমন, আমাদের রব ﷻ উল্লেখ করেছেন—

> (রোমানরা পরাজিত হয়েছে) নিকটবর্তী অঞ্চলে। পরাজয়ের পর সত্বর তারা বিজয়ী হবে। [সুরা রোম : ৩]

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। তখন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড ছিল রোমানদের অধীনে। আনুমানিক ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবুওয়ত লাভ করেন। একত্ববাদের বাণী প্রচারে আদিষ্ট হন। তাঁর আবির্ভাব ছিল পুরো দুনিয়ার জন্য একটি বিস্ময়। ফিলিস্তিনবাসীদের জন্যও। ইহুদী-খ্রিস্টানসহ সব মানুষের জন্য এ ছিল বিস্ময়। তবে স্বল্প সংখ্যক ইহুদী আলেম ও খ্রিস্টান পাদ্রী ছিল ব্যতিক্রম। তারাই শুধু বিশ্বাস করতেন যে আমাদের রব এক। সমস্ত এবাদত তাঁকেই উৎসর্গ করা বাঞ্ছনীয়। তারা স্বীকার করতেন যে, এ যুগে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা জানতেন, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন। তারা ছিলেন খুব স্বল্প সংখ্যক। তৎকালীন দুনিয়ার দূরাবস্থা ছিল খুব উদ্বেগজনক। রসুল ﷺ খুব সংক্ষেপে সে অবস্থা চিত্রায়িত করেছেন। তাঁকে সমৃদ্ধ কথা বলার দক্ষতা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বলেন—

> আল্লাহ ﷻ দুনিয়াবাসীর প্রতি দৃষ্টি দেন। আরব-অনারব সকলের প্রতি রুষ্ট হন। তবে স্বল্প সংখ্যক আহলে কিতাব বাদে। [মুসলিম : ৭৩৮৬]

তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নিতান্তই কম। হাদীসে বর্ণিত 'বাকায়া' আরবী শব্দটি নগণ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। তখন কোনো দল বা জনগোষ্ঠী

ছিল না; বরং সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু ব্যক্তি, যারা আল্লাহ ﷻ-এর এবাদত করতেন।

দুনিয়ার অবশিষ্ট মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল পৌত্তলিকতা ও কুফরের চূড়ান্ত সীমায়। সত্য থেকে তারা এতটাই দূরে সরে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ﷻ তাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ ছিল পুরো দুনিয়ার অবস্থা। আমরা দেখতে পাই সালমান رضي الله عنه সে যুগে সত্যের সন্ধানে কী পরিমাণ ছুটে বেড়িয়েছেন। সত্যের সন্ধানে তিনি পারস্য থেকে বেরিয়ে বহু শহর ঘুরেছেন। এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতেন। সেখানে মাত্র একজন লোককে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত পেতেন। শামে একজন, অ্যামোরিয়ামে একজন, নিসিবিসে একজন। এক পর্যায়ে তিনি সংবাদ পান যে, এ যুগে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি তাঁকে পাওয়ার জন্য ছুটতে থাকেন। এক পর্যায়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌঁছেন। এ ঘটনা সাক্ষ্য বহন করে যে, তৎকালীন দুনিয়ায় আল্লাহর প্রকৃত এবাদাতকারীর সংখ্যা ছিল খুব কম। এতটাই কম যে, আমরা চাইলে তাদের নাম ও জায়গা উল্লেখ করে গণনা করে দিতে পারি।

তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে নবী ﷺ প্রেরিত হন। যেমন, পূর্ববর্তী নবীরা একই দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। আদম عليه السلام থেকে নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত নবীর কার্যক্রম ছিল এক ও অভিন্ন।

মক্কা মুকাররামায় তিনি অনেক নিগ্রহের সম্মুখীন হন। ধারাবাহিক ১৩ বছর তিনি মক্কায় এক দুর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করেন। এক পর্যায়ে হিজরতের নির্দেশ আসে। এখানে আমাদের রসুল ﷺ-এর জীবন চরিত্র বা ফিলিস্তিনের বাইরের অন্য কোনো ঘটনা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু সেই আলোচনটুকুই করব যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফিলিস্তিনের কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও তা ঘটে থাকে এ বরকতময় ভূখণ্ডের বাইরে।

ফিলিস্তিনের সাথে রসুল ﷺ-এর সম্পর্ক

নবুওয়াতপ্রাপ্তির সূচনাকাল থেকেই রসুল ﷺ-এর ছিল ফিলিস্তিনের সাথে দৃঢ় বন্ধন। মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে সালাত আদায় করতেন। ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিন থেকেই মসজিদে আকসা মুসলমানদের কিবলা। সত্যিই বিষয়টি বিস্ময়কর। সালাত হচ্ছে মুসলমানদের উপর ফরজকৃত অন্যতম প্রথম এবাদত। মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করার আগ থেকে সালাতের আমল শুরু হয়। কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে– মুশরিকরা অবাক হয়ে মুসলমানদের সালাত আদায় দেখত। সেই সালাত মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তারা বলাবলি করত, এর কাছে নাকি আসমান থেকে স্বপ্ন বা ওহী আসে।

রসুল ﷺ তখনও রিসালাতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেননি। মুসলমানরা তখন মক্কায়। কাবার মাটিতে। অথচ তারা সালাত আদায় করেন ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা অভিমুখে। কয়েকটি কারণে এ ছিল খুব বিস্ময়কর।

প্রথমত : কাবার মর্যাদা বেশি। কাবা তাদের পাশেই অবস্থিত। তবুও কেন আল্লাহ ﷻ তাদেরকে মসজিদে আকসামুখী হতে নির্দেশ দেন। অথচ আমরা সবাই জানি কাবার মর্যাদার তুলনায় আকসার মর্যাদা কম। তবুও আল্লাহ ﷻ আকসা পানে অভিমুখী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর।

দ্বিতীয়ত : তৎকালীন লোকজন মসজিদে আকসা চিনত না। মক্কা মুকাররামা ও আরব উপদ্বীপের মানুষ যখন এই নতুন ধর্ম ও তার

শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইত, তখন জওয়াব ছিল, আমরা সালাত আদায় করি এবং তাতে মসজিদে আকসার প্রতি অভিমুখী হই।

মসজিদে আকসা কেন? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই দেখা দিতে পারে। অথচ যদি বলা হত, বাইতুল্লাহ অভিমুখে তা হলে কেউ আর প্রশ্ন তুলবে না। কেননা, তৎকালীন মক্কা ও পুরো আরব উপদ্বীপে কাবা ছিল সুপরিচিত। কিন্তু যখন বলব, মসজিদে আকসা। তখন প্রশ্ন উঠবে এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে।

তাছাড়া মসজিদে আকসা ছিল বিরান। মেরাজের রাতে রসুল ﷺ-কে যখন মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সেখানে তিনি শুধু নির্ধারিত ভবন দেখেছিলেন। যার পূর্ণ বিবরণও তার আয়ত্বে ছিল। কিন্তু তা ছিল বিরান ও পরিত্যাক্ত। যুগ যুগ থেকে তা ছিল অনাবাদ। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যখন খ্রিস্টধর্মের বিস্তার ঘটে, তখন তারা মসজিদে আকসার কোনো যত্ন নেয়নি। তবে আশপাশের আল-কুদস ও অন্যান্য শহরে অবস্থিত গির্জাগুলোর পরিচর্যা করেছিল।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে আমাদের রব ﷻ জানতেন যে, মুসলমানদের সর্বশেষ কিবলা হবে মক্কায় অবস্থিত কাবা। তা হলে এই ব্যতিক্রম একটি ধাপের কী প্রয়োজন ছিল? কেন মুসলমানরা নির্দিষ্ট একটা সময় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড বা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেন? এরপর তারা চিরন্তন কিবলার দিকে ফেরেন, যা রসুলের অবশিষ্ট জীবন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার অবশিষ্ট জীবনে বলবৎ থাকবে। আজ সমস্ত মুসলমানের একমাত্র কিবলা কাবা। তা হলে কেন কিছুদিনের জন্য মসজিদে আকসাকে কেবলা করা হয়েছিল? আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে মসজিদে আকসামুখী করা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত করে। আমি আপনাদের সামনে শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় তুলে ধরছি।

প্রথম বিষয় : সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত হচ্ছে পূর্ববর্তী সব নবীর দাওয়াতের পরিপূরক ও পরিসমাপ্তি। এ ছিল আল্লাহর এবাদত ও একত্ববাদের দাওয়াত। রসুল ﷺ-এর আগে অসংখ্য নবী-রসুলের ওহীর অবতরণস্থল ছিল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড। আল্লাহ ﷻ

মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডমুখী করার মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে একই চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করেছেন। অর্থাৎ সমস্ত নবী একই ইলাহ অভিমুখী। একই রবের উপাসক। যদিও যুগের চাহিদার কারণে শরীয়ত ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। তবে সমস্ত শরীয়ত একই ইলাহের এবাদতের পথ নির্দেশ করে। তিনি হলেন রব্বুল আলামীন ﷻ। দাউদ, সুলাইমান, মুসা, ইউশা ও ঈসা ﷺ-এর রব। এই বরকতময় ভূখণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত নবী ও জনসাধারণের রব। কত শত নবীই না বসবাস করেছেন এ ভূখণ্ডে। এ হল প্রথম মর্ম। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে রয়েছে সমস্ত নবীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ। আমরা বলি না যে, আমাদের দীন পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মকে ছোট করেছে। যদ্দরুন পূর্ববর্তী নবীদের মর্যাদাহানী হবে। আমরা তাদের মর্যাদা সম্মানকে সমুন্নত করতে সচেষ্ট। পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনয়ন আমাদের ঈমানের অন্যতম একটি রুকন বা ভিত্তি হিসাবে গণ্য।

দ্বিতীয় মর্ম : মসজিদে আকসাকে মুসলিম উম্মাহর প্রথম কিবলা নির্ধারণের অন্যতম একটি রহস্য হচ্ছে সমস্ত মুসলমানের দৃষ্টিতে আল-কুদস, মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তিনের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। এ জন্যই মুসলমানকে ধারাবাহিক ১৫ বছর মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিন থেকে মক্কা জীবনের ধারাবাহিক ১৩ বছর মুসলমানরা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেন। একপর্যায়ে রসুল ﷺ-এর কাবার দিকে অভিমুখী হওয়ার মনোবাসনা জাগ্রত হয়। নিঃসন্দেহে কাবার মর্যাদাই অধিক। এজন্য তিনি কাবা অভিমুখে সালাত আদায়ের মনোবাসনা পোষণ করতেন। এজন্য তিনি সালাত আদায়ের সময় তাঁর ও মসজিদে আকসার মাঝে কাবাঘর রেখে দাঁড়াতেন।

মদীনায় হিজরতের পরও ১৭ মাস মসজিদে আকসা মুসলমানদের কিবলা ছিল। অবশেষে দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ শাবান কিবলার পরিবর্তন ঘটে।

যখন রসুল ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন, তখন মক্কার অবস্থান হয়ে যায় দক্ষিণে এবং আল-কুদস উত্তরে। ধারাবাহিক ১৭ মাস তিনি মসজিদে আকসামুখী হয়ে এবং কাবা পিছনে রেখে সালাত আদায়

করেন। এ সবই ছিল মুসলমানদের অন্তরে মসজিদে আকসার মর্যাদা বদ্ধমূল করার প্রয়াস। কিবলা পরিবর্তন হওয়ার পরও মসজিদের আকসার প্রতি রসুল ﷺ-এর গুরুত্বের কোনো ঘাটতি ছিল না। বরং মসজিদে আকসার সাথে তার হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল চির অটুট। প্রসিদ্ধ হাদীসে বিষয়টি ফুটে উঠেছে—

> তিনটি মসজিদ বাদে আর কোনো মসজিদ অভিমুখে ভ্রমণ করা যাবে না– আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী), মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা। [বুখারী : ১১৯৫]

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি গড়ে তুলেছেন তিনটি বড় মসজিদের মধ্যে অটুট বন্ধন।

প্রিয় মুসলিম ভাই! যদি কাবা বা মসজিদে নববীর কোনো একটি আক্রান্ত হয়, তা হলে আপনার অনুভূতি কী হবে? আজ মসজিদে আকসা দখল হওয়ায় আপনার সেই অনুভূতিই কাম্য। রসুলুল্লাহ ﷺ পূর্বোক্ত হাদীসে তিনটি মহান মসজিদকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন—

> মসজিদে হারামে সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। আমার মসজিদে এক হাজার গুণ। আর মসজিদে আকসায় পাঁচশত গুণ। [মুসনাদু বাযযার : ৪১৪২]

এ হচ্ছে এমন মসজিদ, যার রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য শুধু আকসা মসজিদেরই নয়। বরং পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের। ফিলিস্তিনকে ঘিরে রাখা শাম ও জর্ডানের সকল ভূখণ্ডের। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

নববী যুগে ফিলিস্তিন

ধারাবাহিক ১৫ বছর মুসলমানরা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেন। মক্কা নগরে ১৩ বছর। হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় ১৭ মাস। যা রসুল ﷺ-এর নবুওয়তী জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়। অর্থাৎ এ ১৫ বছর ছিল মূল নবুওয়তের ২৩ বছরের অন্তর্ভুক্ত। নবীজী ﷺ-এর জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করে। এতে রয়েছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুসলমানদের হৃদয়ে আকসার মর্যাদা সমুন্নত করা। আর একথা শুধু সেই প্রজন্মের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, যারা মসজিদে আকসা অভিমুখে সালাত আদায় করেছিলেন। বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মুসলমানের জন্য। আমরা সবসময় বলতে থাকব, মসজিদে আকসা আমাদের প্রথম কিবলা; আমরা কখনও তাকে ভুলব না। এটা আমাদের দীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তী জীবনের অব্যাহত ১৫টি বছর। রসুল ﷺ শুধু মসজিদে আকসাকেই সম্মান করতেন না; বরং তিনি এর আশপাশের ভূখণ্ডকেও সম্মান করতেন। আমাদের রব যেমন বলেছেন—

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি নিজের বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত– যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। [সুরা বনী-ইসরাঈল : ১]

মায়মুনা বিনতু সাদ ﷺ রসুল ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বলুন? রসুল ﷺ বললেন—

তা হাশর-নাশরের ভূখণ্ড। তোমরা সেখানে গমন করো। সেখানে সালাত আদায় করো। [ইবনু মাজাহ : ১৪০৭]

এই হাদীসে আল-কুদস ও তার আশপাশের শামের ভূখণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চিন্তা করুন, এ ভূখণ্ডের বরকত ও মর্যাদা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমাদের রব ﷻ কিয়ামাতের দিন মানুষকে সমবেত করবেন। এ সমাবেশ মসজিদে হারাম, মক্কা মুকাররমা কিংবা মদীনার ভূখণ্ডে হবে না। এ সমাবেশ হবে বাইতুল মুকাদ্দাসে, শামের ভূখণ্ডে। আমাদের রসুল ﷺ শুধু সে ভূখণ্ডকেই মর্যাদা দেননি। সেখানে বসবাসকারী মানুষের মার্যাদাও সমুন্নত করেছেন। দূর ভবিষ্যতের সংবাদ বহনকারী এক হাদীসে রসুল ﷺ বলেন—

> আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর অবিচল থেকে জিহাদ করে যাবে। কিয়ামত অবধি তারা হবে বিজয়ী।
>
> [মুসলিম : ৫০৬৩]

সবসময় মুমিনদের একটি দল এখানে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে রাখবেন। ইসলামের ঝাণ্ডা কখনও ভূপাতিত হবে না। এটা রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেওয়া অঙ্গীকার। একাধিক হাদীসে যার সুসংবাদ দিয়েছেন আমাদের হাবীব ﷺ। অপর বর্ণনায় এসেছে—

> আমার উম্মতের একটি দল সবসময় দীনের উপর অটল থাকবে। তাদের শত্রুদের উপর তারা বিজয়ী হবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে কিছু সংকট ও অসুখ-বিসুখে তারা আক্রান্ত হবে। এক পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) চলে আসবে। কিন্তু তারা আপন অবস্থায়ই থাকবে। সাহাবীরা বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তারা কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন, তারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে থাকবেন। [মুসনাদু আহমাদ : ২২৩২০]

অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে— আল-কুদস ও তার আশপাশে। অতএব, আল-কুদসের আশপাশের ভূখণ্ড 'রিবাতের ভূখণ্ড'। ইতিহাসের পাতায় তাকালেই আমরা যা দেখতে পাই।

এখন আমরা ফিলিস্তিনের ইতিহাসের মধ্যে ডুবে আছি। আমরা দেখছি, পূর্ববর্তী নবীদের যুগে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হক ও বাতিলের সংঘাত ছিল সব নবীর যুগে। আমাদের নবী ﷺ-এর যুগেও। পরবর্তী ইসলামী বিজয়ের যুগেও। এখন আমাদের বর্তমান যুগেও। এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের পাড়ি দিতে হবে বিভিন্ন স্তর। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন সংঘাতের এক কেন্দ্রবিন্দু। এজন্য আল্লাহ ﷻ এখানে এমন কিছু বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, যারা সবসময় ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। কখনও তা ছাড়েন না। মসজিদে আকসার বরকত ছেয়ে আছে পুরো শাম জুড়ে।

একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন—

> সুসংবাদ শামের জন্য। জিজ্ঞাসা করা হয়, রসুলাল্লাহ! কেন? তিনি বলেন, রহমান (আল্লাহ)-এর ফেরেশতারা তাদের উপর নিজেদের ডানা বিছিয়ে রাখেন। [তিরমিযী : ৩৯৫৪]

শামকে আল্লাহর ফেরেশতারা ছায়া দিয়ে রাখেন। পুরো শামকে ছায়া দিয়ে রাখেন তারা। আর শামের কেন্দ্র হচ্ছে আল-কুদসের বাইতুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসা। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রমাণহিসাবে আমরা এখানে রসুল ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস তুলে ধরব। আল-কুদস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ফযীলত নিয়ে মোটা মোটা বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। বেশি জানার ইচ্ছা থাকলে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

যেন ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড সম্পর্কে রসুল ﷺ-এর কথা, সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা এবং শাম ভূখণ্ডের মর্যাদা নিয়ে তাঁর বর্ণনা যথেষ্ট ছিল না। এজন্য আমাদের রব স্বয়ং নবী ﷺ-কে সেখানে পাঠান। যাতে তাঁর যিয়ারতের মাধ্যমে এর মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যায়। এক অলৌকিক মুজিযার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাঁকে সেখানে পাঠান। ইসরা ও মিরাজের মুজিযা। আমরা সবাই ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে অবগত। এ বিষয়ে অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান।

ইসরা ও মিরাজের সময়কাল নির্ধারণ নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তা মক্কী জীবনে সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। নবুওয়তের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ বছর– এ তিনটি মত পাওয়া যায়। তবে অধিক বিশুদ্ধ মত হল নবুওয়তের দ্বাদশ বছর আকাবার প্রথম বাইআত ও দ্বিতীয় বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ে। আমার কাছে এই মতটিই অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়।

রসুল ﷺ জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে নিজের বিছানা ত্যাগ করে ইসরায় গমন করেন। তাকে কুদরতীভাবে প্রথমে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর উর্ধ্ব জগতে। সবশেষে আবার বিছানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখনও তার বিছানা উষ্ণ ছিল। কিছু মানুষের ধারণা, রসুল ﷺ-এর মিরাজ হয়েছে রুহের মাধ্যমে; সশরীরে নয়। এসব লোক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের এই কথার কাছে পরাজিত যে, এটা কিভাবে হতে পারে, রসুল ﷺ এখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যান। এরপর আসমানপানে। এরপর আবার ফিরে আসেন। এতকিছু রাতের সামান্য এক অংশে?

আমরা তাদেরেকে বলব, কে তাঁর ইসরা করিয়েছেন? *পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি নিজের বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন।* [সুরা বনী ইসরাইল : ১] যখন আপনি সেই মহান সত্তার ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করবেন, তখন সবই আপনার কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে। যেমন আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেছিলেন, মুহূর্তে আগত আসমানের সংবাদ সম্পর্কে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ জিবরাঈল আ. আসমান থেকে জমীনে অবতরণ করেন। এরপর আল্লাহর কাছে চলে যান। এরপর আবার ফিরে আসেন। এসবই ঘটে মুহূর্তের মধ্যে। এক সেকেন্ডে; অথবা আরও কম সময়ে। তবুও আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। তা হলে এই সংবাদে কি আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব না? এটাই হল মুমিনের একীন।

যাইহোক, ইসরায় রসুল ﷺ মসজিদে আকসা পৌঁছেন। এখানে আমরা সামান্য বিরতি নিব এবং জানার চেষ্টা করব, কেন এই ইসরার আয়োজন? যদি এই বিস্ময়কর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হয় জান্নাত ও জাহান্নাম

পরিদর্শন, অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জানা ও আসমানে নবীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং রব্বুল ইজ্জতের সাথে মুলাকাত, তা হলে আকসায় এ 'বিরতি' কেন? কেন মক্কার পবিত্র কাবা থেকে সরাসরি তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়নি? কতিপয় মুফাসসির এর উত্তরে বলেন, নবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য। যদি বিষয়টি এমনই হত, তা হলে তো আল্লাহ ﷻ সমস্ত নবীকে মক্কায়ও নিয়ে আসতে পারতেন। নিঃসন্দেহে মক্কা আল-কুদস থেকে অধিক সম্মানিত। আর মসজিদে হারাম মসজিদে আকসার চেয়ে বেশি সম্মানিত। তা হলে কেন এই ঘুর্ণায়ন? এই ঘুর্ণায়নের পেছনে রয়েছে অনেক উদ্দেশ্য ও হেকমত। সেগুলো থেকে আমি দুটি হেকমত তুলে ধরছি–

প্রথম হেকমত : বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের চাবিকাঠি অর্পণ। কেননা, ধর্মের দিক দিয়ে মানব কাফেলা পরিচালিত হত ফিলিস্তিন থেকে। পূর্ববর্তী নবীরা, বনী ইসরাইলের নবীগণ এবং খ্রিস্টানদের নবী ঈসা আ. এখানেই প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশ্বের ধর্মীয় পরিচালনা এবং আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের সূচনা এই ভূমি থেকে। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড থেকে। এখন নেতৃত্ব মুসলিম উম্মাহর দিকে স্থানান্তরিত হবে– দুনিয়ার শেষ উম্মত, যাদের কাছে সর্বশেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন, রবের পক্ষ থেকে বান্দাকে প্রদত্ত চূড়ান্ত জীবনবিধান, বান্দার জীবনে বিচারক হিসাবে যেটা রব মনোনীত করেছেন– কাজেই রসুল ﷺ-কে কিয়ামত অবধি পুরো দুনিয়ার নেতৃত্বের চাবি গ্রহণ করার জন্য সেই স্থানে যেতে হয়, যেই স্থানটা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে দুনিয়াকে পরিচালনা করে আসছে।

দ্বিতীয় হেকামত : কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের দৃষ্টিতে আকসা ও ফিলিস্তিনের মর্যাদা সমুন্নত করা। কেননা, এটা প্রথম কিবলা। মসজিদে আকসায় সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় ৫০০ গুণ বেশি সওয়াব হয়। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী আর এই মসজিদে আকসা বাদে আর কোনো মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সফর নিষিদ্ধ। উপরন্তু সেখানে রসুল ﷺ-এর ইসরা সংঘটিত

হয়। যাতে সেটা নবীজী ﷺ-এর ইসরার ভূমিতে পরিণত হয়। সমস্ত মুসলমানের কাছে তা হয় সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। প্রতিবছর অন্তত একবার হলেও যাতে তারা একে স্মরণ করে এবং এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। যখন আমরা ইসরা ও মিরাজ নিয়ে আলোচনা করি, তখন আকসা ও ফিলিস্তিনের কথা এড়িয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তা ছাড়া যেহেতু আল্লাহ ﷻ-এর ইলমে আগে থেকেই ছিল যে, এক সময় এই স্থানটি হবে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু– পারস্য, রোমান, ক্রুসেডার, তাতার, ব্রিটিশ ও ইহুদীসহ আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত সকলেই এ ভূখণ্ডের প্রতি লালায়িত হবে। সকলের লোলুপ দৃষ্টি থেকে এই মহান মসজিদ এবং এই মহান ভূখণ্ডের হেফাযতের প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই ছিল এই প্রয়াস।

ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মর্যাদা এখানেই সীমিত নয়। সুরা ইসরা তিলাওয়াত করলে দেখা যায় যে, প্রথম আয়াতেই ইসরা ও মিরাজের আলোচনা এসেছে। কয়েক আয়াত পরই এসেছে বনী ইসরাইল কর্তৃক এই ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর আলোচনা। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট সম্পর্ক। ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে আলোচনা, মুমিন ও মুসলমানদের আকসা ও তার আশপাশের বরকতময় ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্তি, বনী ইসরাইল ও ইহুদীদের এই ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ সঞ্চালন– এগুলো সবই গভীর সম্পৃক্তিমূলক প্রসঙ্গ।

আমাদের রব আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, এ স্থান নিয়ে সংঘাত-সংগ্রাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। হাঁ, কখনও কখনও মুসলমান অন্য শত্রুদের মধ্যে সংঘাত হবে। শত্রুদের মধ্যে থাকবে রোমান, ক্রুসেডার ও অন্যরা। কিন্তু ইহুদীদের দাবি, বা এই ভূখণ্ড নিয়ে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের লড়াই চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এই উম্মতের সময় যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, সেগুলোর প্রতি যারা নজর রাখেন, তারা সুরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত এই বিষয়টি ভালো করেই বোঝেন। ইহুদীরা মসজিদে আকসার জায়গায় বা তার নীচে টেম্পল দাবি করে। তাদের ভাষ্যমতে এটা তাদের আকিদা, যা নিতান্তই বিকৃত। আমাদের আকিদা হচ্ছে মসজিদে আকসা

সেটাই, যেখানে ইসরার সময় রসুল ﷺ-কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটাই সেই সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। ওটা তাদের আকিদা; আর এটা আমাদের আকিদা। এখানে আকিদার মোকাবেলায় আকিদার সংঘাত। তারা বলে তাদের টেম্পল। আমরা বলি আমাদের মসজিদ। সুতরাং গুরুত্ব শুধু মসজিদে আকসা, লিফিস্তিন বা সেখানকার অধিবাসীদের ঘিরে নয়; অথবা সেখানে ভবিষ্যতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নয়; বরং রসুল ﷺ তার মক্কার জীবনেও এখানে বিদ্যমান বিশ্বশক্তি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যেমন আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রোম ও পারস্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। এই বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের মাঝে বিরাজমান সংঘাত রসুল ﷺ এবং সাহাবীদেরকেও ভাবিয়ে তোলে। অথচ রসুল ﷺ তখন মক্কা মুকাররামায় ছিলেন এবং তখন খুব নগণ্যসংখ্যক মুমিন ছিল তাঁর সাথে। কোথায় রোম ও পারস্যের শক্তি, আর কোথায় সেসময়কার মুসলমানদের শক্তি? এই দুটি বিশ্বশক্তির সাথে তৎকালীন মুসলমানদের শক্তির কোনো প্রকারে তুলনা করা যায় না। তবুও রসুল ﷺ আকসার পবিত্র ঘর ও ফিলিস্তিনের বরকতময় ভূখণ্ড ঘিরে বিশ্বশক্তি-দ্বয়ের সংঘাত নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যখন পারস্য রোমের খ্রিস্টানদের উপর বিজয়ী হয়, তখন কী ঘটেছিল?

রসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। মুশরিকরা আনন্দিত হয়ে ওঠে। রসুল ﷺ চিন্তিত হন, কারণ এখানে পরাজিত শক্তি ছিল আহলে কিতাব। তারা সেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা তৎকালীন ফিলিস্তিন শাসন করত। যদিও তাদের মধ্যে ছিল প্রচুর বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ আকিদার মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। তবুও নবীজী ﷺ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, তারা অগ্নিপূজক পারসিকদের চেয়ে মুমিনদের বেশি নিকটবর্তী ছিল। অপর দিকে মুশরিকদের আনন্দের কারণ ছিল, পারসিকরা ছিল তাদের মতই পৌত্তলিক। তারা পারস্যের বিজয়কে পৌত্তলিকতার বিজয় হিসাবেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু তখনই নাযিল হয় আমাদের রবের বার্তা–

রোম পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূখণ্ডে। আর তারা পরাজয়ের পর সত্বর বিজয়ী হবে। [সূরা রূম : ২, ৩]

এটা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ যে, রোমানরা সত্বর অগ্নিপূজক পারসিকদের উপর বিজয়ী হবে। মুসলমানরা এই সুসংবাদ গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়ভাবে এর উপর ঈমান আনেন। এমনকি আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه ভবিষ্যতের এ বিজয়ের উপর এক মুশরিকের সাথে বাজিও ধরেন। ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما বলেন—

মুসলমানরা পারস্যের উপর রোমের বিজয় কামনা করতেন। কেননা, রোমানরা ছিল আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে মুশরিকরা রোমানদের উপর পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, পারসিকরা ছিল তাদের মত মূর্তিপূজক। মুসলমানরা বিষয়টি নিয়ে আবু বকর رضي الله عنه-এর সাথে আলোচনা করেন। আবু বকর رضي الله عنه বিষয়টি তুলে ধরেন রসুল ﷺ-এর কাছে। নবী ﷺ তখন তাদের বলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, পারসিকরা পরাজিত হবে।

এরপর আবু বকর رضي الله عنه বিষয়টি মুশরিকদের সাথে আলোচনা করেন। মুশরিকরা বলল, আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করো। যদি রোমান জিতে যায়, তা হলে তোমাকে এই পরিমাণ দেওয়া হবে। আর যদি পারস্য বিজয়ী হয়, তা হলে তুমি আমাদেরকে এই পরিমাণ দিবে। আবু বকর رضي الله عنه তাদেরকে পাঁচ বছরের সময়সীমার কথা জানান। কিন্তু এই পাঁচ বছরে রোমানরা বিজয়ী হয় না। আবু বকর رضي الله عنه বাজির বিষয়টি নবীজী ﷺ-কে জানান। নবীজী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কেন অনূর্ধ্ব দশ বছর সময় নিলে না। [তবারানী : ১২৩৭৭]

৭ বছর মতান্তরে ৯ বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে পারসিকদের উপর রোমানরা বিজয় অর্জন করে। ফিলিস্তিন ভূখণ্ড আবার রোমানদের শাসনাধীনে চলে আসে। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এ ভূখণ্ড রোমানদের অধীনেই থাকে।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, রসুল ﷺ ফিলিস্তিনের ঘটনা প্রবাহের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। অথচ তিনি থাকতেন মক্কায়।

কিন্তু যেহেতু খ্রিস্টানরা অনেক হেরফের ও রদবদল করেছিল এবং সঠিক আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, এজন্য রসুল ﷺ মুমিনদের মনে একথা বোপন করতে চেয়েছিলেন যে, এই বরকতময় ভূখণ্ড আর বেশিদিন খ্রিস্টানদের কাছে থাকবে না, যারা তাদের শরীয়ত বদলে ফেলেছে। যারা তাদের নবী ঈসা عليه السلام-এর কথা মানে না এবং যারা তাদের নবীর ভবিষ্যদ্বাণী— শেষ নবী হক এবং তিনি প্রেরিত হলে তাঁকে তোমাদের মানতে হবে— অমান্য করে। এজন্য আহযাব যুদ্ধের দিন রসুল ﷺ সাহাবীদের সুসংবাদ দেন যে, সমগ্র শাম ভূখণ্ড অচিরেই ইসলামের কাছে বিজিত হবে।

আহযাব যুদ্ধের সময় খন্দক খননকালে যখন সাহাবীদের সামনে বিরাট এক পাথর প্রকাশ পায়, তখন তারা রসুল ﷺ-এর কাছে যান। কোদাল আনা হয়। নবীজী ﷺ পাথরে আঘাত করে চূর্ণ করতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন—

আল্লাহু আকবার। আমাকে শামের চাবিকাঠি দেওয়া হল। আল্লাহর কসম! আমি আমার এখান থেকে শামের সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। [মুসনাদু আহমাদ : ১৮৭১৬]

আহযাব যুদ্ধের দিন তারা মদীনা মুনাওয়ারায় কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি সাহাবীদের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, অচিরেই এমন দিন আসবে, যখন শেষ নবীর অনুসারী মুসলমানরা ফিলিস্তিন ভূখণ্ড জয় করবে এবং ইসলামের আলোকে তা শাসন করবে।

রসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনে একথা বদ্ধমূল করা যে, ফিলিস্তিন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য হাদিয়া। যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করবে, এ ভূখণ্ড তাদেরকেই দেওয়া হবে। যারা সীমালংঘন করবে, তাদের থেকে এ ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যখন খ্রিস্টানরা আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত পরিবর্তন করে, তখন তাদের থেকে এ ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। চাই তারা পারসিকদের উপর যত বড় বিজয়ই অর্জন করুক না কেন। অথচ তারা ছিল তৎকালীন দুনিয়ার দুই পরাশক্তি। রোমানদের থেকেও তা ছিনিয়ে

নেওয়া হবে এবং মুমিনদের হাতে সোপর্দ করা হবে। যদিও তারা সংখ্যায় স্বল্প এবং শক্তিতে দুর্বল।

রোম পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে। [সুরা রোম : ২, ৩]

আয়াতে উল্লিখিত 'আদনা' শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আধুনিক যুগে বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করেছেন যে, এ 'আদনাল আরদ' হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের মাপকাঠিতে দুনিয়ার সর্বনিম্ন স্থান। এটাই সেই জায়গা, যেখানে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই 'আদনাল আরদ' প্রায় চারশত মিটার নীচে অবস্থিত। নিঃসন্দেহে এটা কুরআনের এক অলৌকিক বিস্ময়।

ষষ্ঠ হিজরী সনের শেষের দিকে হুদায়বিয়া সন্ধির পর রসুল ﷺ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা ও নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র প্রেরণের উদ্যোগ নেন। ফিলিস্তিন ও তার আশপাশের শাম ভূখণ্ডের শাসকবৃন্দও এ তালিকায় ছিল। তৎকালীন ফিলিস্তিন ছিল রোমানদের শাসনাধীন। গাসসানীরা ছিল এখানকার আঞ্চলিক শাসক। তারা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অনুগত এক খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

রসুল ﷺ যাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন তৎকালীন রোমের শাসক হিরাক্লিয়াস। এমনইভাবে দামেশক ও তার আশ-পাশের ফিলিস্তিন ও শাম ভূখণ্ডের অধিপতি গাসসানী বাদশাহ শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাছেও তিনি বার্তা পাঠান। সেই পত্রাবলিতে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন।

আমরা সবাই সেই বার্তা সম্পর্কে অবগত আছি, যা রসুল ﷺ হিরাক্লিয়াস ও দুনিয়ার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। যখন হিরাক্লিয়াসের কাছে রসুল ﷺ-এর পত্র পৌঁছে, তখন তিনি রসুলের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে আগ্রহী হন। কারণ, রসুল ﷺ উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি নবী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল। হিরাক্লিয়াস কোনো আরবের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আবু সুফ্‌ইয়ান তখন ব্যবসায়িক কাজে শাম অঞ্চলে ছিলেন। রসুলের আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য

লোকজন তাঁকে হিরাক্লিয়াসের কাছে নিয়ে আসে। তখন সেই বিখ্যাত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, আবু সুফইয়ান ইবনু হারব তাকে বলেছেন—

রাজা হিরাক্লিয়াস একবার তাঁর কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি তখন ব্যবসা উপলক্ষে কুরাইশদের কাফেলায় শামে ছিলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে সময় আবু সুফইয়ান ও কুরাইশদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফইয়ান তার সাথীসহ হিরাক্লিয়াসের কাছে আসেন। তখন হিরাক্লিয়াস জেরুযালেমে ছিলেন। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তাঁর কাছে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে নেন এবং দোভাষী তলব করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন, এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন— তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী কে? আবু সুফইয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। তিনি বললেন, একে আমার কাছে আনো এবং তাঁর সাথীদেরকেও কাছে এনে তার পেছনে বসিয়ে দাও।

এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব, যদি সে আমার কাছে মিথ্যা বলে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাকে মিথ্যুক বলবে। আবু সুফ্‌ইয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি এ লজ্জা না থাকত যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তবে আমি অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হল, বংশমর্যাদার দিক দিয়ে তিনি তোমাদের মধ্যে কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনও কেউ কি এমন কথা বলেছে? আমি বললাম, না।

CamScanner

তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান শ্রেণির লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, নাকি দুর্বল লোকেরা? আমি বললাম, দুর্বল লোকেরা। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা কি বাড়ছে, না কমছে? আমি বললাম, তারা বেড়েই চলেছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে প্রবেশ করে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তার দাবির আগে তোমরা কি কখনও তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, তিনি কি সন্ধি ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কী করবেন। আবু সুফইয়ান বলেন, একথাটি ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা যোগ করার সুযোগই আমি পাইনি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের পরিণাম কি হয়েছে? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কূপের বালতির মত। কখনও তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে আসে।

তিনি বললেন, তিনি তোমাদের কীসের আদেশ দেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলে, তা ত্যাগ করো। আর তিনি আমাদেরকে সালাত আদায়, সত্য বলা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দেন।

এরপর তিনি দোভাষীকে বলেন, তুমি একে বলো, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রসূলদেরকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, একথা তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, না। তাই আমি বলছি, আগে যদি কেউ এমন বলত, তা হলে আমি অবশ্যই বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর পূর্বসূরির কথার অনুসরণ করছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার জওয়াবে বলেছ, না। তাই আমি বলছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোনো বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, এর আগে কখনও তোমরা তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছ কি না? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা পরিত্যাগ করবে, আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোকজন তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকজন তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবে এই শ্রেণির লোকেরাই হন নবী-রসূলের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দীনে প্রবেশ করে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, না। ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সঙ্গে মিশে গেলে এমনই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রসূলগণ এমনই, সন্ধি ভঙ্গ করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কীসের আদেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর বন্দেগী করা ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর শরীক সাব্যস্ত না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে, আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য বলতে ও সচ্চরিত্র থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এই দুই পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন,

একথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোনো কষ্ট সহ্য করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে অবশ্যই তাঁর পা ধৌত করে দিতাম। [বুখারী : ২৯৪১]

এই সংলাপে হিরাক্লিয়াস নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করেন। এগুলো তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিদ্যমান রসুল ﷺ-এর নির্দশন ও বৈশিষ্ট্য। শেষ যামানায় প্রেরিত নবীর গুণাবলি। হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে, এতে তার রাজত্ব চলে যাবে এবং রোমান ভূখণ্ডের জনতা তাকে হত্যা করে ফেলবে। দেখতে পান বেশিরভাগ পাদ্রী নবীজী ﷺ-এর বিপক্ষে। রাজত্বের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়েন। শেষে তিনি রাজত্ব আকড়ে ধরেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী– এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকার পরও তাকে অস্বীকার করেন। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের অবস্থান। তিনি রসুল ﷺ-এর দূতকে হাদিয়া-উপঢৌকন দিয়ে ফিরিয়ে দেন। তবে অনুসারীদের ভয়ে ঈমানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন।

তৎকালীন দামেশকের শাসক শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানী কী করেছিলেন?

শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কর্মকাণ্ডের মোকাবেলায় রসুল ﷺ-এর জওয়াব কী ছিল?

রসুলুল্লাহর পত্র পেয়ে শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাণ্ড

ফিলিস্তিন, দামেশক ও পাশ্ববর্তী শামের ভূখণ্ডগুলো ছিল শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর শাসনাধীন। সে ছিল তৎকালীন রোম সম্রাট সিজার হিরাক্লিয়াসের অনুগত শাসক। শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানীর কাছে রসুল ﷺ-এর দূত ছিলেন হারিস ইবনু আমর আসাদী। তিনি সেই বার্তাই বহন করেছিলেন, যা দুনিয়ার অন্যান্য রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো হয়েছিল। শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানী এমন এক কাজ করেছিল যা অন্য কোনো রাজা-বাদশাহ করেনি। যা ছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

সে দূতকে বন্দী করে হত্যা করে ফেলে। এ ছিল চরম অন্যায় ও ধৃষ্টতা। সার্বজনীন নীতি হচ্ছে দূত হত্যা নিষিদ্ধ। রসুল ﷺ-এর কাছে মুসাইলামাহ কাজ্জাবের পক্ষ থেকে দুইজন দূত এসেছিল। তারা আগে মুসলমান হয়েছিল। পরে ইসলাম ত্যাগ করে মুসায়লামাহর দলে চলে যায়। তাদের রক্ত ছিল হালাল। কেননা, আমাদের ধর্মে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবুও তারা যেহেতু মুসায়লামাহ কাজ্জাবের দূত হিসাবে এসেছিল, তাই রসুল ﷺ তাদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি দূত না হতে, তা হলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম।' দূত হওয়ার সুবাদে সেদিন তারা বেঁচে যায়। কিন্তু শুরাহবীল ইবনু আমর যা করে, তা ছিল সমস্ত নীতির লঙ্ঘন। ইসলামী সাম্রাজ্যের এক প্রজাকে সে হত্যা করে। তিনি রসুল ﷺ-এর দূত। হারিস ইবনু উমাইর আসাদী رضي الله عنه। রসুল ﷺ এ ধৃষ্টতার কী জওয়াব দিয়েছিলেন?

রসুল ﷺ এ ধৃষ্টতাকে মুসলিম উম্মাহর মর্যাদাহানী বলে বিবেচনা করেন। এ ঘটনা ঘটেছিল অষ্টম হিজরী সনে। মক্কা বিজয়ের আগে। ইসলামী সাম্রাজ্য তখনও সম্প্রসারিত হয়নি। তখনও সেটা ছিল মদীনা ও আশপাশের কিছু গোত্র নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এ ধৃষ্টতার জওয়াব দিতে হবে শক্তির মাধ্যমে। তিনি তিন হাজার মুজাহিদের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ বাহিনী গঠন করেন। শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানী থেকে দূত হত্যার কিসাস গ্রহণের জন্য। রসুল ﷺ ভ্রূক্ষেপও করেননি যে, শুরাহবিলের সাথে রয়েছে পুরো গাসসানী জনগোষ্ঠী। তাদের পশ্চাতে রয়েছে বিরাট রোম সাম্রাজ্য। যারা পারস্যের সাথে তৎকালীন দুনিয়াটাকে বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। তিনি শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদার দিকেই লক্ষ করেন। শুধু মুসলিম উম্মাহর সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন। শুধু সেই শহীদের কথা ভাবেন, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে যার রক্ত ঝরেছে। এজন্য তিনি পুরো বাহিনী প্রেরণ করেন। একটু ভাবুন, আজ ফিলিস্তিন ও দুনিয়ার অন্যান্য ভূখণ্ডে কীভাবে মুসলমানদের মর্যাদাহানী করা হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের কোনো লশকর সক্রিয় হচ্ছে না। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তিন হাজার মুজাহিদ নিয়ে গঠিত ইসলামী বাহিনী বেরিয়ে পড়ে। প্রথম হিজরী সনে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনার পর অষ্টম হিজরী সন বা সপ্তম হিজরী সনের শেষ পর্যন্ত এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ইসলামী বাহিনী। এ বহিনীর সেনাপতি ছিলেন যায়দ ইবনু হারিসাহ رضي الله عنه। তিনি নিহত হলে নেতৃত্ব দিবেন জাফর ইবনু আবু তালিব رضي الله عنه। তিনি নিহত হলে নেতৃত্ব দিবেন আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা আনসারী رضي الله عنه। তিনিও যদি নিহত হয়ে যান তা হলে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের আমীর নির্বাচন করে নিবেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধটি সারিয়ায়ে মুতা বা গাজওয়ায়ে মুতা নামে পরিচিত। রসুল ﷺ এ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও একে 'গাযওয়া' বলা হয়। কারণ, বাহিনীর আকার ছিল অনেক বড়।

গাসসানীদের সাথে লড়াই এবং হারেস ইবনু উমাইর আসাদীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিন হাজার মুজাহিদের এ বাহিনী যখন বের

হয়, তখন এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে গাসসানীরা মুসলমানদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। তাদের সহায়তার জন্য রোমান রাজা আরও এক লক্ষ যোদ্ধা প্রেরণ করে। মাত্র তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদের মোকাবেলায় দুই লক্ষ খ্রিস্টান যোদ্ধা ময়দানে অবতরণ করে। যুদ্ধ শুরু হয়। যায়দ ইবনু হারিসাহ, জাফর ইবনু আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা رضي الله عنهم শহীদ হয়ে যান। এরপর মুসলমানরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করেন। তিনি হলেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه। তাঁর হাতে বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। যেমন, আমাদের রসুল ﷺ বয়ান করেছেন।

এ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন, মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছিলেন। অনেকে বলেন, বিজয়ী হয়েছিল খ্রিস্টানরা। কারও কারও মতে, কেউই বিজয়ী হয়নি। তবে আমার দৃষ্টিতে বাস্তব কথা হচ্ছে, এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলেন। এর প্রমাণ আছে অনেক। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সেসব প্রমাণ বিশ্লেষণের স্থান নয়। তবে আমরা ওই যুদ্ধের ঘটনাপুঞ্জের উপর শুধু রসুল ﷺ-এর মন্তব্য উল্লেখ করব। তিনি মদীনায় অবস্থান করেই বিস্ময়করভাবে বলে দিচ্ছিলেন, মুতার ভূখণ্ডে কী কী ঘটছে। মুতা এখন জর্ডানে অবস্থিত। ঘটনার বিবরণ দিয়ে রসুল ﷺ বলছিলেন—

ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল যায়দ ইবনু হারিসাহ, সে শহীদ হয়ে গেছে। ঝাণ্ডা ধারণ করেছিল জাফর ইবনু আবু তালিব, সে শহীদ হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহাও ঝাণ্ডা ধারণ করে শহীদ হয়েছে। এসব মহান সাহাবীদের শাহাদাতের শোকে তার চোখ বেয়ে তখন পানি ঝরছিল। এরপর তিনি বলেন, এবার ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে আল্লাহর এক অনন্য তলোয়ার। সে হল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তার হাতে আল্লাহ ﷻ বিজয় দিয়েছেন।

একথা শুধু বিজয়ের সময়েই বলা হয়। আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে এলে একথা বলা হয় না। এর প্রমাণ হচ্ছে বেরিয়ে আসার সময় দুই লক্ষ যোদ্ধার প্রতাপশালী রোমান শক্তি তাদের পিছু নেওয়ার সাহস পায়নি।

তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে শহীদের সংখ্যাও ছিল ২০ এর কম। একটু চিন্তা করে দেখুন, তিন হাজারের ক্ষুদ্র একটি বাহিনী দুই লাখের সাথে যুদ্ধ করছে। অথচ তাদের মধ্যে ২০ কিংবা আরও কম ১৫/১৭ জন লোক নিহত হয়েছেন। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী বাহিনীর হাতে ছিল এ যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ বেরিয়ে আসার ছক আঁকলে রোমানরা তুষ্ট হয়ে যায়। তারা পিছু ধাওয়া করতেও আসেনি। যা প্রমাণ করে, এ পরিণতি তারা মেনে নিয়েছিল।

এর আরও প্রমাণ হচ্ছে এই যুদ্ধের এক বছর পর তারা রসুল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ না করে তাবুকের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল! যা ছিল তাদের মুতার প্রাঙ্গণের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রভাব।

এসব কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই ইসলামী বাহিনী জর্ডানের মুতায় পৌঁছে গিয়েছিল। তৎকালীন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের শাসক শক্তির সাথে লড়াই করতে। এ ছিল ফিলিস্তিন ও পুরো শামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যাপার। এর এক বছর পর নবম হিজরীতে রসুল ﷺ তাবুক যুদ্ধে বের হন। তার বাহিনী ছিল ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে গঠিত। শামের ভূখণ্ডে রোমানরা মদীনা মুনাওয়ারার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যেকোনো সময় মদীনার উপর আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এজন্য রসুল ﷺ রোমানদের আগে অগ্রসর হতে থাকেন এবং বিরাট বাহিনী গঠন করে শাম অভিমুখে রওয়ানা হন। সংবাদ পেয়ে রোমান বাহিনী পালিয়ে যায়। অথচ তারা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। মুস্তফা ﷺ-এর বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে রোমান বাহিনী নবম হিজরী সনে পালিয়ে যায়। এরপর দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্র রসুল ﷺ-এর কাছে আসে কর প্রদানের শর্তে সন্ধি করতে। তাইমা, জারবা, আইলা ও উযরুহ (Udhruh)-সহ বিভিন্ন এলাকার খ্রিস্টানরা আসে। জিযিয়া প্রদানের শর্তে নবীজী ﷺ-এর সাথে সন্ধি করে তারা। তাবুক যুদ্ধের পর উত্তর আরব উপদ্বীপে ইসলাম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এভাবে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রসুল ﷺ ফিলিস্তিন ও শামের বিষয় নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

আমরা অনেকেই হয়তো, উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনী সম্পর্কে অবগত আছি। যিনি ছিলেন, রসুল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র। নবীজী ﷺ যায়দ ইবনু হারিসাহ ﷺ-কে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর পুত্র উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-কেও অনেক ভালোবাসতেন। এজন্যই তাঁকে 'হিব্বু রসুলিল্লাহ' বলা হত। জীবনের শেষ মুহূর্তে নবীজী ﷺ এই নওজোয়ানের হাতে দিয়েছিলেন সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, যে বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বের হয়েছিল। ১১ হিজরী সনের সফর মাসে এ বাহিনী প্রস্তুত করা হয়। রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের মাত্র এক মাস আগে।

নবীজী ﷺ নিজে এ বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। বড় বড় সাহাবীও এ বাহিনীতে বিদ্যমান ছিলেন। তবুও রসুল ﷺ নেতৃত্বের ভার দেন উসামা ইবনু যায়দকে। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এই বাহিনীকে রওয়ানা হতেও নির্দেশ দেন। কিন্তু নবীজী ﷺ-এর অসুস্থতা ও ওয়াফাতের সংবাদ পেয়ে বাহিনী মদীনার উত্তরে যাত্রা বিরতি করে। এর মধ্যে খলীফাহিসাবে আবু বকর সিদ্দীক ﷺ-এর বাইআত সম্পন্ন হয়। তিনি নিজে বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

এখানে আমরা উসামা ইবনু যায়দের বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করব। উসামা ইবনু যায়দকে এ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করাটাই প্রমাণ করে তিনি ছিলেন একজন বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তার পিতা যায়দ ইবনু হারিসাহ মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এজন্য পিতা ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত ছিল রোমান সাম্রাজ্য ও গাসসানীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন, যারা মুসলিম নেতৃস্থানীয়দের হত্যা করেছিল।

তবে এ ঘটনায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। রসুল ﷺ এ বাহিনীতে যুব সমাজের প্রতিভা তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৭ বা ১৮ বছর বয়সী একজন তরুণের হাতে তুলে দেন এমন এক বাহিনীর নেতৃত্ব, মুসলিম উম্মাহর বীর সেনানীরাও যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক, উমার ইবনু খাত্তাব, আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ,

আমর ইবনু আস, উসাইদ ইবনু হুযাইর ﷺ-এর মত প্রথম সারির সাহাবীরাও এই বাহিনীতে ছিলেন। এ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে যুবসমাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে রসুল ﷺ-এর পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

এখানে রয়েছে শাম ও ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত বিশ্বশক্তি দমনের সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্যের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ। কারও অধিকার নেই যুবকদের ছোট করে দেখে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা ও শ্রেষ্ঠ দাবি করার। কেননা, যুবসমাজ নবী ﷺ-এর দৃষ্টিতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এমন এক সিদ্ধান্ত নেন, যা ছিল মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বাধিক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত। তা হল রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনী প্রেরণের বিষয়টি কার্যকর করা। এই সিদ্ধান্ত দুঃসাহসিক হওয়ার পিছনে বেশকিছু কারণ আছে।

প্রথমত : এ সময়ে চতুর্দিক থেকে আরবদের ধর্মত্যাগের সংবাদ আসতে থাকে। যারা রসুল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিকে ঈমান গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের সংবাদ পেয়ে তাদের অধিকাংশ মুরতাদ হয়ে আগের অবস্থানে ফিরে যায়। আরব উপদ্বীপে ধর্মত্যাগের এক উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যায়। এমন সময় উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনীকে যাবতীয় সামরিক ব্যবস্থাপনা দিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে পাঠানো ছিল একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এতে মদীনা মুনাওয়ারা অরক্ষিত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়ত : এই বাহিনী তখন রোমান সাম্রাজ্যের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তির সাম্রাজ্য।

তৃতীয়ত : রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর মুসলমানরা ছিল মর্মাহত। এই বিরাট ধাক্কা তখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। মুসলমানদের

ইতিহাসে হয়তো এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মসীবত যে, শেষ নবীর ওয়াফাতের কারণে আসমানের সাথে যোগাযোগ শেষ হয়ে যায়।

এসবই ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবুও এ বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তে আবু বকর সিদ্দীক ﷺ ছিলেন অনড়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেছিলেন তাঁর সেই অমর বাণী— যা তাঁর জীবনের মূলনীতিহিসাবে ব্যক্ত হয়— আল্লাহর কসম! যদি মদীনায় এসে কুকুররা উম্মাহাতুল মুমিনীন (নবী-পত্নীগণ)-এর পা টেনে নিতে থাকে, তবুও আমি সেই বাহিনী ফিরিয়ে নিব না, যা রসুলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা করিয়েছেন। সেই ঝাণ্ডা আমি নামিয়ে আনব না, যা তিনি উড্ডীন করেছেন।

অর্থাৎ যখন নবী ﷺ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন যেকোনো অবস্থায় তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি যদি বিভিন্ন বিদ্রোহী দল আর কুকুররা মদীনার ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে এবং নবীপত্নীদের সম্মানহানি হতে থাকে, যাদের মধ্যে আয়েশা বিনতে আবু বকর ﷺ-ও রয়েছেন। তবুও তিনি সেই বাহিনী প্রেরণ করবেন, যা নবী ﷺ প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। নবী ﷺ যে পতাকা বেঁধে গেছেন, সেটা তিনি কিছুতেই খুলবেন না। উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর পরিবর্তে অন্যকাউকে সেনাপতি করার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। নবীজী ﷺ-এর সিদ্ধান্তকেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন।

উসামা ইবনু যায়দ ﷺ-এর বাহিনী শাম অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। কিন্তু যে জনপদ দিয়েই এ বাহিনী অতিক্রম করে, সেখানকার অধিবাসীরা বলতে থাকে, নিশ্চয়ই এ বাহিনী এমন এক জাতির পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে, যারা সত্যিই শক্তিশালী। যদি তারা দুর্বল হত, তা হলে রোমানদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করত না।

এই বাহিনীর প্রেরণ অনেক ফলদায়ক প্রমাণিত হয়। উত্তর আরব উপদ্বীপের গোত্রগুলোর মধ্যে ধর্মত্যাগের ফেতনা নির্বাপিত হয়ে যায়। যাদের কাছ দিয়ে এই বাহিনী অতিবাহিত হয়, তারাই নীরব হয়ে যায়।

মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। এ ছিল প্রিয় নবী ﷺ-এর নির্দেশ অনুসরণের বরকত।

পুরো এক বছর চলতে থাকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। হিজরী একাদশ সন এবং দ্বাদশ সনের শুরুর দিকে কয়েক মাস। আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ শক্তির সাথে এ সময় মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা হয়। এসব সংঘাতের সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতটি হয়ে ইয়ামামার ময়দানে। ভণ্ড মুসাইলামাহর বিরুদ্ধে। আল্লাহর তলোয়ার খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে এ যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর বিজয় ঘটে। এভাবে সব মুরতাদের বিরুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। এক বছর পর আরব উপদ্বীপে ধর্মত্যাগের ফেতনা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

এরপর আবু বকর সিদ্দীক ﷺ গ্রহণ করেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসী পদক্ষেপ। তা হল পারস্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসলামী বিজয়াভিযানের সূচনা। পারসিক আর রোমানরা তৎকালীন দুনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছিল। এজন্য এটা ছিল এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশ হিজরী সনে সত্যি সত্যি পারস্যের ভূখণ্ডে ইসলামী বিজয়াভিজান শুরু হয়। তখন ছিল খ্রিস্টীয় ৬৩২ সাল। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইরাকের মাটিতে অর্জন করে অনেক বড় বড় বিজয়। মাত্র ১৭ মাসে তিনি প্রায় ১৫টি দুর্দান্ত যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে নেন। এসময় খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে ছিল ১৮ হাজারের বাহিনী। আর পারস্য বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ষাট, সত্তুর, বা আশি হাজার। ফিরায রণাঙ্গণে পারসিকদের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। সবগুলো যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে।

কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পারস্যের ভূখণ্ডে ইসলামী বাহিনীর যুদ্ধ চলাকালেই আবু বকর সিদ্দীক ﷺ শাম বিজয়ের জন্য রোমানদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। রসুল ﷺ-এর খলিফা আবু বকর ﷺ-এর যুগেই শুরু হয় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস।

এ বিষয়টি শুরু হয় শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﷺ-এর একটি স্বপ্নের মাধ্যমে। সেই স্বপ্ন বলছিল অচিরেই ইসলামী বাহিনী শাম বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। বিষয়টি আবু বকর সিদ্দীক ﷺ-এর ভাবনার সাথে মিলে যায়। তিনি তখনই শামের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করা এবং রোমানদের সাথে লড়াইয়ে অবতরণের কথা ভাবছিলেন, যখন তিনি পারসিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন।

চিন্তা করে দেখুন, একটি সদ্য গঠিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে দুটি সামরিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করবে! তাও আবার একই সাথে। আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এমনই পরিকল্পনা করছিলেন। শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﷺ-এর স্বপ্ন থেকেও তিনি সুসংবাদ গ্রহণ করেন। তবে এতটুকুর উপর ক্ষান্ত না হয়ে বিষয়টি নিয়ে তিনি মুসলমানদের পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এটা ছিল এক দুঃসাহসিক পরামর্শ সভা। দিনটি ছিল ৩০ রবিউল আউয়াল, ১২ হিজরী, মুতাবিক ১৪ জুন, ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এ সভায় আবু বকর সিদ্দীক ﷺ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে শাম জয় করার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নেতৃবর্গ সবাই এ অভিযানের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ তখন থেকে শামের ভূখণ্ডে রোমানদের সাথে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এ ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। এজন্য তিনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে থাকেন। তার আহ্বানে সবার আগে সাড়া দেন খালিদ ইবনু সাঈদ উমাবী ﷺ। আবু বকর সিদ্দীক ﷺ তাঁকে একটি ক্ষুদ্র মুজাহিদ ইউনিটের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। এ ইউনিটকে তিনি বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা ও তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন।

এক পর্যায়ে শামের ভূখণ্ডে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম মুজাহিদদের সমন্বয়ে চারটি পূর্ণ বাহিনী প্রস্তুত হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন ফিলিস্তিনও ছিল শামের অন্তর্ভুক্ত। এ চারটি মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে সর্ব প্রথম রওয়ানা হয় ইয়াযিদ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ-এর বাহিনী।

> يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! اَشْرُوْا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ هَزَمْتُمُوْهُمُ الْيَوْمَ كَانَتْ لَكُمْ هَذِهِ الْبِلَادُ دَارَ الْإِسْلَامِ أَبَداً
>
> হে মুসলিম বাহিনী! আজ তোমরা নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করো। যদি তোমরা আজ তাদেরকে পরাজিত করতে পার, তা হলে চিরদিনের জন্য এই ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসাবে তোমাদের থাকবে।

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশ্যায় নিজেদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নাও, তা হলে শিরকে লিপ্ত খ্রিস্টবাদ ও পৌত্তলিকতার এ আখড়া আল্লাহ ﷻ স্থায়ীভাবে দারুল ইসলামে পরিণত করে দিবেন। তোমাদের জন্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহাপ্রতিদান। মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ-এর সেই কথা বাস্তবায়িত হয়। বিরাট বিজয় অর্জিত হয়। তবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে এটাই চূড়ান্ত বিজয় ছিল না।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসলামী বাহিনীর সাথে কী ঘটেছিল?

আজনাদায়নের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরিণতি কী ছিল?

এরপর কোন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

আল-কুদসের ভূখণ্ডে আরও কী কী ঘটেছিল?

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এর যুগে ফিলিস্তিন

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ-এর জীবনের শেষ মুহূর্তে মদীনা মুনাওয়ারায় আজনাদায়ন যুদ্ধের সুসংবাদ পৌঁছে। তার শাসনকাল ছিল মাত্র ২ বছর ৬ মাস। এই আড়াই বছরে তিনি যেসব বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, তা লক্ষ্য করলে আমাদের মনে হবে যে, যুগের পর যুগ চেষ্টা করেও হয়তো তা অসম্ভব। তাঁর জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব, মানব জীবনে বরকতের গুরুত্ব। কীভাবে আল্লাহ বান্দাকে দিয়ে কাজ নেন। হৃদয়ে বিদ্যমান ইখলাস ও কর্মের সততার বিনিময়ে কীভাবে সওয়াব ও প্রতিদান বহু গুণ বাড়িয়ে দেন। মৃত্যুর আগে তিনি উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-কে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

মুসলমানরা উমার ইবনু খাত্তাবের হাতে বাইআত হন। উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ শুরুর দিকে যেসব সিদ্ধান্ত নেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শামীয় বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-কে অপসারণ। এ অপসারণের দরুণ আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন জাগে। আমরা হয়তো জানতে চাই কেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-কে অপসারণ করা হয়েছিল? অথচ তিনি পারস্যের ভূখণ্ডে ইসলামী বাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত করেছিলেন। তারপর শামে ইসলামী বাহিনীর পাশে দাঁড়ান। এসব ময়দানের কোনোটিতেই তিনি কোনো সামরিক ত্রুটি করেননি। প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক ﷺ-এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর অনন্য রণকৌশলে মুগ্ধ ছিলেন। চলুন, সমস্ত কল্পনা-জল্পনা ছেড়ে খোদ উমার ইবনু খাত্তাবের

কাছ থেকে আমরা এর কারণ জেনে নিই। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর অপসারণের ব্যাখ্যায় উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ বলেছিলেন—

> আল্লাহর কসম! কোনো অসন্তুষ্টি কিংবা খিয়ানতের কারণে আমি তাকে অপসারণ করিনি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, তাকে নিয়ে মানুষ ফেতনায় পড়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে যে, মানুষকে তার হাতে ন্যস্ত করা হবে।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ লক্ষ করছিলেন যে, ইসলামী লশকর এবং মুসলিম সমাজ বলতে শুরু করেছে, যদি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ আমাদের সাথে থাকেন, তা হলে বিজয় আমাদেরই। আর যদি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ না থাকেন, তা হলে বিজয় আসবে না। একথা বিস্মৃত হতে চলেছিল যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহ ﷻ দিয়ে থাকেন। এজন্য উমার ইবনু খাত্তাব মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-কে অপসারণ করেন। যেন তিনি মুসলমানদেরকে বলছিলেন, যদি তোমরা আকিদার উপর অটল থাক এবং রবের সাথে তোমাদের যোগসূত্র থাকে, তা হলে বিজয় তোমাদেরই হবে— খালিদ সঙ্গে থাকলে এবং না থাকলেও। আর খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর অপসারণের পর এটাই প্রমাণিত হয়।

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর অপসারণের পর ইসলামী লশকরের সেনাপতি নিযুক্ত হন উম্মতের আস্থাভাজন-খ্যাত আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ তার অধীনস্থ একজন সৈনিক হিসাবে শামীয় বাহিনীতে অবস্থান করেন। এরপর তাঁর আর ইরাক ফিরে আসা হয়নি।

এ বরখাস্তের পরপরই ফিলিস্তিনে সংঘটিত হয় এক বিরাট লড়াই। বাইসান নামক স্থানে। আজনাদায়নের যুদ্ধের ৬ মাস পরই সংঘটিত হয় বাইসান যুদ্ধ। নতুন সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁-এর নেতৃত্বে ইসলামী লশকর শামের মাটিতে রোমানদের মুখোমুখি হয়।

এ যুদ্ধে ২৪ হাজার মুজাহিদের ইসলামী লশকর মুখোমুখি হয় রোমান বাহিনীর, যার সৈন্য সংখ্যা ছিল এক বর্ণনায় ৫০ হাজার। অপর বর্ণনায়

৮০ হাজার। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বাইসানের দক্ষিণে। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। ১০ হাজার রোমান সেনা নিহত হয়। মুসলিম লশকরে শাহাদত বরণ করেন খুবই নগণ্যসংখ্যক।

বাইসান যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মূল নকশা আঁকতে শুরু করেন। এ পর্বে পুরো শাম থেকে রোমানদের বিতাড়িত করা কিংবা সমগ্র ফিলিস্তিন জয় করা মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া। পুরো শামে রোমান বাহিনীর শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ও সবচেয়ে সংরক্ষিত শহর ছিল দামেশক। এজন্য ইসলামী বাহিনী দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হয়। বাইসান যুদ্ধের প্রায় ৪ মাস পর তারা দামেশক পৌঁছেন। পুরো দামেশক শহর অবরোধ করেন। দীর্ঘ ৪ মাস স্থায়ী হয় এই অবরোধ। অবশেষে ১৫ রজব ১৪ হিজরী, মুতাবিক ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দামেশক বিজিত হয় এবং এই শহরে ইসলাম প্রবেশ করে।

এরপর একে একে বিজিত হতে থাকে শামের অনেক শহর। বাআলাবাক্ক, লেবানন ও হিমস এসবের অন্যতম। এতে রোমান সিজার হিরাক্লিয়াস ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এসব ইসলামী বিজয় চলাকালে হিরাক্লিয়াস আল-কুদসেই অবস্থান করছিলেন। পারস্যের উপর বিজয় অর্জনের শুকরিয়া স্বরূপ তিনি আল-কুদসে তীর্থাবাসে এসেছিলেন।

ইসলামী বাহিনী সম্মুখে এগোতে থাকলে তিনি উত্তর দিকে পিছু হটতে থাকেন। দামেশক ও হিমস থেকে সরে যান। এরপর আরও দূরে সরে গিয়ে আন্তাকিয়ায় পৌঁছেন। আন্তাকিয়া সিরিয়ার উত্তরে তুরস্কের সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর।

হিরাক্লিয়াস সেখানে অবস্থান করে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। এসময়ে তিনি এমন একটি বাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করেন, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বাধিক শক্তিশালী বাহিনী হতে পারে। এসব যুদ্ধের কোনো কোনোটি হয়তো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বাইরে ছিল। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধগুলো ছিল ফিলিস্তিনের শাসক শক্তির বিরুদ্ধে, এজন্য আমাদের ইতিহাসের সাথে সেগুলোর সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিপক্ষে দুই লক্ষ রোমান সৈন্য প্রস্তুত করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের সেনা সাহায্য আসতেই থাকে। সে সময় মুসলিম বাহিনীর সেনা সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার। সর্বোচ্চ বর্ণনা অনুসারে ৩৯ হাজার। বাহিনীর প্রধান ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁। আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁-এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, রোমানদের সৈন্য সংখ্যা দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অপর দিকে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩৯ হাজার। তিনি এই বিরাট বাহিনীর মোকাবেলায় ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে মদীনায় উমার ফারুক ﵁-এর কাছে সেনা সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠান। তিনি এ বার্তায় এমন কিছু বাক্য উল্লেখ করেন, যা উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-এর কাছে বিরাট সংখ্যক রোমান বাহিনীর বিপরীতে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদলের দুরাবস্থা পুরোপুরি স্পষ্ট করে দেয়। সেনাপতি আমীনুল উম্মাহ আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁, উমার ইবনু খত্তাব ﵁-কে পত্রে যা লেখেন, তার কিছু বাক্য এখানে উল্লেখ করছি—

> হে আমীরুল মুমিনীন! ত্বরিত! ত্বরিত! লোকের পর লোক চাই।

সেনাপতির উদ্দেশ্য ছিল শামের ভূখণ্ডে ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধে সাহায্যের পর সাহায্য প্রয়োজন। এরপর তিনি বলেন—

> অন্যথায় যদি তারা শত্রুর বিপক্ষে অটল থাকে, উল্লেখযোগ্য লোকদেরকে (শহীদ) গণ্য করুন।

অর্থাৎ বিরাট রোমান বাহিনীর মোকাবেলায় ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী শামের আসন্ন যুদ্ধে যদি অটল থাকে, তা হলে তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেননা, আমাদের সামনে শত্রুর যে সংখ্যা, তা বিরাট। ক্রমেই সে সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আবার দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে তাদের হাতিয়ার আর প্রশিক্ষণও উন্নত।

> আর যদি তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তাদের দীনের ব্যাপারে চিন্তা করুন।

অর্থাৎ যদি তারা অটল থাকে, তা হলে প্রাণ হারাবে। আর যদি পলায়ন করে, তা হলে দীন হারাবে। কেননা, এটা তো যুদ্ধের ময়দান

থেকে পলায়ন। অটল থাকা এবং পলায়ন করা উভয়টিই ভয়ঙ্কর। সমস্যা গুরুতর। আমরা কেন্দ্র থেকে সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

> হে আমীরুল মুমিনীন! তাদের কাছে এ পরিমাণ সৈন্য এসেছে, যাদের মোকাবেলা করা দুরূহ। তবে যদি আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সহায়তা করেন কিংবা তার পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ আসে, তা হলে ভিন্ন কথা। আস-সালামু আলাইক।

এই সংক্ষিপ্ত বার্তা স্পষ্ট করছিল শামের ভূখণ্ডে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের দুর্দশার করুণ চিত্র। যখন এই পত্র উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। বার্তা পাঠ করে কেঁদে ফেলেন তিনি। তাঁর ক্রন্দনের কারণ শুধু মুসলিম বাহিনীর দুরাবস্থা ছিল না; বরং তিনি হয়তো ভয় পেয়েছিলেন যে, মুসলমানদের বিজয়নীতি সম্পর্কে ইসলামী লশকরের মধ্যে সংশয় বিরাজ করছে।

তিনি সাহায্য প্রেরণের সাথে সাথে একটি বার্তাও পাঠান। সাহায্য ছিল সাঈদ ইবনু আমের ﵁-এর নেতৃত্বে এক হাজার মুজাহিদ। এটা তেমন কোনো বড় সংখ্যা ছিল না; তবে তিনি এমন একটি পত্র পাঠান, যা ছিল লক্ষ লক্ষ যোদ্ধার চেয়েও বেশি কার্যকর। পত্রে তিনি বলেন—

> তাদের আধিক্য যেন তোমাদের আতঙ্কিত না করে। কেননা, আল্লাহ তাদের থেকে দায়মুক্ত। আর আল্লাহ যাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যান, আধিক্য তাদের কোনোই কাজে আসে না।

অর্থাৎ যাদের থেকে আল্লাহ নিজের দায়িত্ব তুলে নেন, সংখ্যাধিক্য কখনও তাদের সফলতা এনে দিতে পারে না। যাদেরকে আল্লাহ তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেন, অবশ্যই তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

> মুমিনদের স্বল্পতায় তুমি বিচলিত হয়ো না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তোমার সাথে রয়েছেন। আর আল্লাহ যার সাথে থাকেন, সে কখনও সংখ্যালঘু নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হল এবং তাঁর সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বলল, কত ক্ষুদ্র দল বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। [সূরা বাকারা : ২৪৯]

বার্তাটি যখন আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি সুদৃঢ় হয়ে যান। তাঁর সাথে মুসলিম বাহিনীও সুদৃঢ় হয়। ইসলামী লশকর বিরাট রোমান বাহিনীর মোকাবেলা করার পথ খুঁজতে শুরু করে। দামেশকের দক্ষিণে জাবিয়াতে অবস্থান করতে থাকা ইসলামী লশকরের কাছে পেছনের মরুভূমিতে পিছিয়ে আসা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এর মানে ছিল মুসলিম বাহিনী সিরিয়া, জর্ডান ও ফিলিস্তিন ছেড়ে আরব উপদ্বীপের কাছে পিছিয়ে আসা। এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দের যুক্তি ছিল, যদি রোমানদের সাথে মোকাবেলায় তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন, তা হলে মরুভূমিতে আশ্রয় নিবেন। রোমান বাহিনী মরুভূমিতে যুদ্ধ করতে পারবে না। তখন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর কাছে মনে হয় যে, এটা এক প্রকার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন এবং পিছপা হওয়ার পথ উন্মুক্তকরণ। বিষয়টি মুসলমানদের লড়াইয়ের উৎসাহে ভাটা সৃষ্টি করবে। যদিও তিনি তখন মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন না, তবুও তিনি এমন এক কথা বলে বসেন, যা খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর স্বভাবের ব্যাখ্যা করে। আর তিনি কেন বিজয়ী হতেন, সেই রহস্যও তুলে ধরে। তিনি বলেন—

> আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি যদি আমরা সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে লড়াই করি, তা হলে সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এমতাবস্থায় তাদের তুলনায় আমাদের কোনো শক্তিই নেই। আর যদি আমরা লড়াই করি আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহর জন্য, তা হলে আমার বিশ্বাস, তাদের বাহিনীতে যদি দুনিয়ার সব লোক জমা হয়, তবুও তাদের কোনো কাজে আসবে না।

লক্ষ্য করুন, একজন মুসলমানের আকিদা। যুদ্ধের ময়দানে জীবন্ত আকিদা অটল রাখে পুরো বাহিনীকে। ৩৯ হাজার মুজাহিদ আল্লাহর উন্মুক্ত তলোয়ার খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর এই কথার পানেই যেন তাকিয়েছিলেন। তাঁর কথায় মুসলমানরা সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁ খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ থেকে পরামর্শ নেন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ দুনিয়ার ইতিহাসে এক অনন্য মহান সামরিক ব্যক্তিত্ব। আজও দুনিয়ার সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার রণকৌশল নিয়ে পাঠদান চলে।

আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁ খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-কে উপস্থিত করেন। লড়াই, রণকৌশল, ময়দানে অবতরণকারী বিভিন্ন বাহিনী, ডান ও বাম ব্যূহ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ তখন বলেন—

> আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিব আপনি কি তা গ্রহণ করবেন?

আবু উবায়দাহ জওয়াব দেন, হ্যাঁ। তিনি এই লোকের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখতেন, যাকে স্বয়ং রসুল ﷺ 'আল্লাহর উন্মুক্ত তলোয়ার' উপাধি দিয়েছিলেন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ বলেন, ঠিক আছে। তা হলে আমার উপর এ বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে দিন এবং আপনি মাঝখান থেকে সরে যান। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন।

আবু উবায়াদ ইবনু জাররাহ ﵁ বলেন, ঠিক আছে। এ বাহিনীর দায়িত্ব আপনার হাতে।

এ যুদ্ধের নেতৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অথচ তিনি খলিফা উমার ইবনু খাত্তাবের পক্ষ থেকে অপসারণকৃত। তবে পুরো শামের সাধারণ সেনাপতিত্ব আবু উবায়দাহ নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব তুলে দেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর হাতে।

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে বসে যান। সামরিক ইতিহাসের অন্যতম এক পরিকল্পনা। তিনি তার বাহিনীকে 'কার্ডোস' পদ্ধতিতে ৩৯টি উপদলে বিভক্ত করেন। দুনিয়ার সামরিক ইতিহাসে কার্ডোস পদ্ধতি ছিল একটি নতুন আবিষ্কার। ৩৯টি উপদল। প্রতিটিতে এক হাজার করে মুজাহিদ। বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার। প্রত্যেক এক হাজার নিয়ে গঠিত হয় একেকটি ইউনিট। প্রত্যেক ইউনিটের সৈন্যরা ছিলেন একই গোত্রের। প্রত্যেক গোত্রকে তিনি উৎসাহ দেন, যেন তাদের দিক থেকে শত্রুরা আক্রমণ করতে না পারে।

বাহিনীর ডানে নিযুক্ত করেন মুআজ ইবনু জাবল ﵁-কে। বামে কুবাস ইবনু আশইয়াম ﵁-কে। নিজে থাকেন অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে। হাশিম ইবনু উকবা ইবনু আবু ওয়াক্কাস ﵁-কে নিয়োজিত করা হয় পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে।

এরপর খালিদ ছক আঁকতে শুরু করেন যুদ্ধের ময়দান নিয়ে। স্থান নির্বাচন করেন। আমার বিশ্বাস, এ স্থান নির্বাচন ছিল স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে। তা হল ইয়ারমুকের ময়দান। এখানে সংঘটিত হতে যাচ্ছে ইসলামের অন্যতম বিখ্যাত লড়াই। এমনকি দুনিয়ার ইতিহাসেরও একটা অন্যতম লড়াই। আমি নিজে ইয়ারমুকের ময়দান দেখেছি। জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সীমান্তে অবস্থিত। আমরা আল্লাহর কাছে দোআ করি তিনি যেন ফিলিস্তিনকে পুরাপুরি স্বাধীন করে দেন।

ইয়ারমুক একটি দুর্গম অঞ্চল। তিনদিক থেকে তা বড় বড় গভীর খাদ বেষ্টিত। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ রোমান বাহিনীকে এই ময়দানে নির্দিষ্ট একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য করেন। এ

ময়দানের অন্যান্য প্রান্তে অবস্থান নিয়ে সবদিক বন্ধ করে দেন। যাতে রোমান বাহিনী একযোগে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায় এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আর ময়দানের সংকীর্ণতা রোমানদের নতুন কৌশল সৃষ্টি করতে না দেয়। এভাবে তিনি বিশাল রোমান বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলতে সক্ষম হন। তদুপরি ময়দানের পশ্চাতভাগে ছিল গভীর খাদ। যদি তিনি মুসলিম বাহিনী নিয়ে রোমানদের উপর চেপে বসতে পারেন, তা হলে প্রচুর সৈন্য এ খাদে পতিত হবে। খাদটির নাম ছিল 'ওয়াকুসা'। খাদটি যথেষ্ট বড় ও গভীর ছিল। সন্দেহ নেই, যে এতে পতিত হবে, সাথে সাথে প্রাণ হারাবে। এ সবই ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর পরিকল্পনা। আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-এর কথা—

বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে ব্যক্তিত্ব, নকশা, পরিকল্পনা, যোগ্যতা, নেতৃত্ব ও বীরত্ব কিছুই ফলপ্রসু নয়। এটাই ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদের আকিদা। এ জন্যই তিনি সর্বদা বিজয়ী হতেন।

৫ রজব ১৫ হিজরী, মুতাবিক ১২ আগস্ট ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ। সব মুসলমানের উচিত তারিখটি মুখস্ত করে রাখা। সন্তানাদি ও পুরো বিশ্বকে শিক্ষা দেওয়া। এ দিনেই সংঘটিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধ।

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ ছিলেন মুসলিম বাহিনীর দায়িত্বে। তাঁর শত্রুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছিল যুদ্ধ শুরুর আলামত। তিনি মুসলমানদের দুশমনের সামনে সবার আগে চলে যেতেন। তিনি ইসলামী লশকরের সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁর পাশে দাড়ায় আরেকজন সৈনিক। বিরাট সংখ্যক রোমান বাহিনী দেখে ভীত হয়ে সে বলে ওঠে, রোমানরা কতই না বেশি! আর মুসলমানদের সংখ্যা কতই না কম!

তখন উত্তেজিত হয়ে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁ বলেন—

এই লোক! চুপ করো। পারলে বলো, মুসলমানরা কতই না বেশি! আর রোমানরা কতই না কম! কোনো সন্দেহ নেই আমরা

একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জন করি। আল্লাহ লাঞ্ছিত না করলে মুসলমানরা কখনও লাঞ্ছিত হয় না। আল্লাহর কসম! যদি আশকার (ঘোড়াটি) রোগ থেকে সুস্থ থাকত...! আর তারা সংখ্যায় আরও দ্বিগুণ হত (তা হলেও ভাবতাম না)।

আশকার ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর নিজস্ব ঘোড়া। সেটা তখন অসুস্থ ছিল। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ এ যুদ্ধে অন্য একটি ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করছিলেন। সেটা তাঁর পছন্দমত কৌশল তৈরি করছিল না। তাঁর নিজের ঘোড়া যদি সুস্থ থাকত, তা হলে শত্রু বাহিনীর দ্বিগুণ হওয়া তাঁকে ভাবাত না। কারণ, তিনি সংখ্যাধিক্যকে ভয় করতেন না।

এভাবেই একটি আকিদা বিজয়ী হয়। মানব-ইতিহাসের অন্যতম ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংঘর্ষ। উড়তে থাকে ধুলো-বালি। মুসলমানদের দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

একদিনেই মুসলমানদের মহাবিজয় সম্পন্ন হয়। শামের ভূখণ্ডে, ইয়ারমুকের ময়দানে। রোমান বাহিনী পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দুই লাখ সৈন্যের এক লাখ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে চূর্ণ হয়ে যায় রোমান সাম্রাজ্যের দম্ভ-অহংকার। মুসলমানদের হাতে নিহত হয় ৪০ হাজার রোমান যোদ্ধা। ওয়াকুসা গর্তে পড়ে মারা যায় অবশিষ্ট ৯০ হাজার। এতে রোমান বাহিনীর কোমর ভেঙে যায়। অবশিষ্ট সৈন্যরা পালিয়ে জীবন বাঁচায়।

এ যুদ্ধের পরাজয়ের সংবাদ হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছে। তিনি তখন আন্তাকিয়া শহরে অবস্থান করছিলেন। হিরাক্লিয়াস বড় একটি টিলায় আরোহন করেন। সেখান থেকে তিনি সিরিয়া পর্যবেক্ষণ করতেন। তার নিয়ম ছিল, যখন তিনি আল-কুদসে তীর্থকর্মে আসতেন, অথবা এমনিতেই সিরিয়া আসতেন, তখন এ টিলায় চড়ে বলতেন–

> হে সিরিয়া! তোমার প্রতি সালাম, ওই ব্যক্তির সালাম, যে কিছুক্ষণ পরই আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে।

কিন্তু এবার তিনি বলেন–

> তোমার প্রতি সালাম হে সিরিয়া! বিদায়ী যাত্রীর বিদায়ী সালাম। এরপর তোমার কাছে আর ফিরে আসা হবে না!

তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, তার বাহিনীর এ বিপর্যয়ের পর তিনি এখানে আর ফিরে আসতে পারবেন না। মুসলিম অঞ্চলগুলোতে তখন আনন্দ ছেয়ে যায়। বিজয়ের সংবাদ পৌঁছে যায় সর্বত্র। আল্লাহ ﷻ এই মহান বিজয় মুসলমানকে দান করেন ৫ রজব ১৫ হিজরী। অবশিষ্ট রোমান সৈন্যরা শামের অঞ্চলসমূহ ছেড়ে চলে যায়। এ যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী পুরো শামে ছড়িয়ে পড়ে।

সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ পুরো বাহিনীকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন। ইয়াযিদ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ-কে দামেশকের নেতৃত্বে নিয়োগ করেন। তাঁর সঙ্গী বানিয়ে দেন তাঁরই ভাই মহান সাহাবী মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ-কে। তাদের উপর ন্যাস্ত করেন সিরিয়ার বাকি শহর ও লেবানন অঞ্চল বিজয়ের ভার। লেবানন তখন ছিল শামের অধীনে। এভাবে লেবানন ও সিরিয়ার অবশিষ্ট শহরগুলো ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফইয়ান ও মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ-এর হাতে বিজিত হয়। আবু উবায়দাহ শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﷺ-কে নিযুক্ত করেন জর্ডানের দায়িত্বে।

ফিলিস্তিনে রোমান শাসন স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ ৭০০ বছর। এ ৭০০ বছরের শেষ বছরটি ছিল ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﷺ খুব সহজে জর্ডান জয় করেন। খুব সহজে তিনি জর্ডানের প্রতিটি শহরে প্রবেশ করেন এবং পুরো জর্ডানকে ইসলাম ও মুসলমানদের অধীনে নিয়ে আসেন।

সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ নিজে রওয়ানা হন হিমস অভিমুখে। সাথে নেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-কে। আমাদের মহান বীর আমর ইবনু আস ﷺ-কে তিনি প্রেরণ করেন ফিলিস্তিন অভিমুখে। যাতে প্রিয় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে সৃষ্টি হয় সাহাবী আমর ইবনু আস ﷺ-এর নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস।

ফিলিস্তিনে আমর ইবনু আস ﵁

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আমর ইবনু আস ﵁-এর বিজয়াভিযান নিয়ে আলোচনার আগে আমরা এ মহান সাহাবীকে নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। আফসোস! ইতিহাস অনেক বিকৃতির শিকার। উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে মুসলমানদের ইতিহাসে এসব বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আমর ইবনু আস ﵁-সহ অনেক মহান বীরের ইতিহাস আজ চরম বিকৃতির শিকার। মিডিয়া, সিনেমাতেও আজ এসব বিকৃতির ছড়াছড়ি। এসব মহান ব্যক্তিদের সাথে যামানা খুব কম উদারতা দেখিয়েছে। আমি নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে আমর ইবনু আস ﵁-এর কৃতিত্ব তুলে ধরব না। আমি শুধু তাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ-এর কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি। নবীজী ﷺ তার সম্পর্কে বলেন—

> মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর আমর ইবনু আস ঈমান এনেছে। [তিরমিযী : ৩৮৪৪]

সবাই ইসলাম শব্দের অর্থ জানে। ইসলাম ও ঈমানের মধ্যকার পার্থক্যও জানে। কিন্তু ইসলাম শব্দটি যখন ঈমানের সাথে মিলিয়ে ব্যবহৃত হয় তখন ইসলাম বলে উদ্দেশ্য হয় বাহ্যিক আত্মসমর্পণ। আর ঈমানের উদ্দেশ্য হয় হৃদয়ের গভীরের অবস্থা। আমর ইবনু আস ﵁-এর বেলায় নবীজী এবিষয়টিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য ওহীর অনুকূল। এই মূল্যায়নে যদি কোনো অসংগতি থাকত, তা হলে ওহী কিছুতেই নীরব থাকত না। প্রিয়নবী ﷺ আমর ইবনু আস ﵁ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে বলেছেন—

> নিশ্চয়ই আমর ইবনু আস কুরাইশের অন্যতম নেককার। [তিরমিযী : ৩৮৪৫]

নববী যুগে রসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ওমানের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। নবীজী ﷺ-এর ওয়াফাত পর্যন্ত তিনি সে পদে বহাল ছিলেন। তাঁর দীনদারী, আমানতদারী ও তাকওয়ার ব্যাপারে নবীজী ﷺ এতটাই আশ্বস্ত ছিলেন যে, ইসলামী ভূখণ্ডের একটি অংশ তাঁর হাতে সোপর্দ করেছিলেন। খারাজ আদায়, জনগণের পরিচালনা এবং মানুষকে দীন শেখানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিষয়টি আমর ইবনু আসের মর্যাদা অনেক বাড়িয়েছে।

আমর ইবনু আস ﵁ ওমানের মাটিতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন। এরপর ফিলিস্তিনে। তারপর মিসরে। একটু ভেবে দেখুন, এ দেশগুলোতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানরা যেসব আমল করবেন, তার একটি অংশ এ মহান সাহাবীর আমলনামায়ও জমা হবে। নবীজী ﷺ-এর কতইনা প্রিয় ও মর্যাদাবান একজন সাহাবী তিনি!

খলিফা আবু বকর সিদ্দীক ﵁ তাঁকে ফিলিস্তিন অভিমুখে পাঠানোর জন্য নির্বাচন করেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, শাম বিজয়ের শুরুতে ইসলামী বাহিনী ছিল ৪ ভাগে বিভক্ত। ফিলিস্তিন অভিমুখী চতুর্থ লশকরের দায়িত্বে ছিলেন আমর ইবনু আস। এখানে আমরা একটু বিরতি দিই এবং বলি, আমর ইবনু আসই কেন?

এর কারণ হচ্ছে আমর ইবনু আস ﵁-এর মা ছিলেন কুযাআহ গোত্রের মেয়ে। কুযাআহ গোত্রের অবস্থান ছিল ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী উত্তর আরব উপদ্বীপে। হয়তো এটা ছিল তাঁকে নির্বাচন করার অন্যতম এক কারণ। কেননা, তিনি এ ভূখণ্ড সম্পর্কে বেশি অবগত ছিলেন। ওখানকার মানুষজন ছিল তার আত্মীয়-স্বজন। অঞ্চল জয় করা অন্যদের চেয়ে তাঁর জন্য সহজ ছিল।

তবে তাঁকে নির্বাচন করার এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, তিনি ছিলেন অসাধারণ এক সামরিক ব্যক্তি। সেনা পরিচালনায় তিনি ছিলেন আরবদের মধ্যে অন্যতম দক্ষ। তার হেকমত ও বুদ্ধিমত্তা ছিল

প্রবাদতুল্য। বাহিনী গঠন, এমনকি জাতি গঠনেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারঙ্গম। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি তিন তিনটি দেশ জয় করেন। ওমান, ফিলিস্তিন ও মিসর। এ সবই প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, বীরত্ব ও সফল নেতৃত্বের প্রমাণ বহন করে।

খলিফা আবু বকর সিদ্দীক ﵁ যখন তাঁকে ওমানের গভর্নর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে প্রেরণের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি বলেছিলেন—

> আমি ইসলামের তীরসমূহ থেকে একটি তীর। আল্লাহর পর আপনিই সেই তীরসমূহের সঞ্চয়কারী ও নিক্ষেপকারী। আপনি শক্ত, মজবুত ও উত্তম তীরটি গ্রহণ করুন এবং তা নিক্ষেপ করুন।

অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, এ বিষয়ে আমার কোনো নিজস্ব ইচ্ছা নেই। আমি শুধু ইসলামের তীরসমূহ থেকে একটি তীর। আপনি যেখানে উম্মতের কল্যাণ মনে করেন, আমাকে সেখানেই নিক্ষেপ করুন। চাই সেই স্থান হোক ফিলিস্তিন, মিসর অথবা ওমান, কিংবা অন্য কোথাও। আমি খলিফাতুল মুসলিমীনের ইচ্ছার অনুগত। আমাকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য যেখানেই পাঠানো হোক, আমি প্রস্তুত। এ অনন্য বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের কারণে তিনি একাধিক দেশে ইসলামের বিজয় নিশান ওড়াতে সক্ষম হন। আমরা আল্লাহর কাছে দোআ করি, তিনি তাঁর মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধের পর আমর ইবনু আস ﵁ নতুন করে ফিলিস্তিনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। বিলম্ব না করে তিনি বাহিনী নিয়ে জর্ডান নদী পার হন। একের পর এক ফিলিস্তিনী শহর জয় করে সামনে এগিয়ে চলেন। আপনারা যদি আমর ইবনু আস ﵁-এর নেতৃত্বে ইসলামী লশকরের তৎপরতার মানচিত্রের দিকে তাকান, তা হলে দেখতে পাবেন, তিনি প্রথমে সিবাস্তিয়া (Sebastia) তারপর নাবলুস, তারপর লুদ (Lod), তারপর ইবনা (Yibna), তারপর আমাওয়াস (Emmaus), তারপর বায়ত-জিবরীন (Bayt Jibrin), তারপর রাফাহ (Rafah) জয় করেন।

কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে তিনি ইয়াফাও জয় করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসব অঞ্চলের সাথে গাজাকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আপনারা দেখতে পাবেন এসব বিজয় ছিল আল-কুদসের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম জুড়ে বিস্তৃত। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে তিনি আল-কুদসের কাছে ঘেঁষেননি। কেননা, আল-কুদস ছিল ফিলিস্তিনের সবচেয়ে সংরক্ষিত শহর। এর অভ্যন্তরে ছিল রোমানদের মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ পবিত্র শহরকে রোমানরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিত।

ফিলিস্তিনের এসব শহর জয় করার পর শুধু দুটি শহর অবশিষ্ট থাকে। আল-কুদস ও ভূমধ্য সাগরের উপকূলে অবস্থিত কায়সারিয়া। তিনি বুঝতে পারেন এবার আল-কুদসের দিকে এগোনোর সময় হয়েছে। আল-কুদস অভিমুখে গমনকালে তিনি বিরাট রোমান বাহিনীর সম্মুখীন হন। প্রসিদ্ধ রোমান সেনাপতি ত্রিবিউনের (Tribune)-এর নেতৃত্বে রোমান বাহিনী আল-কুদসের সম্মুখে সেনানিবাস গড়েছিল। অনেকেই হয়তো 'রোমের ত্রিবিউন' নামটি শুনেছি। সে ছিল তৎকালীন দুনিয়ার প্রখ্যাত সেনাপতি।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-এর কাছে যখন খবর পৌঁছে যে, আল-কুদস শহরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রোমান বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে ত্রিবিউন, তখন তিনি একটুও বিচলিত হননি। বরং তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্য বলেন, যা তাঁর মত মহান ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমর ইবনু আস ﵁-এর ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য হয়ে আছে। তিনি বলেন—

> আমরা রোমের ত্রিবিউনের মোকাবেলায় আরবের ত্রিবিউনকে এগিয়ে দিয়েছি। অপেক্ষা করো সুখবরের।

তাদের কাছে ত্রিবিউনের মত অসাধারণ সেনাপতি রয়েছে, এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। তেমনই একজন আরব ত্রিবিউনকে আমরা তার দিকে ছুড়ে দিয়েছি। এবার দেখা যাক কী হয়! নিঃসন্দেহে বিজয় আমাদেরই হবে। একথা বলে তিনি আমর ইবনু আস ﵁-এর কথা বুঝিয়েছেন। 'কোনো সুসংবাদের অপেক্ষা করো' অর্থাৎ আমরা অপেক্ষা করব এবং দেখব কী হয়। ইনশা আল্লাহ এ যুদ্ধেও আমর ইবনু আস ও মুসলিম বাহিনীই বিজয়ী হবেন।

উভয় বাহিনী নিকটবর্তী হয়। আমর ইবনু আস ﷺ ত্রিবিউনের দুর্গের অভ্যন্তরে সৈন্যদের কার্যকলাপ জানতে একজন দূত পাঠাতে চান। দূতের পাঠানো তথ্য সঠিক হয় কি না, তা নিয়ে তিনি আশঙ্কায় ছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত নেন নিজেই রোমানদের দুর্গে প্রবেশ করবেন। কাজটি ছিল খুবই আত্মঘাতী। কিন্তু তিনি ইসলামী বাহিনীর কল্যাণের দিক চিন্তা করছিলেন। চাই তা নিজের জীবনের বিনিময়েই হোক না কেন। আমরা হয়তো জানি না যে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের জন্য অনেক কুরবানী দিতে হয়েছে। ঝরেছে অসংখ্য শহীদের তপ্ত খুন। বহু প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ ﷻ মুসলমানদের দিয়েছেন এ পবিত্র ও বরকতময় ভূখণ্ড।

আমর ইবনু আস ﷺ নিজেই দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একজন দূতের ছদ্মবেশ ধারণ করেন। নিজের নাম গোপন করে আল-কুদসে বিজয়-সন্ধি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার অজুহাতে ত্রিবিউনের কাছে উপস্থিত হন। তার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। রোমের ত্রিবিউনও তার থেকে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। আমর ইবনু আস ﷺ সুকৌশলে তা এড়িয়ে যান। রোমের ত্রিবিউনও ছিল যথেষ্ট চতুর। তাই আমর ইবনু আস তার থেকে তথ্য বের করতে ব্যর্থ হন।

রোমের ত্রিবিউন আমর ইবনু আস ﷺ-এর বিচক্ষণতায় বুঝতে পারে যে, তিনি কোনো সাধারণ সৈনিক নন। তিনি হয়তো সেনাপতি অথবা তার কোনো উপদেষ্টা। এজন্য সে নীতি ভঙ্গ করে দূতকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। অথচ ত্রিবিউন জানত না যে, ইনিই আমর ইবনু আস। এসব ঘটনা ঘটে চলছিল দুর্গের অভ্যন্তরে। আমর ইবনু আস ﷺ নিজের দূরদর্শিতায় বুঝতে পারেন, ত্রিবিউন তাকে হত্যার জন্য ফাঁদ পাততে চলেছে। কাজেই বের হওয়ার জন্য তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। ত্রিবিউনকে বললেন—

> আমি ও আমার দশজন সঙ্গী মিলে আমাদের আমীরকে তার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিই। এ বিষয়ে আমি একাকী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখি না। আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি অপর দশজন সঙ্গীকে নিয়ে আসতে পারি। সকলে মিলে

> আলোচনা করলে আমরা একটি যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

রোমের ত্রিবিউন চিন্তা করে একজনের জায়গায় দশজন! যদি আমি তাকে যাওয়ার সুযোগ করে দেই তা হলে একসাথে দশজনকে হত্যা করা যাবে। একথা ভেবে রোমান বাহিনী খুশি হয়ে তাকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। আমর ইবনু আস ﷺ বেরিয়ে এসে শপথ করেন, এরূপ পাগলামি আর কখনও করবেন না।

উমার ইবনু খত্তাব ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন—

> আল্লাহ আমর ইবনু আসকে কত নিয়ামত দিয়েছেন! কত উন্নত চিন্তা! কেমন প্রখর মেধা! কত বিচক্ষণতা! আল্লাহ এমন নিয়ামতের সমাহার খুব কম মানুষকেই দিয়ে থাকেন।

আমর ইবনু আস ﷺ আর ফিরে না আসায় রোমের ত্রিবিউন বুঝতে পারে লোকটি তার চোখে ধুলো দিয়েছে। সে বলে ওঠে, মানুষের মধ্যে এমন লোক সত্যিই বিরল।

বাস্তবেই এ কৌশলের কারণে আমর ইবনু আস ﷺ বেঁচে গিয়েছিলেন। এরপর আমর ইবনু আস ﷺ তার বাহিনী প্রস্তুত করে আল-কুদস দুর্গ ঘেরাও করে ফেলেন। তিনি ছিলেন আল-কুদস দুর্গ অবরোধকারী প্রথম ব্যক্তি। ত্রিবিউন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে ভিতরে চলে যায়। আমর ইবনু আস তার উন্নত সামরিক দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ মেধার আলোকে বুঝতে পারেন তার স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের মাধ্যমে এ শক্তিশালী দুর্গ জয় করা খুবই কঠিন। এজন্য তিনি ইসলামী বাহিনীর মূল সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চেয়ে তাৎক্ষণিক বার্তা পাঠান। তিনি ছিলেন বাস্তবমুখী ব্যক্তি; তাঁর কাছে কোনো অতিরঞ্জন ছিল না। বার্তায় তিনি বলেন—

> আমার সীমিত লশকর আল-কুদসের বিশাল দুর্গ জয় করার ক্ষেত্রে কাজে আসবে না।

বাস্তবেই দুর্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুব মজবুত। তদুপরি তাদের নেতৃত্বে ছিল বিখ্যাত রোমান সেনাপতি ত্রিবিউন। আবু

উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ সাথে সাথে চলে আসেন। ইয়াযিদ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ-কে হিমস থেকে ডেকে পাঠান। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-কেও আল-কুদসে আগমনের আহবান জানান। মুআজ ইবনু জাবাল ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﷺ-কেও ডেকে আনেন। এভাবে আল-কুদসের আশপাশের ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে (শামের) পুরো ইসলামী লশকরের সমাহার ঘটে।

প্রায় চার হাজার সাহাবী আল-কুদস অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। যেন রব্বুল আলামীন ﷺ-এর পক্ষ থেকেই ছিল এ বরকতময় ভূখণ্ডের সম্মানে এই আয়োজন। এ ভূখণ্ড জয় করতে আসেন এমনসব ব্যক্তি, যাদের একেকজন ছিলেন এক জাতির সমতুল্য। একটু অনুভব করে দেখুন, আল-কুদসের বরকতময় ভূখণ্ডে মহান ব্যক্তিদের এ অভূতপূর্ব সম্মিলন।

বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী বাহিনী এসে আল-কুদস শহর অবরোধ করেন। এরপর আসেন আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ। তাঁর আগমনে তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ইসলামী লশকর। কেননা, তিনি ছিলেন সমগ্র শামের মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান। এ তাকবীর শুনে আল-কুদসের পাদ্রী বলে ওঠেন, এ লোকটি যদি তাদের আমীর হয়, আর তার বৈশিষ্ট্যাবলী আমাদের কিতাবে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে মিলে যায়, তা হলে এ শহর তাদেরকে হস্তান্তর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তিনি রোমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব। কেননা, তিনি যদি সেই লোক হন, তা হলে যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। আল-কুদসের পাদ্রী যখন আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন বুঝতে পারেন ইনি তাদের কিতাবে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোক নন। তিনি রোমানদের কাছে ফিরে এসে ঘোষণা করেন, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কেননা, ইনি সেই ব্যক্তি নন। এতে আল-কুদসের প্রাচীরের উপর শুরু হয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। মুসলমানরা আল-কুদসের অভ্যন্তরে তীর নিক্ষেপ শুরু করেন। রোমানরাও অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল

দেওয়া মুসলমানদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অপর দিকে দুর্গের ভিতরে রোমান ও খ্রিস্টানদের জীবনও হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

আল-কুদসের পাদ্রী বুঝতে পারেন তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। এ কঠোর অবরোধ অব্যাহত থাকলে তারা অচিরেই ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা যাবে। তিনি নতুন করে আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ-এর সাথে আলোচনার আবেদন জানান।

এ আলোচনায় তিনি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনু খত্তাব ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যাবলি খুঁটে খুঁটে জেনে নেন। আমীরুল মুমিনীন তখন কয়েক শ' কিলোমিটার দূরে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলেন। আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ পাদ্রীর কাছে উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরেন। তখন পাদ্রী বলে ওঠেন, এ সকল গুণাবলীর কথাই রয়েছে আমাদের কিতাবে। আপনাদের দাবি কী?

আবু উবায়াদা ইবনু জাররাহ ﷺ বলেন, হয়তো ইসলাম, অথবা জিযিয়া। অন্যথ্যায় যুদ্ধ।

পাদ্রী বলেন—

> আমরা জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করতে রাজি আছি। তবে শর্ত হচ্ছে আল-কুদসের চাবি গ্রহণ করতে স্বয়ং খলিফা উমার ইবনু খাত্তাবকে আসতে হবে।

আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ উমার ইবনু খাত্তাবকে দূত পাঠিয়ে জানান যে, তার এখানে আসা খুব জরুরী। খলিফা ছোট্ট একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে বলেন, আমি আসছি।

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ রওয়ানা হন। সঙ্গে নেন একজন মাত্র গোলাম। তা ছাড়া আর কিছু না। অথচ তখন তিনি সেই ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি, যা তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের দম্ভ চূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, যেই পরাশক্তি দুটি পুরো দুনিয়াকে ভাগ করে রেখেছিল। উমার ﷺ তখন শাসন করেন

পুরো আরব উপদ্বীপ, ইয়ামান ও ওমান। তাঁর শাসনে আরও যোগ হয়েছে ইরাকের ভূখণ্ড ও বৃহত্তর শাম– সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিন। আজকের হিসাবে তিনি তখন শাসন করতেন দশ থেকে পনেরটির মত দেশ বা তারও বেশি। এতদসত্ত্বেও তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আল-কুদসের পথে রওয়ানা হন, যার দূরত্ব হাজার কিলোমিটার বা আরও বেশি। তাঁর সঙ্গে মাত্র একজন গোলাম। একটি বাহনে গোলাম আর তিনি পালাবদল করে আরোহন করেন। ইনি কে? ইনি উমার ইবনু খাত্তাব ﵁। আমরা সংখ্যাধিক্য বা হাতিয়ারের মাধ্যমে বিজয়ী হতাম না। আমরা বিজয় অর্জন করতাম আমাদের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। আল্লাহ ﷻ-ই মুসলিম উম্মাহকে সাহায্য করেন। তাদের সম্মান-মর্যাদা ও শান-শওকত বৃদ্ধি করেন।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ আল-কুদসে গিয়ে পৌঁছেন। রাস্তায় তিনি গোলামের সাথে পালাক্রমে বাহনে চড়ছিলেন। যখন তাঁরা দু'জন আল-কুদস পৌঁছেন– আমি মনে করতাম এই বর্ণনা দুর্বল; কিন্তু আমি এর পক্ষে দলিল পেয়েছি। ইতিহাসবিদ ইবনু আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ– খলিফা উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ যখন আল-কুদস শহরে পৌঁছেন তখন বাহনে আরোহনের পালা ছিল গোলামের।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ তার পাশে পাশে হেঁটে চলছিলেন। পথে কাঁদাপানির একটি জায়গা এলে তিনি নিজ পায়ে তা মাড়িয়ে অতিবাহিত হন। একটু ভেবে দেখুন, তার সুরত-হাল! তার পরনের কাপড় ছিল তালিযুক্ত। অথচ দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডার তখন তাঁর কাছে। কেসরা ও কায়সারের ধন-ভাণ্ডর তাঁর হাতের মুঠোয়। অথচ তিনি (আল-কুদস) প্রবেশ করছেন তালিযুক্ত সাধারণ পোশাকে। তিনি কাঁদা-পানি মাড়িয়ে যাচ্ছেন, আর তার বাহনে চড়ে আছে তাঁরই গোলাম! এই বৈশিষ্ট্যের কথাই লেখা ছিল খ্রিস্টনদের কিতাবে।

যখন আল-কুদসের পাদ্রী এ দৃশ্য দেখতে পান, তিনি বলে ওঠেন, যতদিন তাদের এ বৈশিষ্ট্য থাকবে, তাদের বাদশাহর এই বৈশিষ্ট্য থাকবে, ততদিন দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদেরকে পরাজিত করতে

পারবে না। তাদের অন্তরে দুনিয়ার কোনো স্থান নেই। তারা একান্তই রবের জন্য নিবেদিত। দুনিয়ার চাকচিক্য আর দুনিয়াদারদের ভোগ-বিলাসের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ এই বেশ-ভূষায় প্রবেশ করেন। তাঁর অবস্থা দেখে মুসলমানরা আঁতকে ওঠেন। সেনাপতি আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﵁ ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ মানুষ। তবুও তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি (মনে মনে) বলেন, মুসলমানদের অধিপতি এই বেশ-ভূষায় কীভাবে প্রবেশ করলেন! রোমানরা তো আমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবে।

আবু উবায়দাহ উমার ইবনু খাত্তাবের কাছে গিয়ে বলেন, কীভাবে আপনি এ বেশ-ভূষায় প্রবেশ করলেন? উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ তখন তাঁর বুকে মৃদু চাপড় দিয়ে বলেন–

> ইস, আবু উবায়দাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ একথা বলত! আমরা ছিলাম অবহেলিত জাতি। ইসলামের বদৌলতে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্যত্র সম্মান খুঁজব, আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।

উমার যেকোনো বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন। শুধু তিনি মুখেই বলতেন না; বরং বাস্তবে পরিণত করতেন। বিরাট এক বাহিনী তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেছিল। আল্লাহ ﷻ তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন। এসব হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য, যারা আল-কুদস জয় করবে।

তারা এমন কিছু লোক, যাদের হৃদয় দুনিয়ার মোহ থেকে ছিল একেবারে পরিচ্ছন্ন। আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনো ব্যস্ততা তাদের ছিল না। তাঁদের অন্তরে কোনো অহংকার ছিল না; ছিল শুধু বিনয়। সেনাপতি আর সৈন্যদের মধ্যে ছিল পিতা-পুত্রের মত সম্পর্ক, ভাই-ভাইয়ের মত সম্পর্ক। অগ্রাধিকার, অহঙ্কার, গর্ব ইত্যাদি তাদের মধ্যে ছিল না। বিজয়ী বাহিনীর এগুলোই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।

এ অবস্থায় উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ বৈঠকে বসেন। তাঁর সাথে থাকেন ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফইয়ান, মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান, আবু

উবায়দাহ ইবনু জাররাহ, আমর ইবনু আস, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ ﷺ প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবী ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বসেন আল-কুদসের পাদ্রীর সাথে সন্ধি ও অঙ্গীকারনামা লেখার জন্য।

আসুন, দেখে নিই ইতিহাসে 'উমারী সন্ধি' নামে খ্যাত এই পত্রে কী ছিল?

আমাদের এই সময়ে এ চুক্তিপত্র কোথায় সংরক্ষিত আছে?

আল-কুদসে পৌঁছে এবং মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে উমার ইবনু খাত্তাব কী কী করেছিলেন?

আল-কুদস শহর বিজয়ের পর ইসলামী লশকর কী করেছিল।

উমারী সন্ধিপত্র

উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ ও আল-কুদসের পাদ্রীর মাঝে ঐক্য হয় যে, শহরের ফটক খুলে দেওয়া হবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, যা উমারী চুক্তিনামা নামে পরিচিতি লাভ করবে। ১৬ হিজরী সনের রবিউল আখির, মুতাবিক ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এ চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুদসের কিয়ামাহ গীর্জায় আজও তা সংরক্ষিত আছে। মুসলিম শাসকগণ তা কার্যকর করেন। এই চুক্তি কার্যকর রাখতে তারা যত্নবান থাকেন এক-দুই বছর নয়; বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী, একেবারে উসমানী খেলাফতের পতন এবং ১৯১৭ সালে ইংল্যান্ডের ফিলিস্তিন দখল করা পর্যন্ত।

উমারী চুক্তিনামায় উমার ইবনু খত্তাব ﷺ বলেন—

> এ হচ্ছে সেই চুক্তি যাতে আল্লাহর বান্দা উমার ইলিয়া (আল-কুদস)-বাসীদেরকে দেন। তিনি নিরাপত্তা দেন তাদের জান, মাল, গীর্জা ও ক্রুশের।

এখানে শুধু গীর্জার উল্লেখই যথেষ্ট ছিল। আমরা বলে থাকি— 'তারা ঈসাকে হত্যা করেনি। ক্রুশ বিদ্ধও করেনি; বরং বিষয়টি তাদের জন্য ঘোলাটে করে দেওয়া হয়েছে।' ইসলামী আকিদা ক্রুশের আকিদা প্রত্যাখ্যান করলেও উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ তাদেরকে তাদের আকিদার উপর বহাল রাখেন। যদিও আমরা মুসলিম হিসাবে তা অস্বীকার করি এবং ভিন্ন আকিদা পোষণ করি।

> তিনি নিরাপত্তা দেন তাদের জান-মাল ও ক্রুশের। তাদের সুস্থ-অসুস্থ নির্বিশেষে পুরো জাতির।

অর্থাৎ আল-কুদসে বিদ্যমান সমস্ত খ্রিস্টানের।

> তাদের গীর্জাসমূহ বাসস্থান বানানো হবে না। সেগুলো ধ্বংসও করা হবে না। সেগুলো সংকীর্ণও করা হবে না। সেগুলোর আঙিনাও সংকীর্ণ করা হবে না। তাদের ক্রুশও ধ্বংস করা হবে না। তাদের কোনো সম্পদ নষ্ট করা হবে না। তাদেরকে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বিরক্ত করা হবে না। তাদের কাউকে কোনো কষ্ট দেওয়া হবে না। ইলিয়াতে তাদের সাথে কোনো ইহুদীকে বাস করতে দেওয়া হবে না।

এটা ছিল খ্রিস্টানদের জীবন, ধন-সম্পদ ও ধর্মের নিরাপত্তার এক বিশেষ নিশ্চয়তা। ইলিয়াতে ইহুদীদের বসবাস নিষিদ্ধ করার সর্বশেষ শর্তটি ছিল আল-কুদসের পাদ্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে। উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ আল-কুদসের পাদ্রীর এই আবেদন বহাল রাখেন। তবে তাদের আল-কুদসের অভ্যন্তরে পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শনের অনুমতি ছিল। এরপর আমীরুল মুমিনীন বলেন—

> ইলিয়াবাসী অবশ্যই ততটুকু জিযিয়া দিতে বাধ্য থাকবে, যতটুকু মাদায়েনবাসীরা দিয়ে থাকে। তারা ইলিয়া থেকে রোমান ও দস্যুদের অবশ্যই বের করে দিবে।

রোমান বলতে বোঝানো হয়েছে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত রোমান লশকরকে। তাদের কয়েকটি ইউনিট আল-কুদসের ভিতরে তখনও বিদ্যমান ছিল। তাই শহরের নিরাপত্তার জন্য পাদ্রী ও খ্রিস্টানদের উপর এ বাহিনীকে বের করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ চুক্তির কারণে উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ চাইছিলেন, আল-কুদসের অভ্যন্তরে যেন কোনো যুদ্ধ না হয়। কিন্তু যদি দস্যুরা এ দুর্গের ভিতর অবস্থান করতে থাকে, তা হলে যুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য হব। কাজেই ইলিয়াবাসী অবশ্যই তাদেরকে বের করে দিবে। এরপর তিনি বলেন—

> তাদের মধ্য থেকে যে বেরিয়ে যাবে।...

অর্থাৎ রোমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবে—তারা হচ্ছে ইসলামের সাথে যুদ্ধরত বাহিনী, যারা পূর্ববর্তী

আজনাদায়ন, বাইসান, ইয়ারমুক, দামেশক ও হিমসসহ বহু ময়দানে মুসলমানদের সাথে মুখোমুখি হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বলেন—

> তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি বেরিয়ে যাবে, তার জান-মাল নিরাপদ। যতক্ষণ না সে কোনো নিরাপদ স্থানে চলে যায়।
>
> উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ তাদেরকে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য নিরাপত্তা দেন।

তাদের মধ্য থেকে যারা আল-কুদসে থেকে যেতে চায়, মুসলমানরা উমারী চুক্তিনামায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবেন। যে ব্যক্তি থেকে যাবে, সে নিরাপদ। তবে ইলিয়াবাসীর মতই জিযিয়া প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তবে কোনো যোদ্ধা আল-কুদসে থাকতে পারবে না।

> ইলিয়াবাসীদের কেউ যদি স্বেচ্ছায় ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ নিয়ে রোমানদের সাথে চলে যেতে চায়, তারও জান-মাল গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত নিরাপদ।

দেখুন, কি অনুগ্রহ ও দয়া! যদি আমাদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছাও তোমার থাকে, তা হলে তুমি আল-কুদস থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাও। এরপর বাইরে গিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে।

চুক্তিনামার সমাপ্তিতে তিনি বলেন—

> তাদের উপর আরোপিত জিযিয়া প্রদানের শর্তে এ চুক্তিনামা বাস্তবায়ন আল্লাহর অঙ্গীকার, তাঁর রসুলের যিম্মা, খলিফা ও মুমিনদের দায়িত্ব।

চারজন সাহাবী এ চুক্তিনামার সাক্ষী হন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, আমর ইবনু আস, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ ও মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵃। এই চারজনের সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ তাদেরকে সম্মান, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততায় অন্যদের চেয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন। কিছু মানুষ উমার ইবনু খাত্তাব ও খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵄-এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতির দাবি করে থাকেন।

এ ঘটনার মাধ্যমে তাদের সেই দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে, উমার তাঁকে সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন এবং অন্যদের উপর প্রাধান্যও দিতেন। এমনইভাবে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ-এর মর্যাদাও প্রমাণিত হয়। যার খেলাফতকাল সম্পর্কে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু এ ঘটনা উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাদের চারজনের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য।

আমরা এ উমারী চুক্তিনামায় দেখতে পাই মুসলমানদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ছাড়। তারা খ্রিস্টানদেরকে তাদের ধারণার চেয়েও অধিক সুবিধা দেন। উমার তাদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দেন। যখন পুরো শহর ছিল ইসলামী বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ। মুসলমানদের বিজয় ছিল সুস্পষ্ট। চার মাস অবরোধের পর শহরের পতন হলেও তাদেরকে দেওয়া হয় জান-মালের নিরাপত্তা ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা। তাদেরকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হয়নি। যদিও আমরা খ্রিস্ট ধর্মের বিপক্ষে এবং ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ সম্পর্কে তাদের আকিদার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম আকিদা পোষণ করি।

এই উমারী চুক্তিনামায় ইলিয়া তথা আল-কুদসে ইহুদীদের বসবাস নিষিদ্ধ করে শর্ত করা হয়। উসমানী খেলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত এ বিধি-নিষেধ বহাল ছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং এই পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আর জীবনের নিরাপত্তা—

বিনিময়ে খ্রিস্টানদের দায়িত্ব কী ছিল?

তাদের দায়িত্ব ছিল শুধু জিযিয়া। উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর খেলাফতকালে সেই জিযিয়া ছিল প্রত্যেক যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক দিনার। যেমন, ইলিয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা যদি হয় তিন লাখ বা চার লাখ এবং তাদের মধ্যে ত্রিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার লোক যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তা হলে এরাই শুধু জিযিয়া প্রদান করবে। যুদ্ধ করতে অক্ষম পুরুষ, বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও এবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি—কাউকেই জিযিয়া দিতে হবে না। যদি এমন হয় যে, যুদ্ধ করতে সক্ষম কেউ আগে জিযিয়া প্রদান করত; কিন্তু বার্ধক্য বা রোগের কারণে সে

যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তা হলে তাকেও জিযিয়া দিতে হবে না। নিঃসন্দেহে এ ছিল অসীম অনুগ্রহ। জিযিয়ার পরিমাণও ছিল মুসলমান কর্তৃক প্রদেয় যাকাতের চেয়ে অনেক কম।

উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ আল-কুদস প্রবেশ করেন। এ দিনটি ছিল এক মহান দিন। তিনি শহর প্রদক্ষিণ করেন। কিয়ামাহ গীর্জার কাছে পৌঁছেন। সরাসরি গীর্জার ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন যোহরের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আল-কুদসের পাদ্রী তাঁকে গীর্জার ভিতরেই সালাত আদায় করতে অনুরোধ করেন। গীর্জায় সালাত আদায় বৈধ জেনেও উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পাদ্রী যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে কেন সালাত আদায় করবেন না, তখন তিনি জওয়াব দেন—

> যদি আমি এখানে সালাত আদায় করি, তা হলে কোনো একসময় মুসলমানরা এই গীর্জা তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিবে। বলবে, এখানে উমার সালাত আদায় করেছিলেন। আমি তোমাদের গীর্জার নিরাপত্তার জন্য এখানে সালাত আদায় করব না।

সালাত আদায়ের জন্য উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ বেরিয়ে পড়েন। মসজিদে আকসা সম্পর্কে জানতে চান তিনি। তখনও মসজিদে আকসা তাঁর নজরে পড়েনি। এজন্য কিয়ামাহ গীর্জা পরিদর্শন শেষে তিনি পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করেন, মসজিদে আকসা কোথায়? পাদ্রী বলেন, আপনি কি সেই জায়গার কথা বলছেন, যেটা ইহুদীরা সম্মান করে? উমার বলেন, হাঁ।

পাদ্রী উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে আল-আকসা মসজিদে যান। উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ দেখতে পান যে, তা শুধু একটি ভবনের ধ্বংসাবশেষ। সবখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। যেন তা ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা জানত যে, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ এই স্থানকে সম্মান করে। একে সম্মান করে ইহুদীরাও। মসজিদের এ অবস্থা দেখে উমার ইবনু খাত্তাব তা পরিচ্ছন্ন করা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে অন্য সাহাবীরাও যোগ দেন। আমীরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ নিজে মসজিদ

ঝাড়ু দেন। ইসলামী লশকরও মসজিদে আকসা পরিচ্ছন্ন করার কাজে লেগে যায়।

মসজিদে আকসায় বিলাল ইবনু আবু রবাহ ﵁ আযান দেন। রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর এ ছিল তাঁর দ্বিতীয় আযান। রসুল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর তিনি আযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা, তিনি যখনই আযান দিতে যেতেন, তখনই প্রিয় নবী ﷺ-এর স্মরণে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত। কান্না চলে আসত। আযান পূর্ণ করতে পারতেন না।

আল-কুদস বিজয়ের মাস খানেক আগে জাবিয়ায় বেলাল একবার আযান দেন, যখন সেখানে ইসলামী বিজয়কে কেন্দ্র করে উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং শামের আমীরগণ সমবেত হয়েছিলেন। উমারের অনুরোধে সাহাবীদের জমায়েতে তিনি এই আযান দিয়েছিলেন। তবে জাবিয়ার এই আযান তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। কাঁদতে কাঁদতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর।

এরপর মসজিদে আকসা ইসলামের ছায়াতলে আসে। সেটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। আল-আকসায় ধ্বনিত হয় রসুল ﷺ-এর প্রিয় মুআযযিনের সুললিত কণ্ঠের আযান। আল্লাহর অনুগ্রহে এবার তিনি আযান পূর্ণ করতে সক্ষম হন। এ ছিল ফজরের সালাত। মসজিদে আকসায় মুসলমানদের প্রবেশের পর প্রথম সালাত।

সালাতে মুসলমানদের ইমামতি করেন উমার ইবনু খাত্তাব ﵁। প্রথম রাকাতে তিনি সুরা সা-দ তেলাওয়াত করেন। সেজদায়ে দাউদ আদায় করেন। মুসলমানদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করার জন্য যে, এটাই সেই জায়গা, যেখানে দাউদ ﵇ তাঁর রবের এবাদত করতেন। এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবীদের এবাদতগাহ মসজিদে আকসা বাদে এখানে অন্যকোনো টেম্পল থাকার আকিদা-বিশ্বাস নিপাত করা হয়।

উমার দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন সুরা ইসরা দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল এই আয়াত তেলাওয়াত করা—

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত— যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। [সুরা বনী-ইসরাঈল : ১]

সালাত শেষ করে তিনি মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ শুরু করেন। এই নির্মাণ ছিল কাঠের মাধ্যমে। উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-এর আমলে এ মসজিদকে তিন হাজার মুসল্লীর সংকুলান হয়, এমন পরিসরে প্রশস্ত করা হয়। মসজিদে আকসার জন্য বিদ্যমান পুরো সীমানা জুড়ে তিনি মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন। সাখরার সীমারেখাও নির্ধারণ করেন। সাখরা হচ্ছে সেই পাথর, যাতে ইসরা ও মিরাজের সময় রসুল ﷺ বোরাক বেঁধেছিলেন।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ অল্প কিছু দিন সেখানে অবস্থান করে প্রশাসনিক বিভিন্ন কাঠামো বিন্যস্ত করেন। এরপর মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশে আল-কুদস ত্যাগ করেন। ফেরার সময় তিনি আল-কুদসের মুসলমানদেরকে কয়েকটি কথা বলেন। কথাগুলো দুনিয়াতে মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের পাথেয়। স্বাভাবিক কয়েকটি কথা, কিন্তু সেগুলোর মর্ম খুবই গভীর—

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহ ﷻ তোমাদেরকে প্রদত্ত তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন।

তোমাদেরকে এই ভূখণ্ড ফাতাহ করে দিয়েছেন। তোমাদেরকে এর মালিক বানিয়েছেন। কেননা, রসুল ﷺ আহযাব যুদ্ধের সময় শাম বিজয়ের সুংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন, আমরা আগে বলে এসেছি।

তোমাদেরকে ওয়াদা পূরণ করে দিয়েছেন। শত্রুদের উপর তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। তোমাদেরকে এসব দেশের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। এই অঞ্চলে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। তোমাদের পক্ষ থেকে এর বিনিময় যেন শোকর ভিন্ন অন্যকিছু না হয়। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকো। কেননা, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিয়ামত অস্বীকার। যখনই কোনো কওম আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছে এবং সাথে সাথে তাওবা করেনি, তখনই তাদের মান-সম্মান কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ শত্রুদেরকে তাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন।

একথার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাতে এমন ধারণা তাদের না হয় যে, তারা সংখ্যা, প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বস্তুগত সামর্থ্য বা হাতিয়ারের জোরে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি তাদেরকে অবগত করেন যে, তোমরা বিজয়ী হয়েছ, কারণ তোমরা আল্লাহ ﷻ-এর সঙ্গে ছিলে। কোনোদিন যদি তোমরা গুনাহে লিপ্ত হও, তা হলে তোমাদের সম্মান ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমাদের সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

এ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এক বার্তা, যা আমীরুল মুমিনীন উমার ফারুক ﵁ তাঁর সমকালীন প্রজন্ম, আমাদের প্রজন্ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের সামনে পেশ করে গেছেন।

এভাবেই পুরো ফিলিস্তিন বিজিত হয়। তবে একটি শহর তখনও বাকি থাকে। সেটা হল ভূমধ্য সাগরের উপকূলে অবস্থিত কায়সারিয়া শহর। ফিলিস্তিনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। মুসলমানরা এটা জয় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শহরটি ছিল সুরক্ষিত এবং ভূমধ্য সাগর হয়ে তাতে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য আসত। আর এটা ছিল ফিলিস্তিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। আল-কুদস জয় করার কিছু দিন পর এটা ফাতাহ হয়।

১৮ হিজরী মুতাবিক ৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এটা ফিলিস্তিন ও তার আশপাশের শামীয় অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। শামের ইতিহাসে যা আমওয়াস মহামারী হিসাবে খ্যাত। এ ছিল একটি ভয়ঙ্কর সংক্রামক মহামারী। ফিলিস্তিনের ছোট্ট এক ভূখণ্ড আমওয়াসে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। আমওয়াস শহর ছিল আল-কুদসের পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত। ইসলামী লশকরেও এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। খুব কম সময়ে বহু মানুষ মারা যায়। এক বছরেরও কম

সময়ে পনেরো হাজার থেকে আঠারো হাজারের অধিক মানুষ এ মহামারীতে মারা যায়। এ সময়টি ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই দুর্বিষহ। তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, এ মহান বিজয় আবার হাতছাড়া হয়ে যায় কিনা! কিন্তু আল্লাহ ﷻ মুসলমানদের রক্ষা করেন। তাদের সাহায্য করেন। ফলে সংকটকাল কেটে যায়। তবে এ কঠিন মহামারীতে মুসলমানরা আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ, মুআয ইবনু জাবাল, শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ, নবীজী ﷺ-এর চাচাত ভাই ফযল ইবনু আব্বাস, সুহাইল ইবনু আমর এবং আবু জাহলের ভাই হারেস ইবনু হিশাম ﵃-সহ অনেক মহান সাহাবীকে হারান।

হারিস ইবনু হিশাম ﵁ মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি ইসলামী বিজয়ের জিহাদে অংশ নেন। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিবারের ৭০ জন সদস্যসহ তিনি মক্কা মুকাররামা থেকে এসেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ৬৬ জনই এ মহামারীতে মারা যান।

এ মহামারী ছিল খুবই দুঃখজনক। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﵁-ও ১৮ বা ১৯ জন সন্তান হারান। মুসলমানদের জন্য এ মহামারী ছিল খুবই ভয়াবহ।

একপর্যায়ে আল্লাহ ﷻ নিরাপদ পরিবেশ ফিরিয়ে আনেন এবং এই ভয়ঙ্কর সংকট কেটে যায়।

মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ ফিলিস্তিনে

হিজরী ১৯ সালে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও মুসলমানরা এই ভূখণ্ডে ফাতাহকৃত সবগুলো অঞ্চল হেফাযত করেন। এরপর আল্লাহর অনুগ্রহে কায়সারিয়াও ফাতাহ হয়। দীর্ঘ অবরোধের পর মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ শহরটি জয় করেন। অবশ্য অবরোধের সূচনা করেছিলেন তাঁর ভাই ইয়াযিদ ইবনু আবু সুফইয়ান ﷺ। তবে নিনি ফাতাহ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। মুয়াবিয়াহ ﷺ তা সম্পন্ন করেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় এ সংবাদ পৌঁছলে মুসলমানরা যারপরনাই খুশি হন। কায়সারিয়া বিজয়ের কৃতজ্ঞতা হিসাবে মুসলমানরা সারা রাত জেগে থেকে তাকবীর ধ্বনি করতে থাকেন। এ বিজয়ের মাধ্যমে পুরো ফিলিস্তিন ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তা ইসলামী সাম্রাজ্যই থাকবে। এটা আল্লাহর শরীয়ত এবং তাঁরই মনোনীত দীন। কখনও হয়তো ফিলিস্তিন দখলের শিকার হবে। জুলুম-নির্যাতনের শিকার হবে। কিন্তু ইসলামীই রবে। আল্লাহর কালিমায় কোনো পরিবর্তন নেই।

ফিলিস্তিনের এ বরকতময় ভূখণ্ড আরও বরকতময় ও সম্মানিত হয় অনেক সম্মানিত সাহাবীর রক্ত পান করে। আজনাদায়ন, বাইসান, আল-কুদস ও কায়সারিয়ার ময়দানে। বহু সাহাবী এখানে আগমন করেছিলেন। উমার ইবনু খাত্তাব, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফইয়ান, ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফইয়ান, শুরাহবীল ইবনু

হাসানাহ, আবু উবায়াদা ইবনু জাররাহ, মুআয ইবনু জাবাল, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ-সহ অগণিত সাহাবী ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড দর্শন করে তা মহিমান্বিত করেছেন।

এমনকি বহু সংখ্যক সম্মানিত সাহাবী ইসলামী বিজয়ের পর এখানে জীবন-যাপন করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উবাদাহ ইবনু সামিত, শাদ্দাদ ইবনু আউস, উসামা ইবনু যায়দ, ওয়াসিলাহ ইবনু আসকা, ফায়রুয দাইলামী ﷺ প্রমুখ। ফায়রুয দায়লামী সেই সকল মহান সাহাবীদের একজন, যারা ইয়ামানে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেছিলেন। দিহয়াহ কালবী ও আব্দুর রহমান ইবনু গানম ﷺ-ও সেখানে জীবন-যাপন করেন। আব্দুর ইবনু গানমকে ফকীহুশ শাম উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। আউস ইবনু সামিত বদরী, মাসউদ ইবনু আউস বদরী ﷺ-সহ বহু বদরী সাহাবীও এখানে জীবন-যাপন করেছেন। বহু মুহাজির সাহাবীও ছিলেন এঁদের মধ্যে। এটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের অন্যতম এক সৌভাগ্য যে, এখানে বসবাস করেছেন বহু বড় বড় সম্মানিত সাহাবী।

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মুসলমানদের প্রবেশের অল্প কিছুদিন পরেই ফিলিস্তিনবাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। এখানে আমি আপনাদের সামনে বিশিষ্ট ব্রিটিশ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারি (Montgomery)-এর একটি বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি History of Warfare গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি এ গ্রন্থে মানব ইতিহাসে অতিক্রান্ত যুদ্ধের চিত্রগুলো নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে আলোকপাতকালে তিনি বলেন, ইসলামী বিজয় এতটাই দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে, ইতোপূর্বে তা কখনও সম্ভব হয়নি। কেননা, তারা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তাদেরকে জনগণ দাসত্ব থেকে মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর কারণ হল, তারা ছিলেন মানবতা ও সভ্যতার ভূষণে-ভূষিত।

অর্থাৎ যে সব জাতি ইসলামী বিজয়কে স্বাগত জানাত, তারা আগ্রহের সাথে ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করত। মুসলমানদেরকে তারা তাদের উপর চেপে থাকা জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তিদাতা মনে করত। এজন্য

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের মূল অধিবাসীর সিংহভাগ তখন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। জেবুসাইট, কেনানী, ব্রেস্টসহ আরও অনেক জনগোষ্ঠীর লোক। যাদের কথা আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি। এরা দলে দলে আল্লাহর দীন ইসলামে প্রবেশ করে। এতে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী মূল জনগোষ্ঠীগুলো ইসলামী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯ হিজরী মুতাবিক ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড ইসলামী ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ফিলিস্তিন ও সমগ্র শাম ইসলামী শাসনাধীনে চলে আসে।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, শামের অঞ্চলসমূহের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ। ফিলিস্তিনও তাঁর শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিজরী ১৮ সনে আমওয়াস মহামারী দেখা দেয়। যাতে আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন এবং মুআয ইবনু জাবাল শাসনভার লাভ করেন। তিনিও এই মহামারীতে মারা যান। এরপর ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনিও মহামারীর শিকারে পরিণত হন। এ সবই ঘটে উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর যুগে। এরপর মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ শাম (ফিলিস্তিন, লেবানন, জর্ডান ও সিরিয়া)-এর গভর্নর মনোনীত হন। উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন।

এরপর উসমান ইবনু আফফান ﷺ মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি তাঁর ১২ বছরের (২৩-৩৫ হিজরী, ৬৪৪-৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ) পুরো শাসনকালে মুয়াবিয়াহ ﷺ-কে শামের গভর্নর পদে বহাল রাখেন। উসমান ইবনু আফফানের এ দীর্ঘ সময়ে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফয়ানের অধীনস্ত শাম ও ফিলিস্তিনে কোনো ফেতনা দেখা দেয়নি।

তবে উসমান ﷺ-এর খেলাফতের শেষের দিকে ফেতনার সূচনা হয়। মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর বাড়ি অবরোধ করা হয়। ৩৫ হিজরী মুতাবিক ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারায় মজলুম অবস্থায় তাঁকে শহীদ করা হয়। এসব ফেতনা চলাকালে মদীনা মুনাওরায় সংঘটিত এই ফেতনায় শাম ও ফিলিস্তনের কোনো ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেনি। ফেতনায়

অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লোকই এসেছিল ইরাক, মিসর ও ইয়ামান থেকে।

মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ-এর নেতৃত্বে শাম ও ফিলিস্তিনের মানুষ সীমাহীন নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্থীতিশীলতার সাথে জীবন-যাপন করতে থাকে। তিনি ছিলেন মুসলিম ইতিহাসে প্রজাহিতৈষী অন্যতম এক মহান রাজনৈতিক ব্যক্তি। যখন মানুষ তাঁকে তাঁর রাজনীতির সৌন্দর্য নিয়ে প্রশ্ন করত, তখন তিনি বলতেন—

> আমার ও জনতার মধ্যে একটি সুতা রয়েছে। যখন তারা সেটা টান দেয়, আমি তখন ঢিল দিই। আর যখন তারা ঢিল দেয়, তখন আমি টান দিই।

আজও তাঁর এই কথা প্রবাদহিসাবে মানুষের মুখে মুখে 'মুয়াবিয়াহর সুতা' শিরোনামে উচ্চারিত হয়। জনতার পরিবেশ-পরস্থিতি যেমনই হোক না কেন, মুআবিয়াহ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

ঘটনাপ্রবাহ এভাবেই এগিয়ে চলতে থাকে। উসমান ﷺ-এর পর আলী ইবনু আবি তালিব ﷺ খলিফা নির্বাচিত হন। এরপর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বহু সমস্যা দেখা দেয়। সংঘটিত হয় জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং খারেজীদের লড়াই। এভাবে ৫ বছর মুসলিম উম্মাহর উপর দিয়ে বয়ে যায় ভয়াবহ ফেতনা।

কিন্তু আমরা এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই, তা হল পাঁচ বছরের এই সময়ে ফিলিস্তিন ও শামের ভূখণ্ড অভ্যন্তরীণ কোনো দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেনি। আমরা জানি যে, মুয়াবিয়াহর লশকর ও আলী ইবনু আবি তালিব ﷺ-এর লশকরের মধ্যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। দুই বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয় সিফফিন যুদ্ধ। আরও কিছু যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হলেও সেগুলো থেমে গিয়েছিল।

এই সব ঘটনাপ্রবাহের সময় ফিলিস্তিন ও শামের জনগোষ্ঠী ছিল এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। তাদের গভর্নর মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ-এর অধীনে। এরপর খারেজীরা আলী ইবনু আবি তালিব ﷺ-কে শহীদ করে দেয়। হাসান ইবনু আলী ﷺ খলিফা মনোনীত

হন। ৪১ হিজরী মুতাবিক ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁-এর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অবসর নেন। এ বছরটি ইতিহাসের পাতায় ঐক্যের বছর হিসাবে খ্যাত। এর মাধ্যমে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁ সমস্ত মুসলমানের শাসক মনোনীত হন এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁-এর হাতে গোড়াপত্তন হয় উমাইয়া সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্য দীর্ঘ ৯২ বছর (৪১-১৩২ হিজরী/৬৬০-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) স্থায়ী হয়। এ বছরগুলো ছিল শামের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য মর্যাদা, উন্নতি ও অগ্রগতির সময়। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের জন্য। কেননা, উমাইয়া শাসকদের রাজধানী ছিল দামেশক। যা আল-কুদসের খুব কাছে অবস্থিত এবং আল-কুদসের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি উমাইয়া সাম্রাজ্যের সূচনা হয় মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ানের মাধ্যমে। এখানে আমরা এ মহান সাহাবীর বিষয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ইতিহাসের পাতায় যিনি বহু নির্যাতনের শিকার।

মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁ রসুলুল্লাহ ﷺ-এর একজন অন্যতম সাহাবী। প্রিয়নবী ﷺ সাহাবীদের বিষয়ে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁ অন্তর্ভুক্ত। যদি আমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে খরচ করে, তা হলে তা সাহাবীদের এক মুদ বা অর্ধ মুদের সমান হবে না। মুদ মানে হল, মুঠ ভর্তি। নবীজী ﷺ বলেন—

> আমার সাহাবীদের গালি দিয়ো না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তবুও সেটা তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদের সমতুল্য হবে না। [বুখারী : ৩৬৭৩]

মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁-এর মত কোনো সাহাবী যদি এক মুঠ বা আধা মুঠ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তা হলে তা আমাদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ খরচ করার চেয়েও উত্তম। কেন? কেননা,

তাদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের ভিত্তি। আমরা আগে লক্ষ্য করেছি কিভাবে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান শামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনিই কায়সারিয়া, আন্তাকিয়াসহ তুরস্কের দক্ষিণে বহু অঞ্চলে ইসলাম দাখিল করেন। সম্ভবত লেবাননেও তিনিই ইসলাম প্রবেশ করিয়েছিলেন।

এ সময়ে তিনিই মুসলমানদেরকে পরিচালনা করেছেন। ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করেছেন। আমি বলছি না যে, এক বছর বা দুই বছর। বরং খেলাফতে রাশেদার যুগে দীর্ঘ ২০ বছর এবং নিজের শাসন আমলে আরও ২০ বছর। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন চল্লিশ বছর তিনি শামের গভর্নর অথবা শাসক ছিলেন। এ সময়ে তিনি সমগ্র শাম ও ফিলিস্তিনে ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করেন।

শুধু এটুকুই তো যথেষ্ট যে, উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ তাকে শামের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এক বারের জন্যও তাকে তিনি অপসারণ করেননি। অথচ উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ অধিকহারে গভর্নর পরিবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারও নেতৃত্বে বা কর্তব্যে সন্দেহ হলেই তিনি তাকে অপসারণ করতেন। চাই গভর্নর বিশিষ্ট সাহাবীই হোন না কেন! আমরা ভুলে যাইনি যে, আগে তিনি আবু মুসা আশআরী, আলা ইবনু হাযরামী, আম্মার ইবনু ইয়াসির ﵁ প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবীকেও অপসারণ করেছিলেন। এমনকি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﵁-কেও বরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু এসব বড় সাহাবীকে অপসারণ করলেও তিনি পুরো শাসনামলে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ানকে এক বারের জন্যও অপসারণ করেননি।

উমাইয়া সাম্রাজ্যও ইতিহাসের পাতায় বহু জুলুমের শিকার। যেখানে এ সাম্রাজ্যের সূচনাকারী বিশিষ্ট সাহাবীই জুলুমের শিকার, সেখানে উমাইয়া সাম্রাজ্যের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। আমরা আগেই বলেছি, উমাইয়া সাম্রাজ্য ৯২ বছর স্থায়ী হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে ১৪ জন খলিফা এ সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন, মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﵁, আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও তাঁর চার সন্তান তথা ওয়ালীদ, সুলাইমান,

ইয়াযিদ ও হিশাম। উমাইয়া সাম্রাজ্যের সর্বাধিক নন্দিত ও প্রসিদ্ধ খলিফা হলেন উমার ইবনু আব্দুল আযীয ﷺ।

আমি একথা বলতে পছন্দ করি না যে, উমার ইবনু আব্দুল আযীয ইসলামী ইতিহাসের পঞ্চম খলিফা। যেমনটা লোকমুখে ও বই-পুস্তকে প্রসিদ্ধ। আমার মতে পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ হলেন হাসান ইবনু আলী ﷺ। যাঁর পরে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক আলেম মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব উমার ইবনু আব্দুল আযীয ﷺ-এর চেয়ে বেশি মনে করেন। আমিও তাঁদের সমর্থন করি। কেননা, তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। যাঁকে স্বয়ং রসুল ﷺ লিখনের দায়িত্ব সোপর্দ করেছিলেন। তিনি নবীজী ﷺ-এর চিঠি-পত্র লিখতেন। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ওহীও লিখতেন। পুরো শাম অঞ্চলে তিনি ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে আমরা উল্লেখ করতে চাই, উমার ইবনু আব্দুল আযীয যেসব মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেগুলো ছিল ওইসব অঞ্চলে, যেখানে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান ও তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সাহাবী ইসলামের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন।

যাই হোক, উমাইয়া শাসনামলে ফিলিস্তিনের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্রতা ও মর্যাদা এবং সেই সাথে উমাইয়া খেলাফতের রাজধানী দামেশকের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড নিয়ে এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ যুগের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ৬৫ হিজরী সনে আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করেন। এ নির্মাণ কাজে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কুব্বাতুস সাখরার নির্মাণও তিনিই শুরু করেন। তাঁর পরবর্তী শাসক খলিফা ওয়ালীদ ইবনু আব্দুল মালিক এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এ নির্মাণ ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। খলিফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং পরবর্তীতে ওয়ালীদ ইবনু আব্দুল মালিক মিসর থেকে প্রাপ্ত সাত বছরের খারাজ ও অন্যান্য অর্থ মসজিদে আকসা ও কুববাতুস সাখরার নির্মাণ কাজে নির্ধারণ করে

দেন। মসজিদে আকসা ও কুববাতুস সাখরার মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আমরা ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই আলোচনা করব। উমাইয়া শাসক ওয়ালীদ ইবনু আব্দুল মালিক এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তাঁর শাসনামল ছিল ৮৬ হিজরী থেকে ৯৬ হিজরী পর্যন্ত।

কুববা হল সেই স্থাপনা যা সাখরার উপর নির্মান করা হয়। এটা নির্মিত হয় সাখরার স্থান নির্ধারণ করার জন্য। এই স্থাপনা ছিল খুবই চাকচিক্যময়। এ স্থাপনাটি স্বর্ণগম্বুজ বা সোনালি রঙের গম্বুজ নামে প্রসিদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে বহুবার এ গম্মুজটি খাটি স্বর্ণ দিয়ে লেপন করা হয়েছে। এ স্থাপনার সীমাহীন সৌন্দর্য অনেক মুসলমানের দৃষ্টি মসজিদে আকসার চেয়েও বেশি আকর্ষণ করে।

এখানে আমি একটি বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সাহাবা, তাবেঈন ও আলেমগণ সাখরার (পাথরের) স্থানটিকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের অন্য জায়গার মতই একে মনে করতেন। এটা মসজিদে আকসার অংশ নয়, যার রয়েছে সীমাহীন গুরুত্ব ও বিশেষ মর্যাদা। মসজিদে আকসায় সালাত আদায়ে পাঁচশত গুণ বেশি সওয়াব হয়। মসজিদে আকসার জন্য হাদিয়া প্রদান অগ্রগণ্য, যেমন নবীজী বলেছেন। ইসরাও ছিল মসজিদে আকসাতেই। ফিলিস্তিনের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও তার বিশেষ মর্যাদা সবই মসজিদে আকসাকে কেন্দ্র করে। কুব্বাতুস সাখরা মসজিদের জন্য নয়। কিন্তু অনেক দিন থেকে দেখা যাচ্ছে ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে মসজিদে আকসার চেয়ে কুব্বাতুস সাখরার গুরুত্বই বেশি। এতে রয়েছে বড় ধরণের বিপদের আশংকা–

প্রথমত : আশংকা অনুসরণের ক্ষেত্রে। কেননা, আমরা সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণ করছি না। অথচ তাঁরাই কল্যাণের আধার ও হেদায়েতের বাতিঘর। আমরা এমন জায়গা নিয়ে মেতে উঠেছি, অন্যান্য জায়গার উপর যার অধিক গুরুত্ব থাকার দলিল শরীয়তে নেই।

দ্বিতীয়ত : এতে কালের বিবর্তণে অনেক মুসলমান হয়তো ধারণা করে বসবে যে, কুব্বাতুস সাখরাই মসজিদে আকসা। এ স্থানকেই তারা সম্মান করতে শুরু করবে। কোনো দিন যদি ইহুদীরা বা মুসলিম

উম্মাহর অন্য কোনো দুশমন কুব্বাতুস সাখরা রেখে মসজিদে আকসা ধ্বংস করে ফেলে, তা হলে মুসলমানরা মনে করবে এতে কোনো সমস্যা নেই। তাই ছবি, কার্ড ও প্রচারপত্রে মসজিদে আকসা ছড়িয়ে থাকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কখনও এমনও দেখা গেছে যে, ফিলিস্তিনের শাসকও তার পিছনে কুব্বাতুস সাখরার ছবি টানিয়ে রেখেছেন; মসজিদে আকসার নয়। এটা নিতান্তই ভুল। মুসলমানদেরকে এবং মহান দীনের ধারক-বাহকদেরকে সংশয়ে ফেলার নামান্তর। অথচ পুরো ফিলিস্তিন এবং বিশেষত মসজিদে আকসা জীবনের বিনিময়ে হলেও হেফাযত করা এদের কর্তব্য। তাই এ বিষয়ে সতর্কতা জরুরী।

উমাইয়া শাসনামলে ফিলিস্তিনের মাটি অনেক আলেমের পদচারণা পেয়ে ধন্য হয়, যারা উমাইয়া শাসনকালে জীবিত ছিলেন। এই সময়ে ফিলিস্তিনে যেসব আলেম বাস করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রজা ইবনু হাইওয়াহ আল-কিন্দী। তিনি উচ্চস্তরের একজন তাবেয়ী। উমার ইবনু আব্দুল আযীযকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার জন্য সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালিককে পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। অথচ উমার ইবনু আব্দুল আযীয অলী-আহাদ ছিলেন না। এটা রজা ইবনু হাইওয়াহর অবিস্মরণীয় কাজ।

অনেক তাবেঈ রয়েছেন, যারা দীর্ঘকাল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাস করেছিলেন। কেউ কেউ এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মালিক ইবনু দিনার, আওযায়ী, সুফইয়ান সাওরী, ইবনু শিহাব যুহরী প্রমুখ বিশ্ব নন্দিত মনীষীগণ।

৯৬ হিজরী থেকে ৯৯ হিজরী পর্যন্ত ছিল সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালিকের শাসনামল। তিনি গুরুত্বপূর্ণ একজন উমাইয়া খলিফা। ৯৭ হিজরী মুতাবিক ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রামাল্লা শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্যতম কীর্তি।

১৩২ হিজরী মুতাবিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং আব্বাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা সকলেই জানি যে,

আব্বাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিরাট রক্তপাতের মাধ্যমে। উমাইয়া সাম্রাজ্যের বহু আমীর এতে নিহত হন। তাদের অন্যতম হলেন শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ। তাকে মিসরের বুলওয়ানে হত্যা করা হয়। এতে উমাইয়া যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং আব্বাসী যুগের সূচনা হয়।

আব্বাসী খেলাফত দীর্ঘকাল মুসলমানদের শাসনভার বহন করে। প্রায় পাঁচ শতাব্দী। ১৩২ থেকে ৬৫৬ হিজরী, ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দীর্ঘ ৫২৪ বছর। উমাইয়া খেলাফতের তুলনায় আব্বাসী খেলাফতের আয়ু ছিল অনেক গুণ বেশি।

আব্বাসী খেলাফতের ছিল বহু স্তর। যেমন, উন্নতি ও অগ্রগতি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইসলামী বিশ্বের বহু ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য ইত্যাদি।

কিন্তু একই সময়ে আব্বাসী সাম্রাজ্যের অনেক শাসককেই আমরা পাই শরীয়ত ও দীন থেকে অনেক দূরে। মদপান, দাসী নিয়ে অতিরিক্ত অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ ও ধন-সম্পদের অপচয়সহ অনেক অপকর্মে লিপ্ত। তা হলে কীভাবে এ সাম্রাজ্য দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর উপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারে?

কীভাবে কিছু খলিফার জীবন-যাপনের ইতিহাস এতটা আপত্তিকর হতে পারে, যা আমরা একজন সাধারণ মুসলমানের বেলায় মানতে পারি না, মুসলমানদের শাসনকারী কোনো খলিফা তো দূরের কথা?

এ ধাঁধাঁ বুঝতে হলে আমাদেরকে আব্বাসী খেলাফতকে মৌলিক দুটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে।

এক ধাপের নাম দিব শক্তিমত্তার যুগ। এটা আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম ধাপ। এই ধাপ ১৩২ হিজরী থেকে ২৪৭ হিজরী পর্যন্ত ধারাবাহিক ১১৫ বছর। এরপর আসে আব্বাসী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ধাপ। যা ২৭৪ থেকে ৬৫৫ হিজরী পর্যন্ত মোট ৪০৯ বছর দীর্ঘ।

প্রথম ধাপ আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ সময়কাল। প্রথম ধাপে শাসক ছিলেন আবু জাফর মানসুর, হারুনুর রশীদ, মুতাসিম, মামুন প্রমুখ।

আব্বাসী সাম্রাজ্যের এই ধাপে চতুর্দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আব্বাসী সাম্রাজ্য উমাইয়া সাম্রাজ্যের সিংহভাগ অঞ্চলই করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়। একদিকে আলজেরিয়া-মরক্কো অপর দিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য তারা শাসন করেন। এ ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য।

শাসনের কেন্দ্র ছিল বাগদাদ। এসব অঞ্চলের সিংহভাগই আব্বাসী সাম্রাজ্যের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। আব্বাসী খেলাফতের অনুগত অন্যতম একটি অঞ্চল ছিল ফিলিস্তিন।

ফিলিস্তিন স্বাভাবিকভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসন থেকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে চলে আসে। এ সময় ফিলিস্তিনে কোনো প্রকার সংকট দেখা দেয়নি। অথচ আশঙ্কা ছিল যে, ফিলিস্তিন বা শামে কোনো বিপ্লব ঘটে যাবে। কেননা, তারা ছিল উমাইয়াদের খুব অনুগত। আজও এ অঞ্চলের মানুষ উমাইয়া সাম্রাজ্যের গুণমুগ্ধ। জনগণের সাথে উমাইয়া সাম্রাজ্যের সুরাজনীতি এর অন্যতম কারণ। বিশেষ করে শামবাসীদের সাথে।

এখানে আমি আবার উল্লেখ করব যে, উমাইয়া সাম্রাজ্য হচ্ছে সেই সাম্রাজ্য, যাতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল ইলম, দাওয়াত ও ইসলামী বিজয়াভিযান। সে সময় স্পেন (আন্দালুস) ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনকি হিন্দুস্তানও। বহু তাবেয়ী এই শাসন-আমলে জীবিত ছিলেন। তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে থাকে জিহাদের আমল। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন বাহিনী গ্রীষ্মকালে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হত। আর শীতকালীন বাহিনী বের হত শীতকালে। এজন্য মানুষ উমাইয়া সাম্রাজ্যকে খুব ভালোবাসত। উমাইয়া সাম্রাজ্যের কোনো শাসক যদি এ যুগে আসত, তা হলে ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাকে মানুষ পূণ্যাত্মা মনে করত।

তবে আমরা তাদেরকে ফেরেশতা বা মাসুম মনে করি না। অবশ্যই তাদেরও অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল। তবে তারা বর্তমান যুগের এবং অন্যান্য যুগের মুসলিম শাসকদের চেয়ে যথেষ্ট উত্তম ও ভালো ছিলেন। যদি আমাদের এমন কোনো সাম্রাজ্য হয়, যা উমাইয়া

সাম্রাজ্যের মত পরিধি শাসন করে, তা হলে আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, সেই সাম্রাজ্য পুরা দুনিয়া শাসন করবে।

এ সাম্রাজ্যের প্রতি মানুষের এত ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তার পতনের পর ফিলিস্তিন বা শামে কোনো প্রতিবাদ সংঘটিত হয়নি। এর কারণ হয়তো প্রথম দিকের আব্বাসী খলিফাদের বিরাট প্রতিপত্তি এবং ভয়াবহ রক্তপাত। অবশ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে এ রক্তপাতের কোনো বৈধতা ছিল না। আর আমরা আগেই যেমন বলেছি, ফিলিস্তিন নীরবে উমাইয়া শাসন থেকে আব্বাসী শাসনের অধীনে চলে যায়।

আব্বাসী শাসকরাও আল-কুদসসহ পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিতেন। কেননা, তা এক পবিত্র ও বরকতময় ভূখণ্ড। তবে তাদের গুরুত্ব উমাইয়া শাসকদের গুরুত্বের সমপর্যায়ের ছিল না। তারা ইরাকের ভূখণ্ডকে যতটা গুরুত্ব দিতেন, ততটুকু গুরুত্ব এ ভূখণ্ডের প্রতি দিতেন না। তারা খেলাফতের রাজধানী দমেশক থেকে বাগদাদে স্থানান্তর করেছিলেন। এজন্য খেলাফতের কেন্দ্র থেকে ফিলিস্তিন অনেক দূরে পড়ে গিয়েছিল। তবে এ ভূখণ্ডের গুরুত্ব সবসময় ছিল। আল-কুদস ও মসজিদে আকসার কারণে। এছাড়াও ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী ফিলিস্তিনী অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর। যেগুলো আব্বাসী সাম্রাজ্যের সীমান্ত বিবেচিত হত। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইয়াফা, হাইফা, আক্কা, কায়সারিয়া ও গাজা প্রভৃতি।

আসুন, দেখে নিই ২৪৭ হিজরীর পর আব্বাসী খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়লে ইসলামী বিশ্বে এর কী প্রভাব পড়ে?

তুলুন ও ইখশীদ যুগে ফিলিস্তিন

আগে আমরা উমাইয়া সাম্রাজ্যের আলোচনা করেছি। যা প্রায় ৯২ বছর মুসলিম উম্মাহকে শাসন করেছিল। আমরা উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ও আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়েও আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল বহু রক্তপাতের মাধ্যমে। তবে রক্তপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে অবস্থা একেবারে বদলে যায়। মহান এক সাম্রাজ্যরূপে দীর্ঘ সময় আব্বাসী সাম্রাজ্য ইসলামী বিশ্ব শাসন করে। আমরা এই শাসনামলকে দুটি মৌলিক ধাপে বিভক্ত করেছি। এক শক্তিমত্তার যুগ, যা ১১৫ বছর স্থায়ী হয়েছিল। দুই দুর্বলতার যুগ, যার মেয়াদ ছিল ৪০৯ বছর।

এই দীর্ঘ সময়ের ব্যাপারে আমি মন্তব্য করে বলতে চাই যে, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের প্রতি আব্বাসীদের গুরুত্ব ছিল অনেক। তবে তাদের গুরুত্ব উমাইয়াদের গুরুত্বের সমপর্যায়ের ছিল না। কেননা, তারা খেলাফতের কেন্দ্র দামেশক থেকে বহু দূরে বাগদাদে স্থাপন করেছিলেন। তবুও তারা এ ভূখণ্ডের যত্ন নিতেন। তারা শুধু ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আগত খ্রিস্টান তীর্থ যাত্রীদেরই সেবা করতেন না বরং তাদের স্থাবর সম্পদও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। উমারী চুক্তিনামা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সর্বাত্মক খেয়াল রাখতেন।

বিশিষ্ট আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশীদ ও ফ্রান্সের সম্রাট শার্লেমেন (শার্ল দ্য গ্রেট)-এর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিল। শার্লেমেন ছিলেন তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাদের পরস্পরের মধ্যে উপঢৌকন বিনিময়ও হত। ১৭৯ হিজরী, মুতাবিক ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে দুই সাম্রাজ্যের

মধ্যে একপ্রকারের সমঝোতা হয় এবং সেই সমঝোতার ভিত্তিতে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, সম্রাট শার্লেমেন ফ্রান্স থেকে অনেক ধন-সম্পদ আল-কুদসে পাঠাবেন। সেগুলো দিয়ে আল-কুদসে বিদ্যমান গীর্জাগুলো পুনঃনির্মাণ এবং সেগুলো সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হবে। বিশেষ করে কিয়ামাহ গীর্জা। এসব স্থাপনার জাঁকজমক বৃদ্ধি করার এই অনুমতি ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে একপ্রকার ধর্মীয় নমনীয়তা। এতে গীর্জাগুলো দুর্গে পরিণত হয়। যা ছিল খুবই বিপদজনক। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ক্রুসেডারদের আগমনের পর এ গীর্জাগুলো থেকে বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল ইউরোপ থেকে আল-কুদসে আগত খ্রিস্টান তীর্থ যাত্রীদের ইসলামী লশকরের মাধ্যমে সামরিক নিরাপত্তা প্রদান। উপকূলে নামার পর থেকে আল-কুদসে পৌঁছা পর্যন্ত, আল-কুদস থেকে আবার উপকূলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা তাদের দেশের উদ্দেশে রওয়ানা না হয়। এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে তীর্থ যাত্রীদের কোনো ধরণের সমস্যা না হয়।

আব্বাসী খেলাফতের শক্তিমত্তার যুগ ছিল ১১৫ বছর। ২৪৭ হিজরীতে আব্বাসী খলিফা মুতাওয়াক্কিল নিহত হন। তিনি ছিলেন শক্তিমত্তার যুগের সর্বশেষ খলিফা। এরপর শুরু হয় দুর্বলতার যুগ। এ যুগে বিভিন্ন প্রকার শক্তি আব্বাসী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আব্বাসী সাম্রাজ্য নামমাত্র টিকে থাকে। পর্দার আড়াল থেকে এবং কখনও কখনও সামনে থেকেই বিভিন্ন শক্তি সাম্রাজ্যের কলকাঠি নাড়ত। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল তুর্কী সামরিক ব্যক্তিরা। বুয়াই শিয়ারাও দীর্ঘকাল আব্বাসী সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। আবার কখনও আধিপত্য বিস্তার করেছে সালজুকরা।

এই দীর্ঘ ৪০৯ বছর আব্বাসী সাম্রাজ্য শুধু নামে বিদ্যমান ছিল। ইসলামী ভূখণ্ডগুলোর উপর এর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এমনকি খোদ ইরাকের উপরও ছিল না। খেলাফতের কেন্দ্র বাগদাদও ছিল এর আধিপত্যমুক্ত। এমনকি মুসলমানদের খলিফা ও আব্বাসী সাম্রাজ্যের সঞ্চালক যে

প্রাসাদে বসবাস করতেন, সেই প্রাসাদেও তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মুসলিম উম্মাহর কোনো কাজ এ যুগের আব্বাসী খলিফারা তাদের নিজেদের দিকে সম্বন্ধ করার অধিকার রাখত না। যেমন বর্তমান ইংল্যান্ডের রাণীর অবস্থা। তার আনুষ্ঠানিক নামই শুধু ইংল্যান্ডের রাণী। তবে রাজ্য সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে তার কোনো মতাধিকার নেই। পুরো শাসনভারই প্রধানমন্ত্রীর করায়ত্বে। দ্বিতীয় ধাপের আব্বাসী সাম্রাজ্যের অবস্থাও এমন হয়ে পড়েছিল। তাই মুসলমানদের জীবন, তাদের ইতিহাস এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের ইতিহাস এসব আব্বাসী শাসকের নামে রচনা করা সমীচীন নয়। এই ভুল ইতিহাসের সিংহভাগ বই-পুস্তকে বিদ্যমান। বহু গ্রন্থে এ যুগের ইতিহাস ওইসব নামসর্বস্ব খলিফাদের তালিকা অনুসারেই বিন্যস্ত করা হয়েছে।

খলিফা কখনও পাগল, ফাসেক এবং সময় ও সম্পদের অপচয়কারীও হত। অথচ আমরা এমন মানুষের নামে জাতির পূর্ণ ইতিহাস সম্পৃক্ত করি! আমরা ভুলে যাই যে, এ আব্বাসী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই মুসলিম উম্মাহর বহু বীর মুজাহিদ, আদর্শবান আমীর ও শাসক বিদ্যমান ছিল। ইতিহাস যাদের নাম ও অবদান কখনও ভুলতে পারবে না। যেমন, এই দুর্বল যুগেই ছিলেন নুরুদ্দীন মাহমুদ শহীদ, ইমাদুদ্দীন জঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, আলপ আরসালান এবং ইউসুফ ইবনু তাশফীন প্রমুখ। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এ নামগুলো খুবই মহিমান্বিত। তারা সেই যুগেরই ব্যক্তিত্ব, যাকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার যুগ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইতিহাস নতুন করে সংকলন করা প্রয়োজন। যেখানে ভাস্বর হয়ে থাকবে আমাদের ইতিহাসের শক্তির ক্ষেত্রগুলো; শুধু দুর্বলতার যুগের আব্বাসী খেলাফতের আবকাঠামো নয়।

২৪৭ হিজরী, মুতাবিক ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে যখন আব্বাসী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তুর্কী সামরিক ব্যক্তিরা শাসনকার্যে আধিপত্য বিস্তার করে। এ ছিল জবরদস্তিমূলক সামরিক শাসন। তৎকালীন বাগদাদ ও ইরাকসহ আব্বাসী সাম্রাজ্যের শাসনাধীন বহু অঞ্চলেই চলতে থাকে মুসলমানদের উপর সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন। এই সামরিক নিপীড়ন কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার বেলায়ই প্রকাশ পায়।

এতে আব্বাসী সাম্রাজ্যের অধীনস্ত অনেক অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। এমন হওয়ারই কথা ছিল, কারণ সামরিক ব্যক্তিরা শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালন করতেন না। তাদের থেকে অনেক শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পেতে থাকে। আব্বাসী খেলাফতের কেন্দ্র বাগদাদে বয়ে যেতে থাকে মাদকদ্রব্যের সয়লাব। শুরু হয় জুলুম-নির্যাতন, ফেতনা-ফাসাদ, ঘুষ, স্বেচ্ছাচারিতা, গান-বাজনা ও নৃত্যের মহড়া। অনেক বিষয়ই ইসলামী অনুশাসনের সীমা অতিক্রম করে। এর ফলে বহু আঞ্চলিক শাসক আব্বাসী সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়, যা মায়ের মত মুসলমানদেরকে একত্র করে রেখেছিল। আব্বাসী খেলাফত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া প্রথম দিকের একজন আমীর হলেন মিসরের শাসক আহমাদ ইবনু তুলুন। এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনও চলে আসে তার অধীনে। যার আলোচনা সামনে আসছে।

আহমাদ ইবনু তুলুন ছিলেন আব্বাসী সাম্রাজ্য কর্তৃক নিয়োজিত মিসরের গভর্নর। তিনি তাকওয়া, পরহেযাগারী ও জিহাদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। মিসরের প্রশাসন, সংস্কৃতি, শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান আছে। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন একজন যোগ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি যখন তুর্কী আধিপত্যের কাছে আব্বাসী শাসনের পতন প্রত্যক্ষ করেন এবং দেখতে পান যে, আব্বাসী খলিফা নামসর্বস্ব মূল্যহীন, তখন তিনি মিসর নিয়ে আব্বাসী শাসন থেকে বেরিয়ে যান। তিনি আব্বাসী শাসন থেকে বের হওয়া প্রথম আমীর। ২৫৪ হিজরী, মুতাবিক ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটে এই ঘটনা। আব্বাসী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার প্রায় সাত বছর পর।

আহমাদ ইবনু তুলুন আব্বাসী ছিলেন না। এমনকি আরবও না। তার পিতা তুলুন ছিলেন বুখারা শহরে বসবাসকারী একজন তুর্কী। তৎকালীন বুখারার আমীর নুহ ইবনু সামান তাকে অর্থাৎ আহমাদের পিতা তুলুনকে হাদিয়া হিসাবে মামুনুর রশীদের কাছে প্রেরণ করেন। মামুন ছিলেন শক্তিমত্তার যুগে আব্বাসী সাম্রাজ্যের খলিফা।

প্রথমে আহমাদ ইবনু তুলুন আব্বাসী সাম্রাজ্য থেকে কোনো ঘোষণা না দিয়ে পৃথক হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দেন। তখন তাঁর এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের শাসকশক্তি তুর্কী

বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। ওইসব যুদ্ধের ফল ছিল এই যে, আহমাদ ইবনু তুলুন তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে ফিলিস্তিন ও শাম পৌঁছেন। আব্বাসী সাম্রাজ্যের এসব অঞ্চলে যুদ্ধ করে এগুলোর উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে ২৬৪ হিজরী মুতাবিক ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন তুলুনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মিসরে তুলুনী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পর এ ঘটনা ঘটে। এতে তুলুনী সাম্রাজ্যের অধীনে শুরু হয় ফিলিস্তিনের ইতিহাসের নতুন এক ধাপ, যা ৩২১ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৭ বছর স্থায়ী হয়। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এ শাসনামলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

আমরা আগেই যেমন উল্লেখ করেছি যে, আহমাদ ইবনু তুলুন তাকওয়া, পরহেযগারী ও মসজিদপ্রেমে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের পবিত্রতা ও মর্যাদা বিবেচনা করে তিনি এ ভূখণ্ডের প্রতি অনেক গুরুত্ব দেন। ফিলিস্তিনে এবং বিশেষত আল-কুদসে তিনি খ্রিস্টানদের জন্য বিশাল জায়গা ছেড়ে দেন। ইউরোপ থেকে আগমনকারী তীর্থযাত্রীদেরও তিনি যথেষ্ট যত্ন নিতেন। এখানে আমি আপনাদের উদ্দেশে আমেরিকান ইতিহাসবিদ থম্পসোন (Thomas L. Thompson)-এর একটি চিঠি তুলে ধরছি, যা তিনি নিজের গ্রন্থ Economic And Social History Of The Middle Ages-এ উল্লেখ করেছেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি আমেরিকান একজন খ্রিস্টান ইতিহাসবিদের সাক্ষ্য। তুলুনী সাম্রাজ্যের অধীনে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ফিলিস্তিনের ঘটনা প্রবাহের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি তার গ্রন্থে একটি চিঠি তুলে ধরেছেন। যা আল-কুদসের পাদ্রী থিওড্রোস (Theodoros) তৎকালীন কনস্টানটিনোপলের পাদ্রীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। ঘটনা ছিল ২৫৫ হিজরী মুতাবিক ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের। সে চিঠিতে আল-কুদসের পাদ্রী বলেন, নিঃসন্দেহে মুসলমানরা ন্যায়পরায়ণ জাতি। আমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট ও কঠোরতার সম্মুখীন হচ্ছি না।

আমি এই বার্তা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উদ্দেশে উদ্ধৃত করছি। আমি তাদের উদ্দেশে বলছি, ক্রুসেড যুদ্ধের সমস্ত অযুহাত ও অভিযোগ

মিথ্যা। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কঠোরতার দাবি ছিল নিতান্ত ভিত্তিহীন।

আল-কুদসের পাদ্রী অন্যদের মত কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তার চিঠি ছিল কনস্টান্টিনোপলের পাদ্রীর উদ্দেশে প্রেরিত। কোনো প্রকার তোষামোদ বা আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের উদ্দেশে পাঠানো হয়নি। তা ছিল একজন খ্রিস্টানের পক্ষ থেকে আরেকজন খ্রিস্টানের প্রতি। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, 'নিঃসন্দেহে মুসলমানরা ন্যায়পরায়ণ জাতি।'

তুলুনী রাজ্যের পতনের পর ৩২২ হিজরীতে মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদীর হাতে মিসরে আরেক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সেটা ছিল ইখশীদী সাম্রাজ্য। তিনি আরব ছিলেন না। ছিলেন তুর্কী বংশদ্ভুত। ৩২১ হিজরী থেকে ৩৫৯ হিজরী পর্যন্ত ৩৮ বছর মিসর শাসন করেন। যেহেতু তিনি তুলুনী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে মিসরের কর্তৃত্ব দখল করেন, এজন্য স্বাভাবিকভাবে ফিলিস্তিন ও শামও ইখশীদী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। ইখশীদী সাম্রাজ্যের এ যুগটিও ছিল আল-কুদস ও ফিলিস্তিনের জন্য উত্তম সময়। কারণ, এই সাম্রাজ্য ছিল তুলুনী সাম্রাজ্যের সহায়ক। উভয় আমলে শাসনের প্রকৃতি অভিন্ন ছিল। ইখশীদী সাম্রাজ্যের সুলতানরা ফিলিস্তিনের প্রতি, বিশেষত আল-কুদসের প্রতি এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, কোনো খলিফার ইন্তেকাল হলে তার মৃতদেহ দাফন করার জন্য আল-কুদসে নিয়ে যাওয়া হত। এ মহান ভূখণ্ডের সম্মানেই ছিল এ আয়োজন।

তবে এসময় বড় কিছু সমস্যাও ছিল। মসজিদে আকসা, কুব্বাতুস সাখরাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নিদর্শনের প্রতি দীনী গুরুত্ব থাকলেও এ অঞ্চলের যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষা ও দাওয়াতের গুরুত্বও ছিল না। ইখশীদীদের বেশিরভাগ মনোযোগ ছিল মিসরের ভূখণ্ডে। যা তুলুনী সাম্রাজ্য এবং পরবর্তীতে ইখশীদী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। ফুসতাত শহর ছিল তাদের রাজধানী। তখনও কায়রো শহর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আলেকজান্ডারিয়া ও দমইয়াত ছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় শক্তিশালী দুটি শহর। সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে

দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হত না। এমনই এক ভূখণ্ড ছিল ফিলিস্তিন। এতে সেখানে দুর্বলতা তৈরি হয়। তুলুনী সাম্রাজ্যের আমলে এ দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। কেননা, তা ছিল একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ৩৫৯ হিজরীতে ইখশীদী সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে এ দুর্বলতা পুরোপুরি ফুটে ওঠে। যা পরবর্তীতে অনেক বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি করে। যেগুলো সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসছে।

উবায়দিয়া (ফাতিমী) সাম্রাজ্য

আগে আমরা তুলুনী সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। তুলুনী ও ইখশীদীরা তাদের কেন্দ্র মিসরের ফুসতাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সামরিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ফিলিস্তিন দুর্বল হয়ে পড়ে। বাগদাদ ও ইরাক তখন ছিল বুওয়াই শিয়াদের আধিপত্যের শিকার। বুওয়াইরা এসেছিল পারস্যের ভূখণ্ড (বর্তমান ইরান) থেকে। তারা ছিল শিয়া ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারী। যা বর্তমান ইরানের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ। এ শিয়া মতাদর্শ তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রাচ্যে। পুরো ইরাক চলে যায় তাদের অধীনে।

সবচেয়ে বড় বিপদ হয়েছিল এই যে, ৩০০ হিজরী থেকে ৪০০ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ১০০ বছর পুরো ইসলামী বিশ্ব ছিল শিয়াদের নিয়ন্ত্রণে। ইরাক, ইরাকের আশ-পাশের অঞ্চলসমূহ এবং ইরান ছিল বুওয়াই শিয়াদের অধীনে। কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তানসহ প্রাচ্যের দেশগুলো ছিল সামানী শিয়াদের অধীনে। সামানীরাও ছিল ইসনা আশারিয়া শিয়া। মসুল অঞ্চল ও উত্তর সিরিয়া ছিল হামদানী শিয়াদের অধীনে। তারাও ছিল ইসনা আশারিয়া মতাবলম্বী। ইয়ামান অঞ্চল ছিল বনী যিয়াদ ও বনী রস-এর অধীনে। তারা ছিল যায়দিয়া শিয়া। এ দলটি অবশ্য সুন্নতের অনেকটা নিকটবর্তী ছিল। আরব উপদ্বীপ ছিল এমন একটি সম্প্রদায়ের অধীনে, ইতিহাসের পাতায় যারা অতিনিকৃষ্ট একটি সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত। তারা হল কারামাতী সম্প্রদায়। তারা শিয়া মতবাদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুফুরের এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, কোনো আলেমই তাদের কুফর সম্পর্কে দ্বিমত

পোষণ করেননি। তারা দীন একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। আরব উপদ্বীপে কারামাতীরা বহু অপকর্ম করে। বিশেষ করে হারাম শরীফে।

মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় বিপদহিসাবে দেখা দিয়েছিল উবায়দিয়া সাম্রাজ্য। যা ফাতিমী সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। ২৯৬ হিজরীতে মরক্কোতে এ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। শুরুতে তারা নবীদুহিতা ফাতেমা ﵂-এর বংশধর বলে দাবি করত। অধিকাংশ আলেমের মতে এটা একটা মিথ্যা দাবি। বরং তাদের সম্বন্ধ ছিল মায়মুন আল-কাদ্দাহ-এর সাথে। সে ছিল একজন ইহুদী। উবায়দুল্লাহ ফাতেমী (তার দাবি অনুসারে)-এর চতুর্থ পুরুষ ছিল একজন ইহুদী। সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করত। সে আরবও ছিল না; কুরাইশীও ছিল না। এ সাম্রাজ্য যেখানেই পৌঁছত, সেখানেই সুন্নতকে আঘাত করত। আহলুস সুন্নাহ থেকে তাদেরকে প্রথম প্রতিরোধে লিপ্ত হয় স্পেনের ইসলামী সাম্রাজ্য। তার নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুর রহমান নাসের উমাবী ﵀। ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম সেনাপতি। আব্দুর রহমান নাসেরের সাথে বহু নিকৃষ্ট লড়াইয়ের পর তারা স্পেনে উবায়দিয়া (ফাতিমী) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আব্দুর রহমান নাসেরকে আঘাত হানতে তারা উত্তর স্পেনে খ্রিস্টানদের সাথেও আঁতাত করেছিল। তারা বহু বেদআত ও গর্হিত কাজ এবং সাহাবীদেরকে গালি-গালাজে লিপ্ত হয়। এমনকি বাগদাদের বাজারে স্বয়ং রসুল ﷺ-কেও তারা প্রকাশ্যে গালা-গালি করত। যেমন উবাইদুল্লাহর ছেলে এবং পরবর্তী খলীফা এই কাজে লিপ্ত হয়েছিল। সে বলত, 'গুহা ও গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীকে অভিসম্পাত করো। তারা আরও বলত, 'তোমরা আয়েশা ও তার স্বামীকে অভিসম্পাত করো।' আর আয়েশার স্বামী তো ছিলেন স্বয়ং রসুল ﷺ। এমন ধৃষ্টতা চলত উন্মুক্ত বাজারে; লোক চক্ষুর আড়ালে নয়।

ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব ছিল দারুন। তারা শিয়াদের ইসমাঈলী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। ইসনা আশারিয়া শিয়ারা মুসা কাযেম ইবনে জাফর সাদেকের ইমামতের প্রবক্তা। তারা মুসা কাযেমকে সপ্তম ইমাম হিসাবে গণ্য করে। ইসনা আশারিয়া হচ্ছে ১২ ইমামের নেতৃত্বে।

আলী ইবনে আবি তালিব থেকে শুরু। হাসান, হুসাইন, যাইনুল আবেদীন... এভাবে শেষ পর্যন্ত। তাদের মতে সপ্তম ইমাম মুসা কাযেম। তবে উবায়দিয়া ফাতিমী (?) শিয়ারা মুসা কাযেমের ইমামতকে অস্বীকার করে। তার পরিবর্তে ইসমাঈল ইবনে জাফর সাদিককে তারা ইমাম মানে। এজন্য ইসমাঈল ইবনে জাফর সাদেকের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে ইসমাঈলিয়া বলা হয়। মূল বিকৃত শিয়া মতবাদের উপর তারা অনেক বিকৃতি সাধন করেছে। বহু জঘন্য বেদআত ও গর্হিত কাজে তারা লিপ্ত হয়। এমন পর্যায়ে যে, আলেমরা ইসমাঈলী শিয়াদেরকে পুরোপুরি ইসলাম থেকে খারিজ সাব্যস্ত করেছেন।

মরক্কোতে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তারা মিসর ও উত্তর আফ্রিকার ভূখণ্ডগুলো দখল করার পাঁয়তারা চালাতে থাকে। তবে তুলুনী ও ইখশীদী সাম্রাজ্য তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু ৩৫৯ হিজরীতে উবায়দীরা মিসর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। তাদের সেনাপতি জাওহার সিকিলী মিসর জয় করে। উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের শাসক তখন মুয়িয লি-দীনিল্লাহ। উবায়দী শাসকরা নিজেদেরকে খলিফা দাবি করত। অথচ তারা খলিফা ছিল না। এমনকি মুসলিমও ছিল না। তবুও তারা খেলাফতের দাবি করত। আমি বলব, তারা জোরপূর্বক মিসর দখল করেছিল। তুলুনী ও ইখশীদী সাম্রাজ্যের মত এটা স্বাভাবিক পরিবর্তন ছিল না।

ওদুটি ছিল সুস্পষ্ট ইসলামী সাম্রাজ্য। কিন্তু এটা ছিল অবৈধ জবরদখল। উবায়দী শিয়ারা মিসরে প্রবেশ করে সুন্নী আলেমদের হত্যায় মেতে ওঠে। বহু সংখ্যক আলেমকে তারা জবাই করে। ইসমাঈলী শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আল-আযহার জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে। আল-আযহারের সূচনায় তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। আযহার অত্যন্ত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে– মালেকী, হানাফী, হাম্বলী ও শাফেয়ী সুন্নী মতাদর্শ ধ্বংসকরণ– আবার ইসনা-আশারিয়া প্রতিষ্ঠাও নয়; বরং মিসরে ইসমাঈলী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। মিসরের জনগণের উপর তা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর এটা ছিল মারাত্মক বিপর্যয়, যা মুসলিম উম্মাহকে ছাপিয়ে ফেলেছিল।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, আমরা এই ইতিহাস জানি না। আমরা ফাতেমীদের ইতিহাস এই হিসাবে পড়ি যে, তারা মুসলমান ছিল এবং কিছুদিন মিসর শাসন করেছে। আমাদেরকে ফাতেমীদের ইতিহাসের যে দিকটি খুব বেশি মুগ্ধ করে, তা হল মিসর ও তাদের শাসনাধীন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের স্থাপনা ও নির্মাণ। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে জামে আল আযহার (মসজিদ) ও কায়রো শহর। এজন্য কায়রো শহর 'আল-মুয়িযের কায়রো' বলে পরিচিত। তিনি হচ্ছেন আমীর মুয়িয লি-দীনিল্লাহ ফাতেমী, যার আমলে কায়রো শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রো শহর নির্মিত হওয়ার একই সময়ে মাগরেবে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের পতন হয়। ফলে মিসরই উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং কায়রো হয়ে যায় উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর এভাবে মুসলিম বিশ্বে এই শহরের একধরণের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

উবায়দী সেনাবাহিনী মিসরীদের নিয়ে গঠিত ছিল না। বরং সব ছিল মাগরেব, সুদান ও আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লোক। এ বাহিনীকে তারা শিয়া ইসমাঈলী মতাদর্শের উপর গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মিসরী জনগোষ্ঠী তাদের এ আকিদা প্রত্যাখ্যান করে। সাহাবীদের গালি দেওয়া, তাদের সমালোচনা করা এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাওয়ায় মিসরীরা ইসমাঈলী আকিদা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে জনগণ ইসমাঈলী শিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে সুন্নী থেকে যায়। এ পরিস্থিতি বলবৎ থাকে প্রায় ২০০ বছর।

মিসর দখলের পরপরই তারা পরাজিত ইখশীদী সাম্রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের প্রতি লালায়িত হয়ে ওঠে। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল শামের অঞ্চল। আর শামের ভূখণ্ডের শুরু ছিল ফিলিস্তিন। ফলে উবায়দিয়া বাহিনী মিসর থেকে সরাসরি ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিসর দখলের বছরই তাদের হাতে ফিলিস্তিনেরও পতন ঘটে। এ ছিল ৩৫৯ হিজরী মুতাবিক ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ। উবায়দিয়া শিয়াদের ফিলিস্তিন দখলের মাধ্যমে ফিলিস্তিন তার ইতিহাসে অন্ধকার একটি যুগে প্রবেশ করে। যা তিনশতাধিক বছর দীর্ঘ হয়। প্রথমে ধারাবাহিক ১০৪ বছর

ফিলিস্তিনে উবায়দিয়া শাসন চলে। এটা প্রথম ধাপ। এরপর আবার তারা সেখানে প্রবেশ করে। সত্বর আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। কিন্তু চিন্তা করুন, পূর্ণ ১০০ বছর দেশটিকে ইলম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দাওয়াত ও ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে পরিপূর্ণ শূন্য রাখা হয়। সুন্নী সব আলেমকে প্রকারান্তরে হত্যা করা হয়। যার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ফিলিস্তিন ও মিসরে।

এখানে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হল আমরা যখনই মিসর নিয়ে আলোচনা করেছি, তখনই ফিলিস্তিনের আলোচনা চলে এসেছে। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও বন্ধন প্রাকৃতিক। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডই মিসরের ভূখণ্ড। আবার মিসরের ভূখণ্ডই ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড। উমাইয়া সাম্রাজ্যের যুগে এই দুই অঞ্চল একত্রে ছিল। এমনইভাবে আব্বাসী, তুলুনী ও ইখশীদী সাম্রাজ্যের সময়ও মিসর ও ফিলিস্তিন ছিল এক ও অভিন্ন। আর উবায়দিয়ারা যখন আসে, তখন তারাও উভয় ভূখণ্ড এক সাথে দখল করে। যখন ক্রুসেডার বাহিনী ফিলিস্তিন দখল করতে আসবে, তখন তারাও মিসর দখলের পাঁয়তারা শুরু করবে। এ সম্বন্ধ একটি প্রাকৃতিক সম্বন্ধ। শুধু ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সম্পর্ক নয়। এমনইভাবে এটা আকিদাগত, ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধনও। এজন্য এই বন্ধনের শিকড় খুব গভীরে। ফিলিস্তিন ও মিসরের জনগণেরও উচিৎ এ দৃঢ় বন্ধনকে গভীরভাবে অনুভব করা।

উবায়দিয়ারা বাহ্যিক অবস্থার খুব গুরুত্ব দিত। ভিতর থেকে তারা ছিল খোখলা। বাহ্য অবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে তারা মুসলিম বিশ্বে অনেক মসজিদ নির্মাণ করে। সেগুলোর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে জামে আল আযহার (মসজিদ)। এই কাজই ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে উবায়দিয়াদের মর্যাদাকে সমুন্নত করে তুলেছে। ঐতিহাসিকগণ তাদের জঘন্য আকিদা ও নিজেদের সেই ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করা নিকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্যও করেননি। তারা শুধু সুবিশাল মসজিদ ও স্থাপনাগুলোই দেখেছেন। এসব ঘিরে তাদের দূরভিসন্ধি নিয়ে ঐতিহাসিকদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ফিলিস্তিনের

আসকালান শহর জবরদখল করে নেওয়া ছিল তাদের নিকৃষ্ট কাজগুলোর অন্যতম। জনশ্রুতি ছিল যে, সেখানকার একটি দর্শনীয় স্থানে হুসাইন ইবনু আলী ﵁-এর মাথা আছে। কারণ, আপনারা যেমন জানেন যে, তার মাথা যখন কাটা হয়, প্রথমে কারবালা থেকে দামেশক নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে আসকালান। উবায়দিয়ারা মুসলমানদের কাছে নিজেদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য আসকালান থেকে সেই কর্তিত মাথা মিসর নিয়ে আসার নাটক করে। এ মাথাকে কেন্দ্র করে তারা একটি মসজিদও নির্মাণ করে। যা বর্তমানে হুসাইনী মসজিদ নামে পরিচিত। মিসরের খান আল-খলিলী-এর কাছে মসজিদটি অবস্থিত।

এখানে আমরা এমন একটি কথা বলতে চাই, যা শুনে অনেক মানুষই হয়তো অবাক হবেন। আসলে বাস্তবতা হচ্ছে আসকালানে হুসাইন ﵁-এর কর্তৃত শির ছিল না। আর মিসরে নিয়ে আসার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এসব মসজিদ নিছক ধারণা ও কল্পনার উপর নির্মিত। বাস্তবে যার কোনো সত্যতা নেই। আসলে হুসাইন ﵁-এর শির কারবালা থেকে দামেশক নেওয়া হয়নি। আর যে সব বর্ণনায় তা ইয়াযিদ ইবনু মুয়াবিয়াহর রাজধানী দামেশকে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলোই মিথ্যা ও বানোয়াট। ওসব বর্ণনায় সত্যতার লেশমাত্রও নেই। বরং কারবালায় যেখানে তিনি শাহাদাত বরণ করেন, সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এসব প্রোপাগাণ্ডা উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইতিহাস বিকৃতি সাধনে এসব প্রোপাগাণ্ডা মুসলিম উম্মাহর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। আর আসকালানের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হচ্ছে সেখানে হুসাইন ﵁-এর শির নেই। যে হুসাইনী মসজিদে দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ দর্শনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং নানান বেদআত ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়, তা-ও নিতান্ত ভিত্তিহীন। এসব বেদআত ও অপকর্ম মিসরে উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের শাসনামল থেকে চালুকৃত।

আরও বিভিন্ন প্রকার বেদআত ও গর্হিত কাজের সূচনা করে উবায়দী শাসন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মিলাদ এবং মিসরের বিভিন্ন মসজিদে

প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ সুফিবাদী অনুষ্ঠানগুলো। এমনইভাবে উবায়দিয়াদের দখলে আসা অন্যান্য ইসলামী ভূখণ্ডেও এরূপ অনেক বেদআত ছড়িয়ে পড়ে।

আমি বলি, মসজিদে হুসাইনে যদি হুসাইন ﵁-এর শির থাকেও তবুও তো সেখানে এসব অপকর্ম বৈধ নয়! তা হলে নিছক অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কেন তা যিয়ারতের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসে মানুষ এসব বেদআতে লিপ্ত হয়! এসবই জঘন্য উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের কীর্তি।

৩৪৬ হিজরী মুতাবিক ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে উবায়দিয়া (ফাতেমী) সাম্রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। আত্মপ্রকাশ ঘটে উবায়দী শাসক হাকিম বি-আমরিল্লাহ'র। ইসলামী ইতিহাসের একজন প্রসিদ্ধ লোক সে। বরং সে মানব-ইতিহাসের এক নিকৃষ্ট ব্যক্তি। যেকোনো ধর্ম ও সভ্যতার নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে সে তুলনীয়। ইতিহাসে এ লোকটি পাগল হিসাবে পরিচিত। নিঃসন্দেহে সে মুসলিম ছিল না। ১১ বছর বয়সে এ লোক শাসক হয়। প্রায় ৩/৪ বছর অভিভাকদের তত্ত্বাবধানে সে রাজ্য শাসন করে। এরপর নিজেই শাসনকার্য বুঝে নেয়। এসময় সে এমনসব সিদ্ধান্ত নিতে থাকে, যেগুলো কোনো পাগলের পক্ষেই সম্ভব। অনেক হালাল বিষয়কে হারাম করে। অনেক হারাম বিষয়কে হালাল করে। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অপকর্ম হচ্ছে সে প্রকাশ্যে সাহাবীদেরকে গালমন্দ করার জন্য নির্দেশ জারি করে। এসব গালি-গালাজ মিসর, ফিলিস্তিন ও শামের বিভিন্ন মসজিদের দরজায় লিখে রাখার হুকুম দেয়। তাজা খেজুর বিক্রি অবৈধ ঘোষণা করে। যেসব মাছের আঁশ নেই, সেগুলো খাওয়া হারাম সাব্যস্ত করে। 'মুলুখিয়্যা' (Corchorus olitorius) মালো পাট খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সাম্রাজ্যের অফিসিয়াল কাজ রাতে করার নির্দেশ জারি করে। আর ঘুমের চাহিদা দিনের বেলায় পূরণ করতে বলে। এভাবে সে দুনিয়ার নেযাম বদলে দেয়।

কায়রোতে যখন তার বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন শুরু হয়, তখন সে কায়রো ত্যাগ করে এবং সমগ্র কায়রো শহর পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ

দেয়। সত্যি সত্যি কায়রো শহর তার অধিবাসীসহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এক চাকরকে সে শহরের পরিণতি দেখার জন্য পাঠায়। চাকর ফিরে এসে বলে, 'শহরটির এমন অবস্থা করা হয়েছে যে, খোদ রোম সম্রাটও যদি শহরটি দখল করত, তবুও এ অবস্থা করতে পারত না।' চাকরের মুখে একথা শুনে সে অপমান বোধ করে এবং চাকরকে হত্যা করে ফেলে।

হাকিম বি-আমরিল্লাহ তার শাসনামলের শেষ দিকে এমন এক কাজ করে, যা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কোনো শাসক করেননি। সরাসরি সে নিজেকে 'ইলাহ' দাবি করে বসে। সে ব্যাখ্যা করে যে, আল্লাহ তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। তার কবিরাও তাকে ইলাহ গুণে গুণান্বিত করে সম্বোধন করতে থাকে। যেন আল্লাহ ﷻ-কে বাদ দিয়ে এখন সে-ই ইলাহ। তার সম্পর্কে রচিত প্রসিদ্ধ একটি পংক্তি এই—

مَا شِئْتَ لَا مَا شَاءَتِ الأَقْدَارُ • فَاحْكُم فَأَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ভাগ্য আবার কী,

তুমি যা বলিবে, হবে তাই

শাসন করো, হে প্রতাপশালী

তোমার বড় কেউ নাই।

এভাবেই কবিরা হাকিম বি-আমরিল্লাহকে সম্বোধন করত। একাধারে ২৫ বছর মুসলিম উম্মাহকে শাসন করে সে। ৪১১ হিজরী মুতাবিক ১০২১ খ্রিস্টাব্দে তার অপশাসনের সমাপ্তি ঘটে। ৩৬ বছর বয়সে সে নিহত হয়।

যেসব জঘন্য সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে গীর্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেওয়া এবং ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপর জুলুম-নিপীড়ন করা। পরবর্তীতে ইউরোপের ইতিহাসে, প্রাচ্যবিদ ও প্রতিচ্যাবিদদের ইতিহাসে সে এই অপকর্মের জন্য কুখ্যাত সাব্যস্ত হয়। সে খ্রিস্টানদেরকে সবসময় গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়, যাতে তাদেরকে সহজে চেনা যায়।

এমনইভাবে ইহুদীদেরকেও নির্দিষ্ট একটি প্রতীক গলায় ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়। আল-কুদসে অবস্থিত খ্রিস্টানদের প্রসিদ্ধ উপাসনালয় আল-কিয়ামাহ গীর্জা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম জারি করে। হাকিম বি-আমরিল্লাহর হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে অনেক খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করতেও বাধ্য হয়। যদ্দরুন মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয়, যা আগে উমাইয়া, আব্বাসী, তুলুনী ও ইখশীদী সাম্রাজ্যের সময় আমরা দেখতে পাইনি। এ সবই ঘটেছে এই পাগল লোকটির জন্য।

এ ঘটনা নিয়ে আমাদের আরেকটু আলোচনা করা উচিত। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এ নির্যাতনের উৎস দীন বা আকিদা ছিল না। বরং সম্পূর্ণ এর বিপরীত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিম উম্মাহ সীমাহীন উদারতার পরিচয় দিয়েছে। আর এ লোকটি ছিল নিরেট কাফের। ইসলামের গণ্ডি থেকে বহু দূরে। তার অপকর্মের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা আরও বলতে চাই, এ জুলুম-নির্যাতন শুধু ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপরই ছিল না। বরং সুন্নত অনুসারী চার মাযহাবের মুসলমানরাও তার নির্যাতনের শিকার হয়। ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপর পরিচালিত তার এসব জুলুম-অত্যাচার আলেমগণ ও জনগণ মেনে নেননি। বরং সুন্নত অনুসারী মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলনও করেন। এই জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে সে উমারী চুক্তিনামা এবং মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার সন্ধিও ভঙ্গ করে। এছাড়াও তার এসব কাজকর্ম সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। এই আন্দোলনের কারণে হাকিম বি-আমরিল্লাহ ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপর তার এ অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। মিসর ও ফিলিস্তিন উভয় স্থানে। উপরন্তু যেসব খ্রিস্টান নির্যাতনের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কারণ, তারা দায় ঠেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর বিষয়টি ছিল একদম স্পষ্ট। তবে মুসলিম অমুসলিম কোনো ঐতিহাসিকের জন্য এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ইসলামী ভূখণ্ডে অমুসলমানদের উপর নির্যাতনের দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা সমীচীন নয়। আমরা প্রকৃতপক্ষে এই লোককে মুসলিম বলে স্বীকারই

করি না। তবে এটা সত্য যে তার অপকর্ম সমগ্র সাম্রাজ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে রেখেছিল।

হাকিম বি-আমরিল্লাহর নিহত হওয়ার পর যাহির লি-ইযাযি দীনিল্লাহ উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের শাসক নিযুক্ত হন। তার শাসনামল ছিল ১৬ বছর। এরপর মুস্তানসির লি-দীনিল্লাহ ধারাবাহিক ৬০ বছর উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শাসক। ৪৮৭ হিজরী মুতাবিক ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে মিসরে তার শাসন ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে। মুস্তানসির লি-দীনিল্লাহ-এর দীর্ঘ জীবন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে তার শেষ বয়সে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য 'মুস্তালিয়া' ও 'নিযারিয়া' দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বিশেষত ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং নির্বিশেষে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এর সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এতে এমন কিছু বিবর্তন ঘটে, যা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ঘটনার গতিপ্রবাহ বদলে দেয়।

আসুন, জেনে নিই-ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে সেই পরিবর্তন কী ছিল?

আর উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের সেই বির্বতন ছিল কী?

এর ফলে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব কী পরিণতির শিকার হয়?

সালজুক যুগে ফিলিস্তিন

আমরা উবায়দী (ফাতিমী) সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। তার জুলুম-নির্যাতন ও আকিদার বিভ্রান্তিও তুলে ধরেছি। সুন্নী আলেমদেরকে হত্যা, সাহাবীদেরকে গালি-গালাজকরণ, দীনের বিভিন্ন বিধান পরিবর্তন, মসজিদ নির্মাণ ও আকিদার বিকৃতিসহ ইসলামী সাম্রাজ্যে তার নানা অপকর্ম আমরা আলোচনা করেছি। ফিলিস্তিনে উবায়দী শাসন স্থায়ী হয় ১০৪ বছর।

মিসর ও ফিলিস্তিনে মুস্তানসির বিল্লাহ-এর দীর্ঘ ৬০ বছরের শাসনামলে নানা সমস্যা দেখা দিলেও এবং এখানে সেখানে সবর্ত্র অন্ধকার বিরাজ করলেও ইসলামী বিশ্বে মিটি মিটি করে তখন জ্বলে উঠতে থাকে এক আলোর মশাল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি নির্দিষ্ট সামান্য কিছু জায়গা বাদে সমগ্র ইসলামী বিশ্বই তখন শিয়াদের অধীনে চলে গিয়েছিল। ৪৩২ হিজরী মুতাবিক ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের উত্তর ও ইরানের পূর্বে জ্বলে ওঠে নতুন আলো। এ আলোই ছিল সালজুক সাম্রাজ্য-এর আত্মপ্রকাশ। এ ছিল বিরাট সুন্নী সাম্রাজ্য। প্রসিদ্ধ তুর্কী বীর সালজুক ইবনে দুকাক এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তুর্কীরা হচ্ছে কাস্পিয়ান সাগরের চারপাশে বসবাসকারী একটি বিখ্যাত সম্প্রদায়। তখন তারা বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর)-এর বাসিন্দা ছিল না। কাস্পিয়ান সাগরের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিজরত করে তারা বর্তমান তুরস্কে এসেছিল। কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলেই তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। এ অঞ্চলে 'সাবিও' নামে একটি তুর্কী গোত্র ছিল। এ গোত্রের হাতে ৪৩২ হিজরীতে সালজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমেই তারা উত্তর আফগানিস্তান ও পূর্ব ইরানে সম্প্রসারিত হতে থাকে। তুগ্রুল বেকের যুগে তাদের সাম্রাজ্য ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। সালজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তিনি একজন মহান আমীর হিসাবে প্রসিদ্ধ। মূলত তিনিই এ সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামী ইতিহাসের গ্রন্থাদীতে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মুসলিম। রাতের বেলা সালাত আদায় করতেন। দিনে সিয়াম পালন করতেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রচুর পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ছিলেন উৎসর্গপ্রাণ। তিনি সর্বত্র কাফেরদের খুঁজে বেড়াতেন আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তার পুরো জীবনই ছিল আল্লাহর জন্য। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

তৎকালীন নামসর্বস্ব আব্বাসী খলিফা তাঁর সম্পর্কে শুনতে পান। তৎকালীন আব্বাসী খেলাফতের কেন্দ্র ইরাক ছিল বুওয়াই ইসনা আশারিয়া শিয়াদের আধিপত্যে অধীনে। তারা ছিল ইরাকের নিয়ন্ত্রক। অশ্লীল ও গর্হিত বিষয়াদি ছড়ানো ছিল তাদের কাজ। দীন বিকৃত করত। আব্বাসী খেলাফত সুরক্ষিত আছে, এমন ধারণা দিতে তারা আব্বাসী খলিফাকে তার আসনে বসিয়ে রেখেছিল। যাতে ইসলামী রাজ্যগুলো তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে। কিন্তু তারা খলিফার সাথে খুবই অপমানজনক, লজ্জা ও তাচ্ছিল্যে আচরণ করত।

আব্বাসী খলিফা তুগ্রুল বেকের সাহস ও ইসলামী ভূখণ্ডে তার প্রভাবের কথা শুনে তাকে বাগদাদ আসার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। শিয়া বুওয়াইদের হাত থেকে খেলাফতকে মুক্ত করতে তার সাহায্য চান। তুগ্রুল বেক বিলম্ব না করে দীনের সাহায্যে আল্লাহর পথে জিহাদ ও আল্লাহর শরীয়তকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজ বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। ৪৪৭ হিজরী মুতাবিক ১০৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিয়া বুওয়াই শাসনের অবসান ঘটিয়ে সালজুক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

সালজুকদের অধীনে আব্বাসী সাম্রাজ্যের সময়গুলো খুবই ভালো অতিবাহিত হয়। এ সময়ে আল্লাহর শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে

তখনও দেশ পরিচালনায় আব্বাসী খলিফার কোনো মতামত ও ভূমিকা ছিল না। শাসনকার্যে সালজুক সুলতানেরই একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে। তবে আব্বাসী খলিফাকে তার ধর্মীয় উচ্চাসন, অর্থনৈতিক সুবিধা ও অন্যান্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দীর্ঘ সময় সালজুকগণ ইরাক ও পার্শ্ববর্তী ইসলামী ভূখণ্ডের শাসন করেন।

৪৫৫ হিজরী মুতাবিক ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে মুসলমানদের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যক্তির। তিনি হলেন আল্প আরসালান ﷺ। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের কেন্দ্রীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি সালজুক সাম্রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে সক্ষম হন। ৪৬৩ হিজরী মুতাবিক ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে এক ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধে তিনি রোমান বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ মালাজগির্দ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। মাত্র ২০ হাজার মুসলিম মুজাহিদ নিয়ে তিনি দুই লাখ যোদ্ধার বায়যান্টাইন বাহিনীর উপর জয়লাভ করেন। এর মাধ্যমে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায়। তাদের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল শহর। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট চতুর্থ রোমানোস এ যুদ্ধে বন্দী হন। বন্দী হয় বায়যান্টাইন বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধা। অপর অংশ নিহত হয়। এর মাধ্যমে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। সালজুক সাম্রাজ্যের তারকা বুলন্দ হয়ে যায়। বিশেষ করে আল্প আরসালান খ্যাতির চূড়ায় উঠে যান।

এই বিজয়ের দুই বছর পরই ৪৬৫ হিজরী মুতাবিক ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে আল্প আরসালান শাহাদাত বরণ করেন। এরপর তাঁর পুত্র মালিক শাহ পরবর্তী শাসক মনোনীত হন। পিতার মত তিনিও ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তি। তিনি চীন থেকে শাম পর্যন্ত শাসন করেন এক সাম্রাজ্যরূপে। এজন্য তাঁর উপাধি ছিল 'সুলতানুল আলাম' বা বিশ্বসুলতান। ন্যায়বিচার ও তাকওয়া ছিল তাঁর অনন্য ভুষণ। এ সময়ে তাঁর প্রধান উযীর ছিলেন নিযামুল মুলক তুসী। তিনিও জ্ঞান-বিজ্ঞান, জিহাদ, দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। এ সবের এক

ইতিবাচক প্রভাব পড়ে সালজুক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভূখণ্ডসমূহে। কিন্তু এই পুরো সময় ফিলিস্তিন ছিল উবায়দয়ী সাম্রাজ্যের দখলে।

সুলতান আল্প আরসালানের সময় তিনি একবার এক তুর্কী সেনাপতিকে উবায়দী দখল থেকে ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এ সেনাপতির নাম ছিল আতসিয ইবনে উভাক খোরেজমী। সুলতান আল্প আরসালানের অন্যতম একজন সেনাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। বেশিরভাগের মতে তিনি অত্যাচারী ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে গমন করে সেখানকার উবায়দীদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেন। ঘটনা ছিল ৪৬৩ হিজরীর। একই বছর সুলতান আল্প আরসালান মালাজগির্দ যুদ্ধে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর বিজয়ী হন। উবায়দীদের কাছ থেকে ফিলিস্তিন মুক্ত করে আতসিয ইবনে উভাক খোরেজমী ফিলিস্তিন নিয়ে সালজুক সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যান।

পরিতাপের বিষয়, তিনি ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর সাথে কঠোর আচরণ করতে শুরু করেন। বড় অঙ্কের কর আরোপ করেন। প্রকৃত ইসলামী মূলনীতি থেকে দূরে সরে যান। অবশ্য তিনি ইসলাঈলী শিয়া আলেমদের বের করে দিয়ে সুন্নী আলেমদের ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে আনেন। বলা যায়, ফিলিস্তিন একটি সংকট থেকে বের হয়ে আরেকটি সংকটে নিপতিত হয়। তবে দ্বিতীয় সংকট ছিল প্রথম সংকটের চেয়ে কিছুটা সহজতর।

দীর্ঘ একটি সময় ফিলিস্তিনের এ অবস্থা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি তুতুশ ইবনু আল্প আরসালান। তবে পরিতাপের বিষয়, তিনি আল্প আরসালানের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও জালেম ও ভ্রষ্ট প্রমাণিত হন। তিনি না ছিলেন পিতার আদর্শের উপর আর না ছিলেন তার ভাই মালিক শাহের আদর্শের উপর। শামের একটি অংশ তার তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি ফিলিস্তিনকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। আতসিয ইবনে উভাক খোরেজমীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে আতসিয ইবনে উভাক খোরেজমী

নিহত হন। এর মাধ্যমে তুতুশ ফিলিস্তিন ভূখণ্ড অধিকার করে নেন। তিনি তার এক সেনাপতি আরতুক ইবনে আকসাবকে ফিলিস্তিনের শাসনভার অর্পণ করেন। এসব ঘটনা ছিল ৪৭০ হিজরীর।

৪৭১ হিজরী থেকে ৪৮৯ হিজরী পর্যন্ত আরতুক ইবনে আকসাব ফিলিস্তিন শাসন করেন। অর্থাৎ ধারাবাহিক ১৮ বছর। দীর্ঘ অপশাসনের পর এ সময়টি ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই উত্তম সময়। যদিও তুতুশ ইবনু আল্প আরসালান শামের শাসক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন জালেম প্রকৃতির শাসক, তবে ফিলিস্তিনের গভর্নর আরতুক ইবনু আকসাব ছিলেন একজন আল্লাহভীরু ন্যায়পরায়ণ প্রজাদরদী শাসক।

আরতুক ইবনু আকসাব ﵀-এর মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ ফিলিস্তিনের গভর্নর হন। তাদের একজনের নাম ছিল সুকমান। আরেকজনের নাম গাজী। তারা উভয়ই ছিলেন আল্লাহভীরু শাসক।

৪৮৯ হিজরীতে আবার উবায়দীরা ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। তারা সুকমান ইবনু আরতুক ও গাজী ইবনু আরতুককে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেয়। এ দখল ধারাবাহিক ৩ বছর অব্যাহত থাকে।

এদিকে সুকমান ও গাজী পরাজিত এবং ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে হিজরত করেন। অঞ্চলটি ছিল দজলা ও ফুরাত নদীর কাছে অবস্থিত। অর্থাৎ তারা তুরস্কের দক্ষিণে হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে আরাতিকা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদে এ রাজ্যের ছিল বিশেষ অবদান।

যাইহোক, ফিলিস্তিন আবার ফিরে আসে উবায়দী সাম্রাজ্যের দখলে। আবার সুন্নী আলেমদের উপর হত্যাযজ্ঞ এবং সুন্নতের উপর নির্বিচারে ত্রাস শুরু হয়। বিকৃত ইসমাঈলী মতাদর্শ প্রসারে তারা আবার মেতে ওঠে। দেশের অবস্থা আবার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মিসরের উবায়দী সাম্রাজ্য এর আগেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। নিযারিয়া ও মুস্তালিয়া। তখন ফিলিস্তিন ছিল

মুস্তালিয়া সাম্রাজ্যের অধীন, মিসরের শাসক আল-মুস্তালী বিল্লাহর নেতৃত্বাধীন।

আফসোসের বিষয়, নতুন আগ্রাসনের কবলে পড়ে উবায়দীরা আবার ফিলিস্তিন থেকে বহিস্কৃত হয়। আগমন ঘটে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের। ক্রুসেড যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের কিছুটা পেছন ফিরে দেখা উচিত।

ক্রুসেড যুদ্ধের বীজ কী ছিল? কেন পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইসলামী বিশ্বে বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ক্রুসেড হামলা আছড়ে পড়েছিল? এ প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। তবে পরিধির স্বল্পতার দরুণ আমরা শুধু ইতিহাসের সামান্য কিছু পাতাই উন্মোচন করব। সকলের প্রতি আমন্ত্রণ থাকবে এর আলোকে বিস্তারিত দেখে নেওয়ার।

ইসলামী ইতিহাসে এমনকি মানবতার ইতিহাসে ক্রুসেড যুদ্ধের পর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে। ক্রুসেড যুদ্ধের এই যুগ অতিদীর্ঘ। পুরো ২০০ বছর। এই যুগ ছিল অতীত ইউরোপীয় চিন্তাধারার সম্পূর্ণই বিপরীত। কেননা, এ শুধু এক-দুইটা অভিযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এক কিংবা দুই বছরের ঘটনাও ছিল না; বরং এ ছিল দীর্ঘ ২০০ বছরের ধারাবাহিক ব্যাপার এবং একের পর এক অবিরাম পরিচালিত সিরিজ অভিযান। দীর্ঘ এই দুইশ' বছরের শাখায় শাখায় ঘটে বহু ঘটনা। যেগুলোর আলোকে আমরা ইউরোপীয়দের চিন্তাধারা অনুমান করতে পারি। কেননা, আজও আমরা সেই একই চিন্তাধারার অধিকারী ইউরোপীয়দের সাথে বসবাস করছি। চাই তার রূপ ও আকৃতি ভিন্ন হোক অথবা অভিন্ন। বাস্তবতা হল, ক্রুসেড যুদ্ধের যুগ আমাদের বর্তমান যুগের সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি আমরা বর্তমান অবক্ষয় থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তা হলে আমাদের ক্রুসেড যুদ্ধের বিভীষিকাময় যুগ থেকে মুসলিম বিশ্ব কীভাবে উত্তোরণ লাভ করেছিল, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ইতিহাসবিদদের হাতে ক্রুসেড যুদ্ধের পর্বটি ব্যাপকভাবে বিকৃতির শিকার হয়েছে। আফসোসের বিষয়, এসব ইতিহাসবিদের বড় এক

অংশ মুসলিম। যেকোনো সাহিত্যিকের জন্য এটা এক মূল্যবান যুগ। কেননা, তাতে রয়েছে অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনী। অনেক সাহিত্যিক এখান থেকে কাহিনীমালা গ্রহণ করেছেন এবং রচনা করেছেন ইতিহাসের প্রকৃত সংশ্লিষ্টতা থেকে বহির্ভূত অনেক বই। তাদের ইচ্ছা ছিল কাহিনীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা এবং অবাস্তব কথার মাধ্যমে তথ্য পরিপূর্ণ করা। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি মানুষের সামনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে এবং কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তা উপলব্ধি করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপ নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইউরোপীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এ ক্রুসেড যুদ্ধের পরই। এ সময়ে তারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয় ইউরোপে স্থানান্তর করে। যার উপর ভর করে ইউরোপের সামগ্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়। অপর দিকে ক্রুসেড যুদ্ধের পর শুরু হয় মুসলিম বিশ্বের পশ্চাদমুখিতার ধাপ। কেননা, এ যুদ্ধের দরুণ দীর্ঘ সময় মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও অর্থনৈতিক খাতে মনোযোগ দিতে পারেননি। দীর্ঘ ২০০ বছর কেটে যায় এ অবস্থায়।

আরেকটি বিষয়, ক্রুসেডাররা ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের বড় একটি অংশ ধ্বংস করে দেয়। যেমন, ক্রুসেডাররা যখন তরাবলুস শহর দখল করে, তখন তারা শহরের প্রাঙ্গণে ৩ মিলিয়ন ইসলামী গ্রন্থ জ্বালিয়ে দেয়। শরীয়ত, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ভূগোলসহ বহু মূল্যবান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ তারা ভস্ম করে। এবার চিন্তা করে দেখুন, ক্রুসেডারদের হাতে কী পরিমাণ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন বাঞ্ছনীয়, কেন ইউরোপীয়রা ক্রুসেড অভিযানে বের হয়?

কেন ক্রুসেডাররা দূর দেশ থেকে শামের ভূখণ্ডে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিল, তা জানতে হলে আমাদের তৎকালীন ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী ও তাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। যদি আমরা ক্রুসেড হামলার পূর্ববর্তী ৫০ বা ৬০ বছরের ইতিহাসের প্রতি

লক্ষ্য করি, তা হলে আমরা এমন বহু উপাদান পেয়ে যাব, যেগুলো ক্রুসেডার বাহিনীকে ইসলামী ভূখণ্ডে নিয়ে এসেছিল। এসব উপাদানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্মীয় পটভূমি। তৎকালীন ইউরোপ ছিল গীর্জার প্রভাবাধীন। সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আকিদাসহ সব বিষয়ে গীর্জার সরাসরি প্রভাব ছিল সমগ্র ইউরোপের উপর। তৎকালীন ইউরোপে এক গুঁজব রটে গিয়েছিল যে, অচিরেই এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-এর জন্মের প্রথম সহস্রাব্দেই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিশ্বাস লালন করত। যদিও সেসময়ের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়নি; কিন্তু এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এই বিশ্বাসের কারণে তারা পাপ মোচনের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। আর এই পাপ মোচনের জন্য পোপ ও পাদ্রীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হত। যা ছিল ইউরোপ শাসনে পোপদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পাদ্রী ও ধর্ম যাজকরা সাধারণ খ্রিস্টানদের বলতেন, যারা পাপ মোচনের মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম নয়, তারা এর পরিবর্তে ফিলিস্তিন গিয়ে তীর্থকর্ম সম্পন্ন করে এলে যথেষ্ট হবে। এই কারণে ইউরোপে ফিলিস্তিন নামটি ব্যাপকহারে চর্চা হতে থাকে।

সেই সাথে ৪৪৫ হিজরী মুতাবিক ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে এক বিরাট ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ দুটি ধর্মীয় দলে ইউরোপ বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব ইউরোপে অর্থোডক্স শাখা। পশ্চিম ইউরোপে ক্যাথলিক শাখা। ক্রুসেড যুদ্ধের প্রায় ৫০ বছর আগে সংঘটিত এ বিভক্তি থেকে উত্তোরণ এবং খ্রিস্টান বিশ্বের উভয় গীর্জাকে ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় আগ্রহ ছিল ইতালির ও ফ্রান্সের পোপদের মধ্যে।

সুতরাং ক্রুসেড লড়াইয়ের পেছনে সাধারণ মানুষ নয়; বরং ধর্মীয় পটভূমি ও গীর্জার পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল। আর ফিলিস্তিন নামও তৎকালীন ইউরোপে বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সেই সাথে ক্যাথলিক মতালম্বী পশ্চিম ইউরোপ পূর্ব ইউরোপকে হারিয়ে ছিল, যা অর্থোডক্স হয়ে গিয়েছিল। এ সবই পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানদের ক্রুসেড যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

তৎকালীন ইউরোপে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদ্দরুণ বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। ইউরোপীয়রা সেখানে নানামুখি জুলুমেরও শিকার হয়। ইউরোপের সমস্ত সম্পদ ছিল বড় বড় আমীর, শাসক ও গীর্জার দখলে। কঠিন অভাবে ভুগত সাধারণ জনগণ। এমন কি যখন কোনো দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তাতে বিরাট সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হত।

সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল উত্তর ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে ক্রুসেড যুদ্ধের মাত্র ১০ বছর আগে। ক্রুসেড লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে এই দুর্ভিক্ষের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

নিষ্পেষিত জনগণের এ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা-অনাহারের মধ্যেও ইউরোপের বড় বড় সওদাগর, আমীর-উমরার মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বিরাজমান ছিল। বিশেষ করে ইতালির বণিকদের মধ্যে। ইতালিতে তখন অনেকগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জেনোয়া (Genoa), পিসা (Pisa) ও ভেনিস (Venice)।

এ ছিল তৎকালীন ইউরোপের দৃশ্যপট। তালিকার শীর্ষের কিছু মানুষ সম্পদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল; আর কিছু নিপীড়িত মানুষের খাবারও জুটত না। সেই সাথে ইউরোপে অধিক যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ সর্বত্র সামরিক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল। চাই সেই যুদ্ধ হোক আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অথবা উত্তর ইউরোপের বর্বর ভাইকিং (Vikings) জাতিগোষ্ঠীর সাথে। এভাবে একজন অশ্বারোহীই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ইউরোপিয়ান হিসাবে মডেল বিবেচিত হতে থাকে। মোটকথা, সামরিক পরিবেশ আবহাওয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যা ইউরোপকে ক্রুসেড লড়াইয়ে প্ররোচিত করে।

এমনইভাবে ইউরোপের একই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আমীর ও রাজাদের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। যেমন, ফ্রান্সের মূল শাসন ছিল একজন সম্রাটের হাতে। এ সম্রাটের অধীনে অনেকগুলো প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট ছিল, সেগুলো সম্রাটের অধীনস্ততা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল। আবার প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নরের ছিল নিজস্ব লালসা ও

আগ্রাসী মনোবৃত্তি। এ কারণেও সবাই ফিলিস্তিন গিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিল।

এসবের সাথে আমি সামাজিক পটভূমিও যোগ করতে চাই। মধ্য যুগের ইউরোপীয় সমাজে ছিল মূর্খতা, শিক্ষাহীনতা ও গোঁয়ার্তুমি। আর বংশ পরম্পরার হাতে ছিল শাসনভার। যাইহোক, এসব জটিল প্রেক্ষাপট ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতি ইউরোপকে উদ্বুদ্ধ করে। এমন সময় ইউরোপের ইতিহাসে এক ধূর্ত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি আমীর, শাসক, পোপ, পাদ্রী, ক্ষুধার্ত জনগণ– সবার প্রত্যাশা পূরণের একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। তা হল ফিলিস্তিনের উপর ক্রুসেড আক্রমণ। যাতে ইউরোপের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়।

আপনি কি জানেন, কে সেই ব্যক্তি?

উদ্দেশ্য সাধনে সে কী করেছিল?

তার তৎপরতা মুসলিম বিশ্বে কেমন প্রভাব ফেলেছিল?

ফিলিস্তিন অভিমুখে ক্রুসেডার বাহিনী

আমরা ফিলিস্তিনে উবায়দী সাম্রাজ্যের পতন ও আতসিয ইবনু উভাকের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছি। আরতুক ইবনু আকসাব ও ফিলিস্তিনে স্বল্প সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আরাতিকা সাম্রাজ্য নিয়েও কথা বলেছি। এরপর আবার তিন বছরের জন্য ফিলিস্তিনে উবায়দী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর শুরু হয় ক্রুসেড যুদ্ধ। আমরা ক্রুসেড যুদ্ধের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেছি, যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেন এসব ক্রুসেডাররা সুদূর পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইসলামী বিশ্ব দখল করতে এসেছিল? এমনইভাবে আমরা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পটভূমি ও গীর্জার আধিপত্য নিয়েও আলোকপাত করেছি। ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মূর্খতা ও নিরক্ষরতা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শাসকশ্রেণির পারস্পরিক লোভ-লালসা ও রাজ্য সম্প্রসারণের দূরভিসন্ধিও আমরা পাঠক সমীপে পেশ করেছি। আমাদের আলোচনায় এ বিষয়ও উঠে এসেছে যে, তৎকালীন ইউরোপে একজন অশ্বারোহী যোদ্ধাই ছিল সম্মান ও মর্যাদার আদর্শ প্রতীক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যোদ্ধা ও অশ্বারোহীর জীবন বেছে নিতে চাইত। অর্থনৈতিক পটভূমি মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের কথাও আলোচনা করেছি, যা ইউরোপ জুড়ে বিরাজ করছিল; বিশেষ করে উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ জার্মানিতে। আমরা আরও তুলে ধরেছি, সামাজিক অবক্ষয় ও ইউরোপের কৃষক শ্রেণি ও সাধারণ জনগণের ভোগান্তিকর জীবনকথা।

এসবকিছুর পর সেখানকার লোকজনের মধ্যে কাজ করছিল সীমাহীন লোভ। রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের ছিল একপ্রকার লোভ-লালসা; দলিত অভাবীদের ছিল আরেক প্রকারের লোভ-লালসা; ধর্মীয়

ব্যক্তিদেরও ছিল বিশেষ লোভ-লালসা। এ সময়ে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যে সবার লোভ-লালসা একটি বিশেষ দিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়। তা হল মুসলিম বিশ্বে অভিযান ও ফিলিস্তিন দখল। যেন এই দখলই ইউরোপকে সব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিবে। এই ব্যক্তি ছিল ক্যাথলিক পোপ দ্বিতীয় আরবান।

৪৮০ হিজরী মুতাবিক ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আরবান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের পোপ নির্বাচিত হয়। পুরো ইউরোপই কার্যত তার অধীন ছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে সর্বেসর্বা ছিল সে। তার অবস্থান ছিল ইউরোপিয়ান সব রাজা-বাদশাহর উপরে। আফসোসের বিষয়, তার ও আমীর-উমরার মধ্যবর্তী সম্পর্ক বর্ণনার জায়গা এটা নয়। যে সময়ে পোপ দ্বিতীয় আরবান চিন্তা করছিল কীভাবে সবার লোভ-লালসা একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে সমগ্র ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ এবং কীভাবে ইউরোপের উপর নিজের আধিপত্য বৃদ্ধি করবে, ঠিক তখনই অ্যালেক্সাস কমনেন (Alexus Komnene)-এর পক্ষ থেকে তার কাছে সাহায্যের আবেদন আসে। অ্যালেক্সাস কমনেন ছিল পূর্ব ইউরোপের বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট। তার সাহায্য প্রার্থনার কারণ ছিল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সালজুকদের অনবরত বিজয় অর্জন। বিশেষ করে ৪৬৩ হিজরী মুতাবিক ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে বাইযান্টাইন বাহিনীর উপর সুলতান আল্প আরসালানের বিরাট বিজয় অর্জন। এ সময় সম্রাট চতুর্থ রোমানোসকে বন্দী করা হয়, যাকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তিনি কনস্টান্টিনোপলে নিহত হন। মালাজগির্দের লড়াইয়ের পর রোমান সাম্রাজ্যের কোমর ভেঙ্গে যায়। এরপর প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা তলোয়ার উঁচু করার সাহসও পায়নি। এই বিশাল শক্তি নিয়ে সালজুকদের অগ্রগতি অর্থোডক্স অ্যালেক্সাস কমনেনকে চিন্তিত করে তোলে। অনেকটা বাধ্য হয়ে সে তার বিশেষ শত্রু ক্যাথলিক পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। অ্যালেক্সাস কমনেন যখন সেনা সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তার উদ্দেশ্য আদৌ এটা ছিল না যে, ক্রুসেডার বাহিনী এসে ফিলিস্তিনে আবাস গড়ে তুলবে। বরং সে চেয়েছিল সাময়িক ভাড়াটে

সেনা সাহায্য। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যে এটা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। তারা প্রায়ই আর্মেনিয়ান ও অমুসলিম তুর্কীদের থেকে এবং এশিয়া ও খোদ ইউরোপ থেকেও এমন সৈন্য নিত, যারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বায়যান্টাইন বাহিনীতে বেতন নিয়ে কাজ করত। আর প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী সাম্রাজ্য বায়যান্টিকদের কাছ থেকে প্রাচ্যের অঞ্চলগুলো কেড়ে নিয়েছিল। এরপর পূর্ব ইউরোপ, আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর)-এর কিছু অংশ এবং কনস্টান্টিনোপল অঞ্চল বাদে বাইযান্টাইন সাম্রাজ্যের তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

এখানে এমন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছিল যে, আমীরদের মধ্যে খুব সহজে উত্তেজনা সৃষ্টি করা যেত এবং একজন গিয়ে অপরজনের সাথে যোগ দিত। অবশেষে মুসলমানদের সাথে লড়ার জন্য তারা বাহিনী মাঠে নামাত।

উপরন্তু ফ্রান্স ছিল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্র। দেশটি এমন সৈন্যদের সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল, যাদের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের সহযোগিতা করা হবে। অ্যালেক্সাস কমনেন যেমন দাবি করছিল। একই সাথে (তাদের দাবি অনুযায়ী এবং তাদের বইপুস্তক ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি অনুযায়ী) অবিশ্বাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার এই ধর্মীয় চেতনার কারণে ইউরোপে ফ্রান্সের ছিল বিশেষ মর্যাদা। এ বিষয়টি শুধু ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়; বরং আমাদের বর্তমান যুগেও তা বিদ্যমান। ফ্রান্স ভ্রমণকালে আমি স্বচক্ষে তা দেখে এসেছি। আমি স্টার্সবার্গ গিয়েছিলাম। এটা পুরা ইউরোপের এবং বিশেষত ফ্রান্সের সর্বাধিক ধর্মীয় চেতনার শহর। আর একেই ইউরোপীয়রা তাদের ইউরোপিয়ান ঐক্যের রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করে।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৪৮৮ হিজরীতে পোপ দ্বিতীয় আরবান দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্লেয়ারবন শহরে তার সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে বহু শ্রেণির মানুষ সমবেত করে সে। এমনকি দরিদ্র, দলিত-পীড়িত জনগণ ও কৃষকশ্রেণিও অংশগ্রহণ করে। রাজা-বাদশাহ, পাদ্রী, ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী ও ধনীদেরও সে সমবেত করে এবং কার্যকর সমস্ত শক্তির মধ্যে সমন্বয় করে। এদের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীও ছিল যাদের তেমন

কোনো গুরুত্ব ছিল না। সমাবেশকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তোলে সে। উৎকৃষ্ট অলঙ্কার মণ্ডিত যাদুময় বক্তব্য প্রদান করে। সমবেত জনতার মনে তার এ বক্তব্য নাদ প্রভাব সৃষ্টি করে। এ সমাবেশের সবাই ফিলিস্তিনের উদ্দেশে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত একটি অত্যন্ত ভয়ানক ও সামরিক বিবর হওয়া সত্ত্বেও তারা এতে সময় নেয় না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করবে, যারা ফিলিস্তিন আক্রমণ করতে বহু কষ্টে বিশাল ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করবে। তবুও তারা এতে তেমন সময় গ্রহণ করে না। তারা বলতে থাকে, এই যুদ্ধ ঈশ্বরের জন্য। আর যে ঈশ্বরের উপর তারা বিশ্বাস রাখে, তিনি হচ্ছেন ঈসা ﷺ। তারা ক্রুশ ঝুলিয়ে সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মানুষের আবেগ ধরে রাখতে পোপ দ্বিতীয় আরবান কিছু পুরোহিত ও পাদ্রীর সহায়তা নেয়। তাদের অন্যতম হচ্ছে পিটার দ্য হারমিট (Peter the Hermit) ও ওয়ালটার সান্স আভয়ার (Walter Sans Avoir)। এরা ছিল ফ্রান্সের অন্যতম বড় পাদ্রী।

এ যুদ্ধের দিকে খেয়াল করলে সহজেই বোঝা যায় যে, এ ছিল পবিত্র যুদ্ধ, ধর্ম যুদ্ধ কিংবা ক্রুসেড যুদ্ধের নামে এক চরম নৈরাজ্য ও জুলুম। আসলে ধর্মের সাথে এর নূন্যতম সম্পর্কও ছিল না। নিকটবর্তীও না; দূরবর্তীও না। আমরা সামনে দেখতে পাব ধন-সম্পদ জড়ো করার অস্থিরতা। আর অভিযানের শুরুতে তারা যে ধর্মবিশ্বাসের ছুতা অবলম্বন করেছিল, তার রেশমাত্রও থাকবে না।

পিটার দ্য হারমিট মানুষকে সমবেত করতে বের হয়। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি থেকে বহু সংখ্যক মানুষকে একত্র করতে সক্ষম হয় সে। এমনইভাবে ওয়ালটার সান্স আভয়ারও বহু মানুষজন জড়ো করে। অনবরত দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে এই বিরাট সংখ্যক জনতা বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি সুশৃঙ্খল বাহিনীগুলোর সমবেত হওয়ার আগেই।

যুদ্ধের প্রশিক্ষণহীন ক্রুসেডারদের বিশাল জনগোষ্ঠী ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে লড়াই করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। তারা সবই কৃষক, অভাবী ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। ভবিষ্যতের সন্ধানে তাদের এই যাত্রা।

কারণ, নিজেদের দেশে তারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারছিল না। ফ্রান্স থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত সুদূর পথ তারা পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেয়। সেখান থেকে যেন তারা এশিয়া মাইনরে (বর্তমান তুরস্কে) পৌঁছতে পারে এবং পরে সেখান থেকে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা করতে পারে। পথিমধ্যে তারা বহু অর্থোডক্স খ্রিস্টান জনপদ পাড়ি দেয় এবং কিছু অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাজ্য অতিক্রম করে। যারা তাদের ধর্মীয় ভাই। কিন্তু এসব জনপদ ও রাজ্যের অধিবাসীদেরকে তারা হত্যা করে। এ সব গণহত্যার মধ্যে হাঙ্গেরীর স্মলিন গণহত্যা খুব প্রসিদ্ধ। স্মলিনের অধিবাসীরা ছিল খ্রিস্টান। পিটার দ্য হারমিট যখন সেখানে প্রবেশ করে তার বাহিনী অর্থের লোভে সেখানকার চার হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা করে। এটাই ছিল পবিত্র বা ক্রুসেড যুদ্ধের আসল চেহারা।

ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের সাথেও নানান অপকর্মে লিপ্ত হয়, যা দেখে অ্যালেক্সাস কমনেন অবাক হয়ে যায়। কারণ, সে বিশ্বাস করত যে, এরা তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করতে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য, তারা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্পদের উপর হামলে পড়ছে। তবে সে ছিল খুব ধূর্ত লোক। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রুসেডারদেরকে অবাধে অপকর্ম করার সুযোগ দেয়। কেননা, সে তাদেরকে যে কোনো মূল্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। এজন্য সামান্য ভর্ৎসনা করে তাদেরকে এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দেয়। সে তাদেরকে উপদেশ দেয় যুদ্ধে অভ্যস্ত প্রশিক্ষিত ক্রুসেডার বাহিনী আসার আগে তারা যেন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়।

এরা ছিল আনাড়ি। এদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কোনো জ্ঞানও ছিল এদের– না ধর্মের, না রাজনীতির, না অন্যকিছুর। এরা অ্যালেক্সাসের উপদেশে কান না দিয়ে আনাতোলিয়ায় এসে সালজুক সুলতান কিলিজ আরসালানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়। ক্রুসেডারদের এ দলে সর্বনিম্ন পরিসংখ্যান অনুসারেই ১ লাখ লোক ছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় তাদের সংখ্যা ৩ লাখ উল্লেখ করা

হয়েছে। এই বিশাল বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যেহেতু এরা যুদ্ধে একেবারে আনাড়ি ছিল এবং সালজুক বাহিনী সংখ্যায় কম হলেও যুদ্ধে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিল, এজন্য ক্রুসেডার বাহিনী সালজুকদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয়। যা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। কেননা, বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের নিয়মিত বাহিনীও তখন সালজুকদের সামনে দাঁড়ানোর সাহস পেত না। ক্রুসেডারদের পরিণতি এতটাই শোচনীয় হয় যে, তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ৩ হাজার লোক প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়। ক্ষুধায় জর্জড়িত অসভ্য ইউরোপ থেকে আগত অবশিষ্ট সবাই নিহত হয়। পিটার দ্য হারমিট ময়দান থেকে পলায়ন করে। যা প্রমাণ করে যে, আসলে সে ধর্মের স্বার্থে নয়; বরং দুনিয়া অর্জনের জন্য এসেছিল। সে পলায়ন করে, যাতে প্রশিক্ষিত নিয়মিত সৈন্যরা এলে তাদের নিয়ে আবার মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে এ শোচনীয় পরাজয়ের খবর পৌঁছলে সে এই বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডার হারানোর ঘটনায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং নিয়মিত সৈন্যদের সমবেত করতে শুরু করে। ইউরোপের পাঁচটি বাহিনী তখন সমবেত হয়।

প্রথম বাহিনী ছিল জুড লি লিবিয়ান ও তার ভাই বাল্ডউইন (Baldwin)-এর নেতৃত্বে। এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী। এই বাহিনী এসেছিল উত্তর ফ্রান্স থেকে। জার্মানদের একটি দল তাদের সহায়তায় ছিল। যেহেতু জার্মানির সাথে গীর্জার দ্বন্দ্ব ছিল, এজন্য এই ক্রুসেড যুদ্ধে তাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

দ্বিতীয় বাহিনী ছিল চতুর্থ র‍্যামন (Ramon IV)-এর নেতৃত্বে। সে এসেছিল ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল থেকে। তৃতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল নরম্যান্ডির রবার্ট (Robert of Normandie)। তারা পশ্চিম ফ্রান্স থেকে এসেছিল। ইংল্যান্ড থেকে আগত কিছু সৈন্যও তাদের সাথে যোগ দেয়।

চতুর্থ বাহিনী ছিল সেনাপতি হিউ (Hugh)-এর নেতৃত্বে। মধ্য ফ্রান্সের প্যারিস ডিস্ট্রিক ও তার আশপাশ থেকে গঠিত ছিল এই বাহিনী এবং একে তৎকালীন ফরাসি সম্রাটের সম্মানসূচক প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করা হত।

পঞ্চম ও সর্বশেষ বাহিনী ছিল দক্ষিণ ইতালি থেকে। জিসকার্ড (Giscard)-এর পুত্র বোহেমন্ড নরম্যান (Bohemond)-এর নেতৃত্বে আগত এ বাহিনীর নাম ছিল নরম্যান বাহিনী। এরা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের প্রখ্যাত রাজাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিভিন্ন সামরিক রণাঙ্গনে তাদের ছিল বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের বিশাল ইতিহাস। এগুলো ছিল তৎকালীন ইউরোপের সর্বাধিক শক্তিশালী বাহিনী। পঞ্চম বাহিনীতে বোহেমন্ড-এর ভাগ্নে (রোমান) টিংগার্ডও ছিলেন। সত্বর এই নামগুলো ক্রুসেডার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ইসলামী ভূখণ্ডে নিয়ে যাবে।

৪৯০ হিজরী মুতাবিক ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে পাঁচটি বাহিনী ফ্রান্স থেকে পর পর কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হয়। কোনোটি ভূমধ্য সাগরের পথ ধরে অগ্রসর হয়। কোনোটি স্থল পথে রওয়ানা হয়। আগস্ট মাসে সব বাহিনী মিলিত হবে বলে একমত হয়। কিছু কিছু পরিসংখ্যান বলে, এসব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। তাদের মধ্যে তিন লাখ ছিল যোদ্ধা। অবশিষ্টরা সাথে আসা নারী ও শিশু। যা প্রমাণ করে, যুদ্ধ শেষে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের আদৌ ছিল না; বরং তারা যাচ্ছিল সেখানে বসবাসের জন্য। ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইউরোপ থেকে আগত খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বদলে ফেলার জন্য। ঠিক তেমনই, যেমনটা তাদের পরবর্তীতে ইহুদীরা করেছে। এজন্য আমি বলি, আমাদের খুব ভালো করে ইতিহাস পাঠ করা দরকার।

এই বিরাট বাহিনী কনস্টান্টিনোপল পৌঁছানোর পর– এবং বায়যান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সাস কমনেন'র সাথে চেতনাগত, রাজনৈতিক ও সামরিক মতবিরোধের পর– মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এরা এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে।

উভয় বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অবস্থা তুলে ধরা আবশ্যক। যাতে আমরা ক্রুসেড যুদ্ধের আদ্যোপান্ত এবং কীভাবে তারা মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে শিকড় গেড়ে বসে, তা ভালো করে বুঝতে পারি।

তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব ছিল বহুধা বিভক্ত। মালিক শাহ ইবনে আল্প আরসালানের মৃত্যুর পরই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বন্ধন আলগা হয়ে যায় এবং মারাত্মক বিক্ষিপ্ততা দেখা দেয়।

সালজুক সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে একটি হল পশ্চিমভাগ। এটা ছিল শাম অঞ্চল। আর এই শামও আবার দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিরাতে বিভক্ত ছিল। দামেশক ছিল আলাদা এক আমিরাত। হিমস আলাদা আমিরাত। আলেপ্পো আলাদা আমিরাত। হামাত আলাদা আমিরাত। এমন কি এই ক্ষুদ্র হামাতের আমীরদের পরস্পরেও দ্বন্দ্ব ছিল।

আমরা আগেই দেখে এসেছি যে, ক্রুসেড যুদ্ধের আগে উবায়াদীদের আধিপত্যের ১০০ বছরে মিসরের কী অবস্থা ছিল! জিহাদী, ইসলামী বা শরয়ী– যেকোনো বিষয়ে আমরা তখন এক মহাশূন্যতা দেখতে পেয়েছি। ইসমাঈলী শিয়া আলেমরা সেখানে ভ্রান্ত মতাদর্শ, কুসংস্কার ও বেদআত ছড়িয়ে দেওয়ায় সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীও স্থবির হয়ে পড়েছিল। ইসলামী বিষয়াদি থেকে জনগণ ছিল বহু দূরে। এমনইভাবে ফিলিস্তিনও ছিল উবায়দীদের যাতনায় ক্লিষ্ট। যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শাম দেশকে আলেম-উলামা, দায়ী ও মুজাহিদ শূন্য করে ফেলা হয়েছিল। ফলে সেখানকার মানুষের ইসলামী শরীয়ত থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। ক্রুসেডারদের লড়াইয়ের আগে বছরকে বছর থেকে শামে যাকাত উসুল করা হত না। সেই সাথে গুনাহ-খাতা, অপচয় ও অনৈতিক ভোগ-বিলাস তো ছিলই। জিহাদের আমল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ সেখানে ছিল; কিন্তু আল্লাহর পথে ছিল না। বরং তা ছিল কর্তৃত্ব দখল ও ক্ষমতার লড়াই। ছিল রাজ্য সম্প্রসারণের লড়াই। যুদ্ধ কখনও সহোদর দুই আমীর ভাইয়ের মধ্যে সংঘটিত হত। ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ গৃহযুদ্ধগুলোর মধ্যে দামেশকের শাসক দুকাক ইবনু তুতুশ ও আলেপ্পোর শাসক রিদওয়ান ইবনু তুতুশের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ অন্যতম। তারা ছিলেন একই পিতার সন্তান। উভয়ই মহান সেনাপতি আল্প আরসালানের নাতি। তবে রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল হাড্ডাহাড্ডি দ্বন্দ্ব। এই

রিদওয়ান খবিস শুধু অত্যাচারী ও ফেতনাবাজই ছিল না; বরং সে ইসমাঈলী শিয়া মতবাদও গ্রহণ করেছিল। তবে সে মানুষের কাছে বলত, আমি শুধু মিসরের শাসকদের নিকটবর্তী হতেই ইসমাঈলী মতাদর্শ গ্রহণ করেছি।

এই অচল অবস্থা ক্রুসেডারদের ফিলিস্তিন প্রবেশকে সহজ করে দিয়েছিল। প্রথমে তারা এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। এশিয়া মাইনর তখন কিলিজ আরসালান সালজুক ও গাজী ইবনু দানিশমান্দ তুর্কীর মধ্যকার লড়াইয়ে জর্জড়িত হচ্ছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এশিয়া মাইনর তখন দুটি মুসলিম দলে বিভক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ছিল। মুসলিম বিশ্ব যখন এভাবে পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত এবং শরীয়ত থেকে দূরে সরে ছিল, তখন ক্রুসেডাররা উপস্থিত হয়। কতইনা সহজ ছিল সেই অনুপ্রবেশ! আর কতই না দীর্ঘ ছিল সেই আগ্রাসন!!

আল-কুদসের পথে ক্রুসেডার বাহিনী

আমরা আগে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পোপ দ্বিতীয় আরবান কর্তৃক রাজা-বাদশাহ, আঞ্চলিক শাসক, ধনী সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন দখল করে বাইতুল মুকাদ্দাস করায়ত্ব করার আহ্বান নিয়ে আলোচনা করেছি। এ আহ্বানে ইউরোপে এতটা সাড়া পড়েছিল যে, স্বয়ং পোপও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। সে-ও ধারণা করেনি, তার ডাকে মানুষ এতটা সাড়া দিবে!

আমরা পিটার দ্য হারমিট ও ওয়ালটার সান্স আভয়ার'র আভিযান নিয়েও আলোচনা করেছি, যে বাহিনীতে কৃষক, দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির মানুষ ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করেছিল। আনাতোলিয়ার শাসক সালজুক সুলতান কিলিজ আরসালানের হাতে যারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর আমরা ক্রুসেডারদের বৃহত্তম পাঁচ বাহিনীর প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, বড় এই পাঁচ বাহিনীর প্রত্যেকটির নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব এবং বিশেষত ফিলিস্তিনের কর্তৃত্ব। তাদের সুস্পষ্ট কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। বরং বিপরীতে অধর্মই তাদের থেকে বেশি প্রকাশ পায়। হাঙ্গেরী ও বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা তাদের জুলুমের শিকার হয়।

এই বাহিনী বিরাট সংখ্যক সদস্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বলা হয়, তাদের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। তাদের মধ্যে ৩ লাখ যোদ্ধা। আর অবশিষ্টরা নারী ও শিশু। যাতে তারা মুসলিম ভূখণ্ডে শিকড় গেড়ে

বসতে পারে এবং সেই ইউরোপে ফিরে যেতে না হয়, যা ছিল মূর্খতা, অভাব ও ক্ষুধার রাজ্য।

আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, ক্রুসেডারদের সাথে বায়যান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সাস কমনেন'র আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিবাদ দেখা দিয়েছিল। অথচ সে-ই তাদেরকে মুসলমানদের অঞ্চলে প্রবেশের জন্য আহ্বান করেছিল। কারণ, তার সামনে ব্যক্তিস্বার্থই ছিল বড়। এখানে একাধিক সেনাপতি ছিল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দূরভিসন্ধি ও লালসা ছিল। একজন বায়যান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সাস কমনেন। খ্রিস্টান বাহিনীগুলোর পাঁচজন কামাণ্ডার এবং ক্রুসেডার বাহিনীর দুইজন সহকারী কমান্ডার। মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠন নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা তৎকালীন শতধাবিভক্ত ইসলাম বিমুখ মুসলিম বিশ্বের করুণ চিত্রও পাঠক সমীপে তুলে ধরেছি। কর্তৃত্বের লড়াই এবং আলেমদের শূন্যতায় তৈরি হয়েছিল এ পরিস্থিতি। ফলে মুসলমানরা ক্রুসেডারদের খুব সহজ শিকারে পরিণত হয়।

ক্রুসেডার বাহিনী সর্বপ্রথম ৪৯০ হিজরী মুতাবিক ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তারা কিলিজ আরসালানকে খুব সহজে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। কেননা, কিলিজ আরসালান তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বরং তিনি তখন গাজী ইবনু দানেশমান্দ মুসলিমের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। আফসোসের বিষয়, মুসলমানদের এই পারস্পরিক লড়াই ক্রুসেডারদেরকে কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী কোনিয়ায় প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। সেখান থেকে কয়েক মাসের মধ্যে তারা শামের সীমান্ত আন্তাকিয়ায় প্রবেশ করে। এভাবে মুসলমানরা ইসলামী ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার প্রথম সীমান্ত হাতছাড়া করে।

ক্রুসেডাররা গুরুত্বপূর্ণ শহর আন্তাকিয়ায় প্রবেশ করে। এটা ঐতিহাসিক অঞ্চল, যেখানে খ্রিস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গীর্জা রয়েছে। ঈসা ইবনু মারইয়ামের আলোচনায় আমরা যে পাদ্রীর কথা উল্লেখ করেছিলাম, তার অবস্থানও এখানেই ছিল। ফলে স্থানটি খ্রিস্টানদের কাছে পবিত্র

ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হত। উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের শাম বিজয়ের আগে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের কাছেও এর বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। এরপর দীর্ঘ সময় মুসলমানরা এই শহর শাসন করেন। এ অঞ্চলে ইসলামী শাসনেরও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ইউরোপ থেকে আগত ক্রুসেডার বাহিনীও আন্তাকিয়া শহরের প্রতি লালায়িত ছিল। বিশেষ করে ইতালিয়ান বাহিনীর সেনাপতি বোহেমন্ড নরম্যান। আন্তাকিয়ায় তার নিজের কিছু স্মৃতি ছিল। আগে তার পিতা জুসকার তার শাসনামলে আন্তাকিয়া দখলের চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ব্যর্থ হয়। এখন ইয়াগসিয়ান নামক এক তুর্কী মুসলিমের নেতৃত্বে এই শহরের প্রতিরোধ করছে মুসলিম শাসকশ্রেণি। তার সামনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কোনো আবেদন ছিল না। তবে তিনি এই শহরের কর্তৃত্ব হেফাযত করতে চাইছিলেন।

এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, তৎকালীন বেশিরভাগ মুসলিম শক্তির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট অ্যালেক্সাস কমনেন ও ইউরোপীয় পাঁচ সেনাপতি আন্তাকিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। তাদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব স্বার্থ ও স্বপ্ন।

এমন সময় তাদের একজন মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যায়। সে হচ্ছে বাল্ডউইন। সে ছিল উত্তর ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি থেকে আগত প্রথম বাহিনীর সেনাপতি গডফ্রে-এর ভাই ও প্রতিনিধি। বাল্ডউইন পৃথক হওয়ার সময় সাথে কিছু সৈন্য নিয়ে যায়। আন্তাকিয়া থেকে দূরে পূর্ব দিকের একটি অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হয় সে। অঞ্চলটির তৎকালীন নাম ছিল রুহা। পরবর্তীতে জানা যায় যে, এক আর্মেনিয়ান তাকে এ অঞ্চলে নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ফুসলিয়েছিল। এজন্য সে আল-কুদসের কথা বাদ দিয়ে নিজের বাহিনী নিয়ে নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়। তার প্রতিষ্ঠিত এ রাজত্বের নাম ছিল রুহা আমিরাত (Counrty of Edessa)। এটা ছিল ইসলামী ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম আরিমাত। তুরস্কের দক্ষিণে এবং সিরিয়া ও ইরাকের উত্তরে এই আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তাকিয়া শহরের প্রাচীরের সামনে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। শুধু মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে নয়; বরং খ্রিস্টানদের পরস্পরের মধ্যেও। প্রত্যেকেই এখানকার কর্তৃত্ব নিজে দখল করতে চাচ্ছিল। প্রায় সাত মাস পর্যন্ত আন্তাকিয়া শহর অবরোধ করে রাখা হয়। আফসোসের বিষয়, এ দীর্ঘ সময়ে আন্তাকিয়া শহর রক্ষায় কোনো ইসলামী বাহিনী এগিয়ে আসেনি। তবে সপ্তম মাসে ইরাকের উত্তরাঞ্চল থেকে দুর্বল একটি বাহিনী তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। কারবুগা নামের এক তুর্কী ছিলেন তাদের সেনাপতি। তবে এই বাহিনী ক্রুসেডারদের সম্মুখে টিকতে পারেনি। ফলে এই যুদ্ধে ক্রুসেডারদের জয় হয়। আন্তাকিয়া শহর ক্রুসেডারদের পদতলে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় ক্রুসেডাররা আন্তাকিয়ার নিরাপরাধ জনগণের উপর এক ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালায়। নারী, পুরুষ ও শিশু সবাই এ হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। এভাবে মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় ক্রুসেড রাজ্য হিসাবে আন্তাকিয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে রাজত্বের কর্তৃত্ব নিয়ে ক্রুসেডারদের মধ্যে তুমুল বিবাদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে ইতালিয়ান বাহিনীর সেনাপতি বোহেমন্ড নরম্যান বিজয়ী হয়। তার বাহিনী ছিল ক্রুসেডারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। সে হুমকি দেয়, যদি তাকে আন্তাকিয়ার কর্তৃত্ব না দেওয়া হয়, তা হলে ইতালি ফিরে যাবে। আল-কুদস, ফিলিস্তিন ও ধর্মীয় স্বপ্নের কোনো তোয়াক্কা করবে না। যাই হোক, এই বাহিনী আন্তাকিয়ায় থেকে যায়। আর আল-কুদস দখলের দায়িত্ব অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যান্য অঞ্চলে আমিরাত প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলতে থাকে। আরও সাত মাস অতিবাহিত হয়। তারা আল-কুদস অভিমুখে যাত্রা করতে দ্বিধায় লিপ্ত থাকে। কেননা, সম্পদ ও বিরাট ধনভাণ্ডার এবং বিশেষত ইউরোপে দুষ্প্রাপ্য সভ্যতা আর সম্ভাবনা দেখে পথিমধ্যেই তারা নিজস্ব আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এজন্য যেসব জায়গা দিয়ে তারা অতিবাহিত হয় এবং যার উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে, সবখানে আধিপত্য বিস্তারে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বহু বিবাদও সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আগত দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতি চতুর্থ রেমন ছিল এই বিবাদের নেতৃত্বে। সে নিজেকে সবচেয়ে বেশি ধার্মিক এবং ক্রুশ ও যীশুর সবচেয়ে বড় ভক্ত বলে দাবি করত। প্রত্যেক যুদ্ধে সে ক্রুশ উত্তোলন করত। নিজেকে পোপের মুখপাত্র মনে করত। তবে শেষে প্রমাণিত হত যে, তার কাছে নিজের স্বার্থই অগ্রগণ্য। তার ও তার বাহিনীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো চিন্তা তার নেই।

এক পর্যায়ে আন্তাকিয়ার নিকটবর্তী মাআররাতুন নুমান (Maarat al-Numan) শহর অবরোধ করা হয়। ক্রুসেডাররা শহরবাসীকে ফটক খুলে দেওয়ার শর্তে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। শহরবাসী ফটক খুলে দিলে ক্রুসেডাররা প্রবেশ করেই সেখানে গণহত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করে। শহরের বেশিরভাগ অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। ক্রুসেডাররা যে শহরেই প্রবেশ করত, সেখানেই তারা এই কাণ্ড করত। মাআররাতুন নুমান শহরের নেতৃত্ব নিয়ে আবার ক্রুসেডারদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এই বিবাদের কারণে ক্রুসেডার বাহিনী আল-কুদসে গমনের সিদ্ধান্তই মুলতবি করে।

এরপর আবার অগ্রসর হয়ে তরাবলুস শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে তারা থামে। চতুর্থ রেমন এ শহর দেখে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। এ শহর দখলের জন্য সে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক মাস অবরোধ করে রেখেও তরাবলুস প্রবেশে ব্যর্থ হয় সে। এরপর আবার ক্রুসেড বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। চতুর্থ রেমন ক্রুশ উত্তোলন করে এবং খালি পায়ে তীর্থযাত্রীদের পোষাক পরে ক্রুসেডারদের সাথে আল-কুদস অভিমুখে রওয়ানা হয়। এতে বিবাদ মিটে যায়। তবে তারা তরাবলুস জয় করতে ব্যর্থ হয়।

এখানে আমি বলতে চাই যে, ক্রুসেডার বাহিনীর ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশের পর এপর্যন্ত আসতে অনেকগুলো মাস– অর্থাৎ প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। আন্তাকিয়া অবরোধের সাত মাসে তাদের প্রচুর সৈন্য ক্ষয় হয়। এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের বহু সৈন্য নিহত হয়। শাম আসার পথে এশিয়া মাইনরের পর্বতমালা পার হতে গিয়ে ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা যায় বহু সৈন্য। তাছাড়া ক্রুসেডারদের বড়

একটি অংশ পিছনে থেকে যায়। অনেকে থেকে যায় রুহা আমিরাতে বাল্ডউইনের সাথে এবং অনেকে আবার আন্তাকিয়া আমিরাতে বোহেমন্ড নরম্যানের সাথে। ফলে আন্তাকিয়া থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসগামী সৈন্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৮০ হাজার।

আমরা তিন লাখ যোদ্ধার কথা উল্লেখ করেছিলাম। তাদের মধ্য থেকে দুই লাখ ২০ হাজার সৈন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল। কেউ মারা গিয়েছিল। কেউ নিহত হয়েছিল। কেউ কেউ রুহা ও আন্তাকিয়া আমিরাতে রয়ে গিয়েছিল। ফলে শুধু ৮০ হাজার সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। এটা সর্বোচ্চ অভিমত। অনেক বর্ণনায় তাদের সংখ্যা ৬০ হাজারেরও কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, এমন ক্ষুদ্র একটি সংখ্যা ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তর হয়ে এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার আন্তাকিয়া থেকে শুরু। যা শামের সর্বাধিক দূরবর্তী ভূখণ্ড। সেখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস। তাদের তো সমগ্র সিরিয়া, সমগ্র লেবানন ও ফিলিস্তিনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মধ্য ফিলিস্তিনে অবস্থিত আল-কুদসে পৌঁছতে হয়েছিল। ইসলামী বাহিনীর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই কীভাবে তারা এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়? এটা সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষ করে সে সময় অত্যাধুনিক বোমা, সাজোয়া যান ও ট্যাংক ছিল না। পুরো যুদ্ধই ছিল তলোয়ার নির্ভর। পথিমধ্যে মুসলিম জানসাধারণও যদি তাদের দিকে ধেয়ে আসত, তা হলে দাঁত দিয়ে চিবিয়েই তাদেরকে শেষ করে দিতে পারত।

সুবহানাল্লাহ! আসলে আলেম, ফকীহ ও ইসলামী শিক্ষার অভাবে এবং ব্যাপক গুনাহ ও পাপাচারের দরুণ তখন মানুষের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ সবকিছু ক্রুসেডারদের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। ক্রুসেডার বাহিনী যখন সিরিয়ার অন্যতম শহর সিযার অতিক্রম করছিল, তখন সেখানকার শাসক ক্রুসেডারদের অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের জন্য পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেন। যাতে তার পথপ্রদর্শকরা ক্রুসেড বাহিনীকে ইসলামী ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে আল-কুদসের পথে নিয়ে যায়। তরাবলুস শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম

করার সময় তারা কয়েক মাস শহরটি অবরোধ করে রাখে। এরপর কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তারা ক্রুসেডারদেরকে জিযিয়া প্রদানে রাজি হয়ে যায়। কারণ, তাদের অন্তরে প্রচণ্ডরকমে ক্রুসেডারদের ভয় প্রবেশ করেছিল। বৈরুত ও আক্কা'র শাসকরা ক্রুসেডারদের হাদিয়া প্রেরণ করেন। ক্রুসেডার বাহিনীকে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করেন, যাতে ক্রুসেডাররা তাদের রাজ্যের দিকে না তাকায়। এমনকি ক্রুসেডার বাহিনীর গতিপথ থেকে বহু দূরে অবস্থিত দামেশক ও আলেপ্পোর মত আমিরাতগুলোও হাদিয়া প্রেরণের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। তাদের ভয় ছিল যদি ক্রুসেডাররা গতি পরিবর্তন করে তাদের রাজ্যের দিকে ধেয়ে যায়, তা হলে কী হবে?

আল্লাহর কসম! এসব কর্মকাণ্ড ছিল তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের হীনতা ও নীচতার পরিচায়ক। এমনকি মুসলিম জনসাধারণও লাঞ্ছনার বাইরে ছিল না। আমি মুসলিম জনতার হীনতা দেখে যেমন বিস্মিত, তেমনই ক্রুসেডারদের সাহস দেখেও অবাক হই। মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে কোনো বাঁধা ও প্রতিরোধ ছাড়াই তারা কীভাবে ইসলামী বিশ্বের উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে আসে? কোনো ইসলামী বাহিনী বা মুসলিম জনগোষ্ঠীই তাদের বাঁধা দিল না? অন্তত পেছন থেকেও কেউ আঘাত হানল না। ইসলামী বিশ্বে প্রবেশ করার পরই তাদের কাছে সাহায্য আসার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্যারিস, লন্ডন ও জার্মানি ছিল তাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। ক্রুসেডার বাহিনী আর ওইসব শহরের মধ্যে ছিল বহু পাহাড়-পর্বত ও সাগরের অন্তরায়। আর ইসলামী বিশ্বে তাদের যে দুটি আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারাও ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার মত অবস্থানে ছিল না। কেননা, তাদের প্রধান কাজ ছিল নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

তা হলে কীভাবে ক্রুসেডার বাহিনী সমগ্র ইসলামী বিশ্ব মাড়াতে সাহস করে? প্রিয় পাঠক! আমি এ প্রশ্ন নিয়ে হতভম্ব ছিলাম; কিন্তু হাবীবে মুস্তফা ﷺ-এর হাদীসে এর উত্তর পেয়ে যাই। তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে এ পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

অনতিদূরে সব বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকাডাকি করবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকাডাকি করে। একজন বলল, আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব? তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গাতাড়িত আবর্জনার মত (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বুক থেকে তোমাদের ভয় তুলে নিবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে ওয়াহান সঞ্চার করবেন। একজন বলল, ওয়াহান কী? তিনি বললেন, বেঁচে থাকার আগ্রহ, আর মরতে না চাওয়া। [আহমাদ: ২২৩৯৭]

ইসলামের শত্রুরা একে অপরকে ডাকবে– মানে ফ্রান্স থেকে, জার্মানি থেকে, ইংল্যান্ড থেকে...। এমনকি তারা স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ডেনমার্কের মত দূরবর্তী দেশ থেকেও ছুটে এসেছিল। যেভাবে ভোজনকারী ভোজনপাত্রের দিকে ডাকাডাকি করে। অর্থাৎ যেমন মানুষ একপাত্র থেকে খায়, তেমনই সব বিজাতি মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করে নিতে একযোগে ছুটে আসবে।

সাহাবীগণ জানতে চান, ইয়া রসুলাল্লাহ! সংখ্যায় কম হওয়ার দরুণ কি আমাদের এ অবস্থা হবে? তিনি উত্তর দেন, বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। তবে তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত।

এসব অঞ্চলে মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিম বিদ্যমান ছিল। এখানকার অঞ্চলগুলো এমনিতেই অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। দীর্ঘ সময় এসব অঞ্চল উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী ও ইসলামের দূর্গ ছিল। আলেপ্পো, দামেশক, লেবানন ও ফিলিস্তিনে মুসলমানরাই বাস করত। তারপরও কীভাবে এই ঘনত্ব ভেদ করা যায়?

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দেওয়া হবে।

এই উত্তরই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। অর্থাৎ শত্রুদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় ও প্রভাব উঠে যাবে। এজন্য তারা মুসলমানদের

বিশাল জনসংখ্যা দেখেও নগণ্য মনে করবে। দুর্গ-প্রাচীর দেখে কোনো তোয়াক্কা করবে না। মুসলিম বিশ্বের পেট চিরে শামের রক্ত, ফিলিস্তিনের রক্ত– 'আল-কুদস' পৌঁছে যাবে। তাও এই দীর্ঘ পথচলায় একটি বারের জন্যও কোনো শক্তির প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে। কেননা, তখন মুসলমানদের অন্তরে সঞ্চার করে দেওয়া হবে 'ওয়াহান'। সাহাবীরা বলেন,' ওয়াহান কী? তিনি বলেন, বেঁচে থাকার আগ্রহ এবং মরতে না চাওয়া।

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের এটাই ছিল সমস্যা। তারা দুনিয়ার মোহে পড়েছিলেন এবং আল্লাহর পথে মরতে রাজি ছিলেন না। এটাই ক্রুসেডার বাহিনীকে নিরাপত্তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় এবং পবিত্র শহর আল-কুদস অবরোধ করার সুযোগ করে দেয়।

৭ জুন ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দ, (৪৯২ হিজরীতে) ক্রুসেডার বাহিনী আল-কুদস পৌঁছে। স্বাভাবিকভাবে খ্রিস্টানদের রচিত গ্রন্থাবলীতে রবের পবিত্র ভূখণ্ডে আগমনের পর ক্রুসেডার বাহিনীর এক আবেগঘন অনুভূতির কথা তুলে ধরে। কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী। কারণ, মুহূর্তের জন্যও তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিনয় ছিল না। পবিত্র কোনো অনুভূতিও না। এমনকি ধর্মীয় মানদণ্ডে তাদের কোনো বিবেচনাও ছিল না। তাদের খাহেশ ছিল শুধু সম্পদ লুণ্ঠন এবং মুসলমানদের উপর নৈরাজ্য চালানো। এজন্য পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত তারা আল-কুদস শহরে অনবরত অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু তারপরও কোনো বাহিনী এই মহান শহরের পবিত্রতা রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। অবশেষে ১৫ জুন, ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দ, মুতাবিক ২০ শাবান ৪৯২ হিজরীতে আল-কুদসের পতন ঘটে এবং মানব-ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা বাস্তবায়নের জন্য ক্রুসেডার বাহিনী প্রবেশ করে। আফসোস! মানুষের তখন প্রতিরোধের কোনো শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। এজন্য সবাই গিয়ে মসজিদে আকসায় আশ্রয় নেয়। তাদের ধারণা ছিল, ওটা যেহেতু পবিত্র স্থান, এজন্য ক্রুসেডাররা তাকে সম্মান করবে। কিন্তু এদের কাছে কোনো ওয়াদাও ছিল না; কোনো আস্থাও ছিল না। ক্রুসেডাররা ঘোড়ায় চড়েই মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই

করে। এরপর খিস্টানদের পতাকা উড়িয়ে দেয় এবং আল-কিয়ামাহ গীর্জায় গিয়ে ঈশ্বরের শুকরিয়ামূলক উপাসনা সম্পন্ন করে। কেননা, তিনি তাদেরকে মুসলমানদের পদানত করার সামর্থ্য দিয়েছেন।

আসুন জেনে নিই, এই তিক্ত কাহিনীর পর ফিলিস্তিনের ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে মোড় নেয়?

ফিলিস্তিনের জনগণের সাথে ক্রুসেডাররা কী আচরণ করতে থাকে?

মুসলমানদের পরবর্তী পদক্ষেপই বা কী ছিল?

ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ

আমরা মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনী জনগণের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি ক্রুসেড লড়াই নিয়েও। কীভাবে তারা ৪৯০ হিজরীতে দক্ষিণ তুরস্কে (ইরাক ও সিরিয়ার উত্তরে) রুহা আমিরাত গড়ে তোলে এবং উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার আন্তাকিয়ায় আমিরাত প্রতিষ্ঠা করে, সে বিবরণও পেশ করেছি। ইসলামী প্রতিরোধ না থাকায় তারা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে এবং পৌঁছল এবং আল-কুদস অবরোধ করতে সক্ষম হয়। ইসলামী বাহিনী এখানে ওখানে বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত ছিল। বরং উল্টো সুযোগ করে দিতে, নির্দেশনা দিতে এবং পথ বাতলে দিয়ে আন্তাকিয়া থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেখেছি। এসবই ছিল ক্রুসেডারদের সাথে লড়াইয়ে জড়ানো থেকে বাঁচার জন্য। এ ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য মারাত্মক লাঞ্ছনা ও অপমান। এতে ক্রুসেডারদের পথ উন্মুক্ত হয় এবং তারা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে। ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যায় লিপ্ত হয় তারা। এবং এক দিনেই ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে।

যেদিন তারা আল-কুদসে প্রবেশ করে, সেদিন আল-কুদসের কর্তৃত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। আর স্বাভাবিকভাবে এটা রুহা ও আন্তাকিয়ার বিবাদের চেয়ে অনেক গুরুতর ছিল। কেননা, আল-কুদস খ্রিস্টানদের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। সব ধর্মেরই এটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। নিঃসন্দেহে মক্কা ও মদীনা মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে মহান। কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা এ শহর দুটিকে সম্মান করে

না। তবে আল-কুদসের সম্মান রয়েছে সমস্ত ধর্মে। মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিস্টান সবাই আল-কুদসকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি এই শহরের শাসক নিযুক্ত হন, স্বাভাবিকভাবে পুরো দুনিয়ায় তার বিশেষ অবস্থান সৃষ্টি হয়। শুধু খ্রিস্টানদের কাছেই নয়।

এজন্য তারা আল-কুদসের কর্তৃত্ব নিয়ে চরম বিবাদে লিপ্ত হয়। অবশেষে গডফ্রের হাতে আল-কুদসের শাসন ক্ষমতা আসে, যে ছিল উত্তর ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি থেকে আগত সবচেয়ে বড় ফরাসি বাহিনীর সেনাপতি।

অপর দিকে পোপ দ্বিতীয় আরবান– যে এই বিশাল জনতাকে মাঠে নামিয়েছিল– সে ক্রুসেডার বাহিনীর বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের আগেই মারা গিয়েছিল। তার পরে আরেক ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার নাম পোপ দ্বিতীয় পাশকাল (Pope Paschal II)। সে তখনও অতটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি যে, আল-কুদসের কর্তৃত্ব নিয়ে গডফ্রের সাথে দ্বন্দ্ব করবে।

এখানে গডফ্রে একটি প্রহসনের আশ্রয় নেয়, যাতে সবাইকে সে সন্তুষ্ট করতে পারে। সে প্রকাশ করতে থাকে যে, সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি। শুধু ক্রুশ ও যীশুর জন্য তার এখানে আসা। সে নিজের নাম রাখে 'বাইতুল মুকাদ্দাসের রক্ষক'। স্বর্ণের মুকুট পরতে অস্বীকার করে। কাঁটার তৈরি একটি মুকুট পরিধান করে। জনসম্মুখে সে বলে, আমি সেই শহরে স্বর্ণের মুকুট কিছুতেই পরব না, যেখানে মাসীহ কাঁটার মুকুট পরিধান করেছিলেন।

এই প্রহসন বেশিরভাগ ইতিহাসবিদকে প্রভাবিত করে। অমুসলিম ইতিহাসবিদদের কথা বলছি না; মুসলিম ইতিহাসবিদরাও এই নাটকে প্রভাবিত হয়েছেন। অমুসলিম ইতিহাসবিদরা যে ইতিহাস বিকৃত করেন, সেকথা সবাই জানে। আর বিজয়ীরাই ইতিহাস সংকলন করেন, সেও জানা কথা। কিন্তু মুসলমানরা কীভাবে বর্ণনা করেন যে, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কারণে এই লোককে খ্রিস্টানরা মনোনীত করেছিল। ইসলামী বিভিন্ন রেফারেন্সে এই তথ্য লেখা আছে। চিন্তা করুন, তার ব্যাপারে এমন কথা লেখা হচ্ছে, অথচ গতকালই সে

মসজিদে আকসায় ৭০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে। বিষয়টি মুসলিম ইতিহাসবিদদের একেবারেই বিবেচনা না থাকার প্রমাণ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের উচিত ইসলামের ইতিহাস নতুন করে ঢেলে সাজানো।

গডফ্রে ইহুদীদের জ্বালিয়ে দেয়। উমারী চুক্তিনামার ভিত্তিতে ইহুদীরা তখন আল-কুদসে বসবাস করত না। তবে তারা এখানে আসত। কেননা, এটা তাদের কাছে পবিত্র স্থান। সে আগত সব ইহুদীকে গীর্জায় সমবেত করে এবং লোকজনসহ গীর্জা জ্বালিয়ে দেয়। এখানে সেই বর্ণবাদী যুদ্ধ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যেটা খ্রিস্টানরা তাদের যেকোনো প্রতিপক্ষের সাথে অনুশীলন করত। যেমন, আমরা আগে দেখে এসেছি যে, তারা কীভাবে অর্থোডক্স খ্রিস্টানদেরকে হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে। এবং কীভাবে তারা ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালিয়েছে।

গডফ্রে চাইছিল পুরো ফিলিস্তিনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। এজন্য সে রাজ্য সম্প্রসারণ করতে থাকে। কিন্তু তার সামরিক শক্তি ছিল দুর্বল। তার বাহিনী ছিল কমজোর, যেখানে সেখানে অভিযান চালাতে সক্ষম ছিল না। এজন্য আল-কুদসে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে সে আল-কুদসের আশ-পাশের শহরগুলো দখল শুরু করে। একে একে দখল করে ইয়াফা, লুদ, রামাল্লা, নাবলুস, বাইসান ও তাবারিয়া। তবে সমস্ত শহর দখলে সে সক্ষম ছিল না। কেননা, কোনো কোনো শহর ছিল শক্তিশালী। কোনো কোনো শহর তখনও উবায়দী সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যেমন, আসকালান ও আক্কা। কাজেই সে এসব শহরের সাথে পুরনো রাজনীতি নতুন করে ব্যবহার করে। এই কথাটা ভালো করে শুনুন; মন দিয়ে ভাবুন, যাতে বুঝতে পারেন যে, কীভাবে আমাদের শত্রুরা মুসলিম বিশ্বের সাথে লড়ে; কীভাবে এমন পরিস্থিতি বার বার সৃষ্টি হয়। কারণ একটি, আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি না।

গডফ্রে সিদ্ধান্ত নেয়, যেসব শহর সে বল প্রয়োগ করে দখল করতে পারেনি, সেগুলোর সাথে শান্তিচুক্তি করবে। এসব ফিলিস্তিনী শহরের সাথে সে একরকম শান্তিচুক্তি করে ফেলে, যদিও তার অধীনে আল-কুদসসহ একাধিক শহর ছিল। আরসুফ, আক্কা, কায়সারিয়া ও

আসকালানের সাথে তার শান্তিচুক্তি হয়ে যায়। দেখুন, এই গুন্ডা এই সন্ধির মাধ্যমে কী আদায় করে নেয়!

এ সন্ধির মাধ্যমে সে মুসলমানদের থেকে খ্রিস্টান বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের স্বীকৃতি আদায় করে। হয়তো এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অর্জন। এ সন্ধি প্রকারান্তরে এই অর্থই প্রকাশ করছিল যে, আমরা তাকে আল-কুদসের শাসক হিসাবে মেনে নিলাম। বিনিময়ে তিনি আমাদেরকে আসকালান, কায়সারিয়া বা অন্য কোনো শহরের শাসকহিসাবে মেনে নিবেন। অথচ একই সময়ে গডফ্রের এমন কিছু মানুষ ও শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল, যারা তাকে সামরিক দূর্গ নির্মাণ করে দিবে। চাষের জমিগুলো আবাদ করবে। আর স্বাভাবিকভাবে তার এই প্রয়োজন ছিল সীমিত সময়ের জন্য, অর্থাৎ ইউরোপ থেকে তার জন্য সাহায্য আসা পর্যন্ত। ইউরোপের সাহায্য এলেই এসব সন্ধি তিনি অকার্যকর করে দিবে। আর এই সময়ে সে ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক তৎপরতা শুরু করতে চায়। অথচ তখনও সে নৌবহরের অধিকারী নয়। তৎকালীন ফরাসি নৌবহর ছিল খুব দুর্বল। তখন ভূমধ্য সাগরে সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহর ছিল ইতালির, যা ছিল জেনেওয়া, পিসা ও ফিনিশিয়া থেকে গঠিত। সেগুলোও সামরিক নৌবহর ছিল না; বরং ছিল বাণিজ্যিক। তারা গডফ্রে-কে কোনো সাহায্য করবে না, যদি এখানে সম্পদ না থাকে। গডফ্রে তাদেরকে শামদেশে আমন্ত্রণ জানায়। তারা বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী ফিলিস্তিনে এনে বিক্রি করবে এবং বিনিময়ে তার জন্য ইউরোপ থেকে অনবরত সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ করবে।

আর সুকৌশলে সে ফিলিস্তিনী সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়। কিছু মানুষ শান্তিচুক্তি সমর্থন করে। কিছু মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে ফিলিস্তিনীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। একই শহরে ভাইয়েরা আপসে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সবার আগে লাভবান হয় আল-কুদসের ক্রুসেডার বাহিনী।

চুক্তি শত্রুতার প্রাণ নিষ্প্রভ করে দিবে। কেননা, আল-কুদসে যারা রয়েছে তারা তো বন্ধু। তাদের সাথে রয়েছে শান্তিচুক্তি। কয়েক বছর পর আমরা ভুলে যাব। ক্রুসেডার রাষ্ট্র তখন বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

আসকালানের সাথে তার মিত্রতা; কায়সারিয়ার সাথে তার মিত্রতা। মুসলমানদের মস্তিষ্ক থেকে বিষয়টি বেরিয়েও যাবে, আবার সেই ফাঁকে সুস্তিতে প্রস্তুতিও সম্পন্ন করা যাবে। ভেবে দেখুন, এই চুক্তিতে মুসলমানদের কতটা লাঞ্ছনা ও অপমান নিহিত ছিল? গডফ্রে মুসলমানদের উপর জিযিয়াও আরোপ করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা শান্তিচুক্তিতে একমত হয়। অনেকে জমি, সম্মান ও দেশও বিক্রি করে দেয়। গডফ্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং ফিলিস্তিনের অংশবিশেষ বিক্রি করে দেয়। আর এ সবই ছিল সাময়িক। গডফ্রের শক্তি পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তখন সে পুরো ফিলিস্তিন দখল করবে।

যখন গডফ্রের কাছে ইউরোপীয় সাহায্য পৌঁছতে শুরু করে, তখন সে আল-কুদস থেকে এবং শান্তিচুক্তি থেকে বাইরে যাওয়া শুরু করে। ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকে। এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বরং ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। যারা ইহুদী-খ্রিস্টানদের খিয়ানাতকে অস্বাভাবিক মনে করেন, তারা আসলে আল্লাহর কিতাবই অধ্যয়ন করেনি।

আল্লাহ ﷻ সম্মানিত কিতাবে বলেন—

> যখনই তারা কোনো অঙ্গীকার করে, তাদের একটি দল তা ভঙ্গ করে। বরং তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। [সুরা বাকারা : ১০০]

আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য ইতিহাস, ভবিষ্যৎ ও চলমান বাস্তবতা তুলে ধরছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে না, তার নিজেকে দোষারোপ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সে নিজেই নিজেকে সমস্যার সম্মুখীন করে। সে গর্ত দেখে এবং নিজের ইচ্ছায় সেখানে পতিত হয়। নিঃসন্দেহে এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহর দীন থেকে কঠিন দূরত্বের প্রমাণ বহন করে।

যেই গডফ্রে আন্তাকিয়া থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে একাধিকবার মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, সে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার পর অঙ্গীকার রক্ষা করবে বলে মুসলমানরা কীভাবে বিশ্বাস করে?

এ সময় মুসলমানরা একদিনের জন্য হলেও বেশি বাঁচার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

> তুমি অবশ্যই তাদেরকে মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশি লোভী পাবে। এমনকি মুশরিকদের থেকেও। তারা প্রত্যেকে কামনা করে যদি সে হাজার বছর হায়াত পেত! অথচ দীর্ঘ আয়ু দিয়ে সে নিজেকে শাস্তি থেকে দূরে সরাতে পারবে না। তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ দেখেন। [সুরা বাকারা : ৯৬]

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল ইহুদীদের ব্যাপারে এবং ওই সব মানুষের ব্যাপারে, যাদের মধ্যে ইহুদীদের স্বভাব-চরিত্র বিদ্যমান। তাদের জন্যও রয়েছে ইহুদীদের মতই শাস্তি– লাঞ্ছনা ও অপমান। ইতিহাসের এই দুঃখজনক সময়ে মুসলমানদের উপরও সেই লাঞ্ছনা ও অপমান চেপে বসেছিল।

এখানে আমি শুধু তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও সেনাপতিদের দোষারোপ করছি না; বরং আমার তিরস্কার ওইসব আলেমদের প্রতিও, যারা ওই সময় বিদ্যমান ছিলেন। ৪৬৩ হিজরীতে উবায়দীদের দখলদারিত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪৯০ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর। এ সময় সুন্নী আলেমগণও ছিলেন। তারা কেন তৎপর হলেন না?

আপনি ইবনু আসাকিরের তারিখু দিমাশক কিতাবে কিছু বর্ণনা পাবেন। তিনি বলেন, তৎকালীন আলেমগণ জীবনের ভয়ে হক কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দামেশকের শাসক দুকাক ইবনু তুতুশ ও আলেপ্পোর শাসক রিদওয়ান ইবনু তুতুশ ছিলেন ফেতনাবাজ জালেম শাসক। ফলে সমস্ত আলেম নিজেদের জীবন ও কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে হক কথা বলা থেকে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। যখন মূর্খ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে; আর আলেম থাকে নিশ্চুপ, তখন মানুষ শিখবে কীভাবে? এজন্য আমি শুধু শাসকদের দোষ দিচ্ছি না; তৎকালীন আলেমদেরকেও দুষছি। একই সাথে সেই জনগোষ্ঠীও দায়ী, যারা এমন শাসক ও আলেমদের নিয়েই তৃপ্ত ছিল। যে জাতি শুধু বেঁচে থাকার রুটির জন্যই লড়াই করে, সে জাতি বেঁচে থাকার অধিকারও রাখে না। বেঁচে থাকার প্রকৃত অধিকার তো সেই জাতির থাকে, যারা নিজেদের

আকিদা, দীন, ভূখণ্ড ও সম্মানের জন্য লড়াই করে। ক্রুসেড যুদ্ধে আমরা এমন কাউকেও দেখি না, যে নিজেকে রক্ষার্থে তৎপর হয়েছিল। বছরের পর বছর আমরা শুধু নত হতে আর বশ্যতা স্বীকার করতে দেখি। যদ্দরুণ মুসলিম বিশ্ব ক্রুসেডারদের আধিপত্যে চলে যায়।

এ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে তিনটি ক্রুসেড আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়– ৪৯০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় রুহা আমিরাত। ৪৯১ হিজরীতে আন্তাকিয়া আমিরাত। ৪৯২ হিজরীতে বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাত। এর ১১ বছর পর ৫০৩ হিজরীতে তরাবলুস ও তার আশপাশের কিছু লেবানিজ শহর মিলে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও একটি আমিরাত। ক্রুসেড যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এ সব আমিরাত টিকে ছিল।

এ অধঃপতনের পরও আমাদের জিজ্ঞাসা– এখানে কোনো আশার আলো আছে কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।

আশার আলো কেন থাকবে না! রসুল ﷺ বলেছেন–

> আমার উম্মাতের একটি দল সবসময় সত্যের উপর অবিচল থাকবে। তারা হবে বিজয়ী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [মুসলিম : ৫০৫৯]

তাই নিঃসন্দেহে এখানেও মুমিনদের এমন একটি দল বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যারা শুধু আল্লাহর রহমত আশা করেন; তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অনুসন্ধান করেন এবং জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু ভয় করেন না। তবে আমরা তাদেরকে ওই সময়ে ফিলিস্তিন, শাম ও মিসরের ভূখণ্ডে দেখতে পাইনি। বরং তারা আসেন উত্তর ইরাক থেকে। যা আমাদের কাহিনীর ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে। সেখানে ক্রুসেডার বাহিনী প্রবেশ করেনি। তবে এ ছিল আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। এ অঞ্চল থেকেই জ্বলে ওঠে সেই নুর, যা পরবর্তীতে শামের ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের অন্ধকার দূর করে দেয়।

ক্রুসেড যুদ্ধের সংকটে উত্তর ইরাক আমাদেরকে একের পর এক বহু জিহাদী তৎপরতা পেশ করেছিল। কিন্তু বিষয়টি উত্তর ইরাক থেকেই কেন?

এর জওয়াব জানতে আমাদেরকে ৫০ বছর পিছনের ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সেই নামগুলো স্মরণ করতে হবে, যেগুলো আমরা আগে উল্লেখ করেছি। স্মরণ করতে হবে আল্প আরসালানের কথা। মালিক শাহ ইবনু আল্প আরসালানের কথা। মুসলিম বিশ্বের প্রাচ্যে তাদের ৩০ বছরের শাসন ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, জিহাদ, তাকওয়া, সালাত, সিয়াম, কিয়াম ও তিলাওয়াত ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। মহান উজির নিযামুল মুলক তুসী ছিলেন খেলাফতে রাশেদার পর থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ উজির। তার জ্ঞানের শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য। কল্যাণের প্রতি ছিল তাঁর ভালোবাসা। তিনি সালজুকদের অধীনস্থ পুরো ইসলামী ভূখণ্ডে বহু দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যেগুলো তার দিকে সম্বন্ধ করে 'নিযামিয়া মাদরাসা' নামে পরিচিত। এসব দীনী প্রতিষ্ঠান একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৎপরতা চালায়; চালায় জিহাদী তৎপরতাও। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে দাওয়াতের ক্ষেত্রেও।

যখন শাম ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডাররা প্রবেশ করে, তখন মুসলিম বিশ্বে, বিশেষত বরকতময় ভূখণ্ড ফিলিস্তিন ও আল-কুদসে যা ঘটতে থাকে, তা দেখে উত্তর ইরাকের মুসলমানরা প্রচণ্ড রকমে ব্যথা অনুভব করেন। তাদের মধ্যে অনুভূতি সাড়া দিতে শুরু করে এবং জিহাদী শক্তি আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করে। আমরা আগে উল্লেখ করেছি, আন্তাকিয়ার পতনের সময় উত্তর ইরাক থেকে কারবুগা বের হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর বাহিনী দুর্বল ছিল। জাকারমাশ মোকাবেলায় বের হন। ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় আরও বের হন মওদুদ ইবনু তুনতাকিন। তিনি তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের একজন অন্যতম খাঁটি মুসলিম। তার জিহাদের স্পৃহা ছিল প্রবল। তাকওয়া, রাত-জাগরণ ও সিয়াম সাধনাসহ নানা গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। তার রাজনৈতিক ও সামরিক যোগ্যতা ছিল অতুলনীয়। তবে পরিতাপের বিষয়, তিনি ছিলেন বামনসমাজে দৈত্য। ফলে কেউই তাকে সাহায্য করেনি। বরং বিপরীত। আলেপ্পোর শাসক রিদওয়ান ইবনু তুতুশ তার পথ রোধ করে দাঁড়ান। তার বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কেননা, তার ভয় ছিল, হয়তো তিনি ক্রুসেডারদের থেকে ইসলামী ভূখণ্ডগুলো মুক্ত করে নিজের দখলে নিবেন। এজন্য তিনি জবরদখলকারী তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব

শাসনকারী ক্রুসেডারদের সাথে হাত মিলিয়ে মওদুদের বিপক্ষে দাঁড়ান। তবে মওদুদ ইবনু তুনকাতিনও দমবার পাত্র ছিলেন না। হতাশ না হয়ে তিনি একের পর এক হামলা করতে থাকেন।

৫০৭ হিজরী মুতাবিক ১১১৩ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনের বড় একটি যুদ্ধে মওদুদ ইবনু তুনতাকিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। তিনি উত্তর ইরাক থেকে এসে ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং টাইবেরিয়াস হ্রদের দক্ষিণে পৌঁছেন। প্রখ্যাত সান্নাবরা (Sannabra) রণাঙ্গনে ক্রুসেডারদের উপর বিজয়ী হন। ক্রুসেডার বাহিনী এখানে মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয় এবং বহু খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়। এটা ছিল ৭ মুহাররাম ৫০৭ হিজরীর ঘটনা। ক্রুসেডার বাহিনীর ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশের প্রায় ১৬ বা ১৭ বছর পর। এই যুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের আরেক মহান বীরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি মওদুদ ইবনু তুনতাকিন ﵀-এর বাহিনীতে সৈনিকহিসাবে লড়াই করছিলেন। তিনি হলেন ইতিহাসখ্যাত বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। তখন তিনি ছিলেন তরুণ যুবক। বয়স মাত্র ২৪ বছর। তবে জেনে রাখা উচিত যে, ১২ বছর বয়সেই তিনি তলোয়ার ধারণ করেছিলেন। তখন থেকে তিনি মওদুদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মওদুদ ইবনু তুনতাকিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর তাকে হত্যা করার জন্য আলেপ্পোর শাসক রিদওয়ান ইবনু তুতুশ এক ইসমাঈলী শিয়াকে নিযুক্ত করেন। সে তাকে দামেশকের মসজিদে জুমুআর সালাত আদায় করার সময় হত্যা করে দেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মওদুদ ইবনু তুনতাকিনের জিহাদী কার্যক্রম বন্ধ করা এবং তৎকালীন শাসকবর্গ ও সেনাপতিগণ যে অরাজকতায় জড়িত ছিলেন, তা ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক করে দেওয়া। তবে আল্লাহর অশেষ দয়ায় মওদুদ ইবনু তুনতাকিনের মৃত্যু হলেও জিহাদ জীবিত থাকে। এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কখনও মৃত্যু হবে না। কাজেই জিহাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত থাকে। আত্মপ্রকাশ ঘটে অনেক মুসলিম বীরের। তাদের মধ্যে সুকমান ইবনু আরতুক অন্যতম। যার কথা আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের শাসক। তিনি আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকে

রোখ করেন। বাল্ক ইবনু বাহরাম (Belek Ghazi) ও গাজী ইবনু আরতুকও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এরপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয় ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ﵀-এর উপর। তিনি মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৫২১ হিজরীতে তিনি মসুল আমিরাতের শাসক নিযুক্ত হন এবং ৫৪১ হিজরী পর্যন্ত মুসলমানদের সেবা করেন।

শামের জালেম বাদশাহ তুতুশ ইবনু আল্প আরসালান ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর পিতা আক সানকার (Aq Sunqur Al-hajib)-কে হত্যা করেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইয়াতিম-অসহায় অবস্থায় বেড়ে ওঠেন। পরিস্থিতিও ছিল তাঁর জন্য প্রতিকূল। জন্মভূমি আলেপ্পো পরিত্যাগ করে মসুল চলে যাওয়ার পর খুব কষ্টে সময় অতিবাহিত হয় তাঁর। আল্লাহ ﷻ তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলেন। তিনি ইসলামী ধাঁচে বড় হন। তিনি হয়ে ওঠেন মুজাহিদ, আলেম ও সংস্কারক। তাঁর আবির্ভাব ক্রুসেডারদের সাথে প্রকৃত জিহাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ক্রুসেড যুদ্ধে তার সন্তানদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, শাম, ফিলিস্তিন এবং যেসব ইসলামী ভূখণ্ড ক্রুসেডারদের তাণ্ডবের সম্মুখীন হয়, সেখানকার মুসলমানরা ছিল চরমভাবে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। তবে আল্লাহ ﷻ জিহাদ থেকে নির্গত নুরের মাধ্যমে সবসময় মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। জিহাদের এই নুর আক্রান্ত ভূখণ্ড থেকেই যে সবসময় উদ্ভাসিত হবে, তা আবশ্যক নয়। আমরা যখন কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করতে চাই, তখন শুধু ঘটনাস্থলে দৃষ্টিপাত করি। দৃষ্টি প্রসারিত করে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখি না। ফলে অনেক কল্যাণই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আমরা যদি ফিলিস্তিন, শাম এবং ওইসব ভূখণ্ডের দিকেই তাকাই, যেগুলো তখন আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল, তা হলে দেখব, স্বাধীনতা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমরা দৃষ্টি সামান্য প্রসারিত করব, তখন দেখব উত্তর ইরাকে জিহাদের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। এ ভূখণ্ড ছিল তালিম, তারবিয়াত, জিহাদ, দাওয়াত ও আল্লাহর নৈকট্যের এক পূণ্যভূমি। আল্প আরসালান, মালিক শাহ ও নিযামুল মুলক তুসী প্রমুখের সময়ে এসব অঞ্চল এভাবেই গড়ে ওঠে। এ ভূখণ্ড থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটে বহু মুজাহিদের। মওদুদ ইবনু তুনতাকিন ﵀ ছিলেন এসব মুজাহিদদের অগ্রপুরুষ। তিনি ছিলেন উম্মতের একজন শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ।

মওদুদ ইবনু তুনতাকিনের শাহাদাতের পর বহু সংখ্যক মুজাহিদ জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। তবে মওদুদ ইবনু তুনতাকিনের শেষ যুদ্ধ সান্নাবরার রণাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এক নতুন তারকার; বিশিষ্ট যোদ্ধার। তিনি হলেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। চড়াই-উৎরাইয়ের বহু বিস্ময়কর পথ পাড়ি দিয়ে এক পর্যায়ে ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ৫২১ হিজরীতে

সিংহাসনে আরোহণ করেন। অর্থাৎ তুনতাকিন দুর্ঘটনার প্রায় ১৪ বছর পর। তিনি মসুলের আমীর নিযুক্ত হন। সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ শাসক ও সেনাপতির পক্ষ থেকে সৃষ্ট বহু সংকটের সম্মুখীন হন।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর প্রত্যাশা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এজন্য তাঁর বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হওয়া ছিল আবশ্যক। কেননা, ওই সময়ের অধিকাংশ লোকই ছিল রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও অর্থ-খ্যাতির পাগল। এটা ছিল ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর আদর্শের ব্যতিক্রম। শাসনক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। একটিই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তা হল ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলিম বিশ্বকে স্বাধীন করা। যদিও ক্রুসেডাররা মসুলে প্রবেশ করেনি, তবুও শাম ও ফিলিস্তিনের সমস্যা তাঁর নিজের সমস্যা। মুসলমান তাঁর নিজের জাতি। ভূখণ্ডও তাঁরই ভূখণ্ড। একজন ব্যক্তি যখন সবকিছু এভাবে ভাবেন, তখন তার মধ্যে কিছু গুণের সমাবেশ ঘটে। সেগুলো হচ্ছে মুজাদ্দিদের গুণাবলী। আমি এখানে সবার কাছে মুজাদ্দিদের গুণাবলী তুলে ধরতে চাই। সেই গুণাবলি এমন ব্যক্তির, যিনি সমাজ বদলাতে পারেন। সেই গুণাবলি একজন স্বাধীনতাপ্রেমীর। সেই গুণাবলি এমন ব্যক্তির, আশপাশের সবাই ক্রুসেডারদের সামনে মাথানত করলেও যিনি শির উঁচু করে থাকেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মধ্যে ওইসব গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। যদিও ইখলাস অন্তরের বিষয়– যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এর অনেক প্রমাণ থাকে। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর জীবনে সেসব প্রমাণের সবই বিদ্যমান ছিল। এসব প্রমাণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উম্মতের সংকটের কথা কখনও ভুলে না যাওয়া। তিনি বিশ বছর মুসলমানদের শাসক ছিলেন। অথচ একটি বছরের জন্যও তিনি উম্মতের সংকটের কথা ভুলে যাননি।

তার ইখলাসের আরও একটি প্রমাণ হচ্ছে তিনি সবসময় নিজের স্বার্থের উপর মুসলমানদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক রণাঙ্গনে তিনি অনুভব করেন যে, তার শক্তি দুর্বল।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁর সাহায্য প্রয়োজন। তখন তিনি সুলতান মাসউদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। মাসউদ ছিলেন তৎকালীন সালজুকদের সুলতান। তিনি ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর কঠিন বিরোধী ছিলেন। এই যুদ্ধের কিছুদিন আগেও মাসউদ তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তবুও তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য চান। এসময় একজন সৈনিক তাকে বলে, সুলতান মাসউদ যদি বিজয়ী হতে পারে, তা হলে সে পুরো দেশই দখল করে নিবে? ইমাদুদ্দীন তাকে উত্তর দেন, কোনো মুসলিম দখল করে নিলে কোনো সমস্যা নেই। কাজটি কোনো ক্রুসেডার দখল করার চেয়ে ভালো।

ইসলামী ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বের করার বিনিময়ে তার রাজ্য চলে গেলেও তার কোনো আক্ষেপ ছিল না।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর যুদ্ধ শুরুর নিদর্শন ছিল এই যে, তিনি নিজে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এভাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি হতেন, যার প্রাণ ও রাজত্ব যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। এজন্য আমরা বলি যে, তাঁর অন্তরে ইখলাস ছিল। এই ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ ﷻ বরকত দিয়েছিলেন। তাকে একের পর এক বিজয়ের গৌরব দান করেন। আল্লাহ ﷻ বিজয় শুধু মুখলিসদেরকেই দান করেন।

অধীনস্থ সবার কাছে ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন একজন প্রিয় ব্যক্তি। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের যারা তাঁকে চিনত, অথবা তাঁর গল্প শুনত– সবাই তাঁকে ভালোবাসত। এমনকি আমাদের এই যুগেও যে তাঁর কাহিনী শোনে, সে তাকে ভালোবাসে। আর মানুষের ভালোবাসা পাওয়া সহজ কাজ নয়। নবী ﷺ বলেন–

> আল্লাহ ﷻ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, হে জিবরীল! আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরীল তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসেন। এরপর দুনিয়ার মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। [আহমাদ : ৮৪৮১]

তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে ভালোবাসে।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গীও ছিলেন এমন এক ব্যক্তি। তার লক্ষ্য ছিল দীন ও মুসলিম জাতির সহযোগিতা করা। সংকটময় পরিস্থিতি বদলাতে এবং দেশকে স্বাধীন করতে এটাই একজন সেনাপতির সফলতার প্রধান লক্ষণ।

মসুলের শাসনভার গ্রহণের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সবসময় তিনি ইসলামী শরীয়ত যথাযথভাবে মেনে চলতেন। রাজনীতি, বিচারকাজ, রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সব বিষয়ে তিনি শরীয়তকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি প্রধান বিচারপতি ও তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম বাহাউদ্দীন শাহরাযুরীর মতামত ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতেন না। লক্ষ করুন, তিনি দীনের সম্মানার্থে তাঁর সব সন্তানের নাম 'দীন' শব্দ যোগ করে রেখেছিলেন। তার বড় ছেলের নাম ছিল সাইফুদ্দীন। দ্বিতীয় ছেলে নুরুদ্দীন এবং তৃতীয় ছেলে নুসরাতুদ্দীন।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন সাহসের কিংবদন্তী। ইবনু আসীর ﵀ তাঁর সম্পর্কে চমৎকার বলেছেন– ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর পরপরই ছিল ইবনু আসীরের যুগ। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে যারা দেখেছিলেন, তাঁর সাথে যারা চলাফেরা করেছিলেন, তাদের কাছ থেকে ইবনু আসীর নিজ কানে শুনেছিলেন। তিনি শুধু যুদ্ধের ময়দানেই বীর ছিলেন না; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও ছিলেন অদম্য সাহসী। অনেকের বড় বড় বাহিনী ছিল, সামর্থ্য, হাতিয়ার ও জনবল ছিল পর্যাপ্ত, কিন্তু তার পরও মুসলিম জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। আর এবিষয়টি ইমাদুদ্দীনকে অন্যদের থেকে আলাদা সাব্যস্ত করত। অন্য জায়গায় ইবনু আসীর বলেন– তিনি সাহসের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ সাহসের উপমা দেওয়া হত তাঁকে দিয়ে।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। যে জাতি জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে শাসিত হয়, তারা কখনও কোনো সংকট জয় করতে পারে না। কোনো

দেশও স্বাধীন করতে পারে না। আর যে জাতি ন্যায়বিচারের ছায়ায় শাসিত হয়, তারা পুরো জীবন সংকট উত্তরণে উৎসর্গ করতে পারে। তিনি তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন, যেন কেউ দরিদ্র কৃষকের ফসলের একটি দানা বা একটি চারাও নষ্ট না করে। এজন্য তাঁর বাহিনী যখন কৃষি জমির পাশ দিয়ে অতিবাহিত হত, তখন কৃষকের কৃষির যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে সাবধান থাকত। এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদে গমনকারী কোনো সৈনিক তার ঘোড়া বা সোয়ারীর জন্য যদি কোনো কৃষকের কাছ থেকে ঘাস-খড় নিত, তিনি তার দাম পরিশোধ করার নির্দেশ দিতেন। বলতেন না যে, এ তো আল্লাহর রাস্তায়ই হয়েছে। যাতে কৃষক জুলুমের শিকার না হয়। তাঁর এই ইনসাফই তাঁকে আল্লাহর সাহায্য এনে দিয়েছিল।

এমন সাহস, শক্তি আর ক্রুসেডারদের উপর ধারাবাহিক বিজয় সত্ত্বেও ইমাদুদ্দীন জঙ্গী দরিদ্র ও দুর্বলদের উপর খুবই দয়ালু ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি প্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করতেন। যাতে তাঁর দেখাদেখি ধনীরাও আল্লাহর রাস্তায় দান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। সেই সাথে প্রতিদিন গোপনেও দান করতেন। ফলে সাধারণ জনগণের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

তিনি ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবীদ। মানুষ চিনতে পারতেন। রণকৌশল ও পরিচালনা-কাজে ছিলেন অত্যন্ত পারঙ্গম। ছিলেন উঁচু মাপের ঘোড়সোয়ার। একজন মুসলিম সেনাপতির সমস্ত গুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সেই সেনাপতির মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যিনি চান সমাজ বদলাতে, যিনি চান মুসলিম জাতির দীন, শরীয়ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে এবং অবিশ্বাসীদের উপর জাতির মান-মর্যাদা ও ইজ্জত ফিরিয়ে আনতে।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর স্বপ্ন আর লক্ষ্য ছিল দিবালোকের মত স্পষ্ট। তা হল ইসলামী দুনিয়াকে স্বাধীন করা। কীভাবে তিনি এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আগে তিনি নিজের রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা, প্রশাসন ও নিরাপত্তাব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করেন। সবকিছু ঢেলে সাজান। তখন তাঁর সামনে ইসলামী দুনিয়া স্বাধীন করার পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।

আসুন আমরা জেনে নিই ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর শ্লোগান। পরবর্তী সেনাপতি, সমাজ-সংস্কারক ও স্বাধীনতাকামীদের শ্লোগান। তা হল– 'ঐক্য ও জিহাদ।' এটা ছিল ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও তাঁর অনুসারীদের পন্থা, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস স্বাধীন করেছিলেন, ফিলিস্তিন ও শাম স্বাধীন করেছিলেন। অতএব, ঐক্য ছাড়া মুসলিম বিশ্ব স্বাধীন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া ইসলামী বিশ্ব স্বাধীন করা আদৌ সম্ভব নয়। বিক্ষিপ্ত বাহিনী কখনও বিজয়ী হতে পারে না।

রব্বুল আলামীন বলেছেন–

> তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তা হলে তোমরা পরাস্ত হবে। তোমাদের প্রভাব খর্ব হবে। আর ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। [সুরা আনফাল : ৪৬]

শামের আমিরাতগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, এশিয়া মাইনরের মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং আপন ভাইয়ে ভাইয়ে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব ছিল ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় ইসলামী বিশ্বের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ঐক্য ছাড়া মুসলমানদের বিজয় সম্ভব নয়। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী বিষয়টি খুব ভালো করে অনুধাবন করেছিলেন।

আর দ্বিতীয় বিষয় হল আল্লাহর পথে জিহাদ। তিনি বুঝতে পারেন যে, আলোচনা আর শান্তিচুক্তি– যা কতিপয় মুসলিম শাসক অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদন করেছিলেন, তার কোনটিই ইসলামী ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে, যে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা শত্রুর কাছে হাত পেতে ফিরে পাওয়া যাবে না; বরং তা শত্রুর নাকে রশি পরিয়ে ফিরে আনতে হবে। সুতরাং তিনি কী পদক্ষেপ নেন?

প্রথমদিকে শুধু মসুল ছিল তার শাসনাধীন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে ইসলামী বিশ্বকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ রক্তপাত যাতে না ঘটে, সেদিকে তিনি খুব সতর্ক

থাকেন। তাঁর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হয় আলেপ্পো। আল্লাহ ﷻ-ই যেন তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে দিচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পান যে, আলেপ্পোর জনগণ তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন। ইমাদুদ্দীনের পিতার নাম ছিল আক সানকার আল-হাজিব ﷺ। তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকী ও পরহেযগার লোক। জীবদ্দশায় একসময় তিনি আলেপ্পোর শাসক ছিলেন। ইবনু আসীর বলেন, মানুষ সবসময় তাঁর উপর আবেগপ্রবণ ছিল। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান। আলেপ্পোর জনগণ যখন শুনতে পায় যে, ইমাদুদ্দীন জঙ্গী মসুলের শাসক হয়েছেন, তখন তাদের মনে পড়ে যায় তার পিতা আক সানকার আল-হাজিবের কথা। তারা ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে তাদের শাসনভার গ্রহণের আহ্বান জানায়। আর সত্যিই ইমাদুদ্দীন জঙ্গী উভয় রাজ্য একিভূত করতে সক্ষম হন। এভাবে তিনি শাম পর্যন্ত রাস্তা অতিক্রম করেন। শাম ছিল ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের শিকার। আর শাম হয়ে ফিলিস্তিন যেতে হয়।

এরপর তিনি একের পর এক বিভিন্ন শহর নিজের আমিরাতে যুক্ত করতে থাকেন। হামাত, হিমস, আরাতিকদের অঞ্চল উত্তর আরব উপদ্বীপ এবং উত্তর ইরাকের কুর্দি অঞ্চল ইত্যাদি তাঁর আমিরাতে যুক্ত হয়ে যায়। তবে দামেশক শহর তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু থেকেই দামেশক ছিল ইসলামী বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার পথে এবং ইসলামী ঐক্য গঠনের পথে এক বিষাক্ত কাঁটা। কেননা, দামেশক দীর্ঘ একশত চার বছর উবায়দী সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত হয়েছিল। উবায়দীদের চলে যাওয়ার পর শহরটি তুতুশ ইবনু আল্প আরসালান এবং তার পরে দুকাক ইবনু তুতুশের শাসনে চলে যায়। তাদের উভয়ের শাসনই ছিল শরীয়তবহির্ভূত জুলুমের শাসন। ফলে এখানকার জনগণ বহু জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়। যদ্দরুণ তারা প্রকৃত ইসলামী মানসিকতা থেকে দূরে সরে যায়। তারা কাপুরুষতা, ভীরুতা ও পরাজয় মেনে নেয়। কখনও তারা খ্রিস্টানদেরকে, কখনও উবায়দীদেরকে জিযিয়া দিত। আমরা যেমন বলেছি, পুরো শামকে আলেমশূন্য করা হয়েছিল। এ সময় দামেশকের পরিস্থিতি ছিল খুবই দুঃখজনক। এজন্য আমিরাতটি ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর

সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে সম্মত ছিল না। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর জীবনের শেষ পর্যন্ত দামেশক তাঁর ফিলিস্তিন পৌঁছার পথে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দামেশক বাদে ইসলামী ভূখণ্ডের বড় বড় অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ করার পর ইমাদুদ্দীন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। প্রথমে তিনি দুই বছরের জন্য তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এরপর ৫২৪ হিজরী মুতাবিক ১১৩০ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। আসারিব দূর্গে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জন করতে এবং দূর্গটি মুসলমানদের দখলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে তিন হাজার ক্রুসেডার নিহত হয়। এই যুদ্ধের দুই বা তিন বছর পর তিল বাশির শহরে তিনি আরও একটি বিজয় অর্জন করেন। এরপর তাঁর বিজয়ের ধারা অব্যাহত হয়ে যায়।

৫৩০ হিজরী মুতাবিক ১১৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাতাকিয়ায় রোমহর্ষক বিজয় অর্জন করেন এবং ক্রুসেডারদের হাত থেকে লাতাকিয়া স্বাধীন করতে সক্ষম হন। সাত হাজার ক্রুসেডারকে বন্দী করেন এবং এমন বিপুল পরিমাণ গনীমত অর্জন করেন, যা কল্পনার বাইরে। তার মধ্যে পশু ছিল এক লক্ষ। এই অঙ্কই আমাদের কাছে এই বিজয়ের গুরুত্ব তুলে ধরতে যথেষ্ট। তবে একই সাথে আমাদের সামনে ক্রুসেডারদের সামর্থ্য ও সমৃদ্ধিও প্রমাণ করে। লাতাকিয়া তখন ছিল আন্তাকিয়া আমিরাতের অনুগত।

লাতাকিয়া জয়ের মাত্র একবছর পর ৫৩১ হিজরী মুতাবিক ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে বারীন শহরে তিনি বিস্ময়কর এক বিজয় অর্জন করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের সাথে মিলিত হয়ে তরাবলুস আমিরাতকে তিনি পরাজিত করেন। তখন তরাবলুস আমিরাতের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় রেমন। আর বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের প্রধান ছিলেন ফুলক অ্যাঞ্জো (Fulk V Anjou)। ৫৩২ হিজরী (মুতাবিক ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দ) রামাদান মাসে তিনি শাইযারের ময়দানে বিরাট বিজয় অর্জন করেন। এ বিজয় ছিল বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সম্মিলিত ক্রুসেডার

বাহিনীর উপর। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের বাহিনীও তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল।

এরপর ৫৩৯ হিজরী মুতাবিক ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে রুহা ফাতাহ করার মাধ্যমে তিনি কৃতিত্বের মুকুট পরিধান করেন। রুহার বিজয় যেন ছিল ইসলামী ভূখণ্ডে অবস্থিত কোনো পুরনো ক্রুসেডার রাজ্যের বিজয়। এটা ছিল ৪৯০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ক্রুসেড আমিরাত। আগ্রাসনের প্রায় ৪৮ বছর পর ৫৩৯ হিজরীতে মুসলমানরা তা পুনরুদ্ধার করে। রুহা বিজয়ের ঘটনা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী এখানে বহু বাহিনী সমবেত করেন এবং শহরটি অবরোধ করেন। অনেক রণনৈপুণ্য অবলম্বন করে তিনি বহু বার ক্রুসেডারদের বোকা বানিয়ে দেন। তিনি শহরের মোটা দেয়ালে সুরঙ্গ তৈরি করতে সক্ষম হন, মুসলমানরা আগে যা ভাঙতে গিয়ে সফল হতে পারেনি। ইমাদুদ্দীন ২৬ জুমাদাল উখরা শহরে প্রবেশ করেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। এই আমিরাতে ক্রুসেডারদের দম্ভ একেবারেই চূর্ণ হয়ে যায়। শুধু তিল-বাশির শহর বাদে পূর্ণ রুহা আমিরাতের পতন হয়। এ বিজয় ছিল মানব-ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। ৪৮ বছর ক্রুসেডারদের দখলে থাকা শহরে ইমাদুদ্দীন প্রবেশ করেন। শহরে অবস্থানকারী যোদ্ধা বাদে সমস্ত খ্রিস্টানকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন। যে তাঁর সাথে লড়তে আসে, শুধু তাকেই তিনি প্রতিহত করেন। ক্রুসেডারদের প্রবেশের আগে যেসব আরমানীয় এ অঞ্চলে বাস করত, তিনি তাদের সহায়-সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। অথচ আর্মানীয়রা ছিল খ্রিস্টান। তবুও তিনি তাদের নিরাপত্তা দেন এবং তাদের সহায়-সম্পদ ফিরিয়ে দেন। যুদ্ধরত ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই রুহা আমিরাতে হত্যা করেননি। রুহা আমিরাতে উড্ডীন করা হয় ইসলামী পতাকা। এ দিনটি ইসলামী ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিনে পরিণত হয়।

রুহা বিজয় ছিল ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর শ্রেষ্ঠ বিজয়। বরং ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বিজয়। এ বিজয় আমাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে দেয় যে, আশা মরতে পারে না।

আগ্রাসনের পর ৪৮ বছর অতিক্রান্ত হয়। একটি প্রজন্ম মৃত্যু বরণ করে, আরেকটি প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। তবুও মুজাহিদদের মাথায় সংকটের কথা জাগ্রত থাকে। একসময় এ ভূখণ্ড স্বাধীন হয়।

এরপর থেকে সব মুসলমানের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর নাম। বিভিন্ন স্থান থেকে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাগদাদের আব্বাসী খলিফা। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর তুলনায় তখন আব্বাসী খলিফার কোনো মূল্যই ছিল না। খলিফা খুব চমৎকার ভাষায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। আব্বাসী খলিফা আল-মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ শাসক, ইসলামের বুনিয়াদ, সুলতানদের শিরোমণি, বিজয়ী আমীর, মুসলিম বাহিনীর অবিসংবাদিত সেনাপতি' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন। এর মাধ্যমে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর হাতে সূচিত হয় জঙ্গী সাম্রাজ্যের ভিত্তি। এর মাধ্যমে ইরাক ও শাম থেকে ক্রুসেডার বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত ইসলামী ভূখণ্ডে পৌঁছার পথ একেবারেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এরপর শুরু হবে আল্লাহর পথে জিহাদের নতুন এক অধ্যায়।

৫৪১ হিজরী। রুহা বিজয়ের দুই বছর পরের ঘটনা। তাঁর এক খাদেম তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। বিরাট ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সে তাঁকে হত্যা করে শহীদ করে দেয়। তখন তিনি একটি দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন। তাঁর এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অনেক প্রশ্নের উদয় হয়। বলা হয়, এই লোক ক্রুসেডারদের সহযোগী ছিল। কারও কারও মতে অন্য কোনো শাসকের সহযোগী ছিল সে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ﵀ শহীদ হন।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতে অনেকে ধারণা করেছিল যে, সবকিছু আবার হারিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ সুলতান ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মত উত্তম পূর্বসূরির পর উত্তম উত্তরসূরির ব্যবস্থা করে দেন। তারপর বিরাট নূরের আবির্ভাব ঘটে, যা পুরো মুসলিম বিশ্বকে আলোকিত করে। নূরুদ্দীন মাহমুদ ইবনু ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। তাঁর হাত ধরে শুরু হয় জিহাদের নতুন এক ধারা। সামনে আমরা সে সম্পর্কে জানব ইনশা আল্লাহ।

নুরুদ্দীন জঙ্গী ও বাইতুল মুকাদ্দাস

আমরা আগে লক্ষ্য করেছি কীভাবে ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইসলামী বিশ্বের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছিলেন। কীভাবে তিনি মুসলিম জাতিকে জিহাদের পথে ধাবিত করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য কতটা স্পষ্ট ছিল। ক্রুসেডারদের কাছ থেকে ইসলামী বিশ্বের মুক্তি। পথ্যাও তাঁর সামনে কেমন স্বচ্ছ ছিল– ঐক্য ও জিহাদ। আমরা ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ﷺ-এর শাহাদাতের কথাও উল্লেখ করেছি। অনেক মুসলমান মনে করেছিলেন তাঁর মৃত্যু উম্মাহর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ, তিনি ছিলেন ইসলামী জিহাদের এক মহান সিপাহসালার। একজন অসাধারণ ইসলামী দাঈ। তবে আল্লাহ এই উম্মতকে সবসময় উত্তম প্রতিনিধি দান করেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর ইন্তেকালের পর আল্লাহ ﷻ তারই ঔরসজাত সন্তান নুরুদ্দীন মাহমুদকে উম্মতের উত্তম প্রতিনিধি-হিসাবে দান করেন।

নুরুদ্দীন মাহমুদ একজন অসাধারণ ইসলামী ব্যক্তি। এমনকি মানব ইতিহাসেও তাঁর উপমা বিরল। আমি তাঁর সম্পর্কে ইবনু আসীরের উক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ইবনু আসীর বলেন, আমি ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে শুরু করে ইসলামী যুগ হয়ে আমাদের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। আমি খোলাফায়ে রাশিদীন ও উমার ইবনু আবদুল আযীযের পর ন্যায়পরায়ণ শাসক নুরুদ্দীন মাহমুদের চেয়ে আদর্শবান আর কাউকে পাইনি। একথার মানে হল ইবনু আসীরের দৃষ্টিতে নুরুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন মুসলিম উম্মাহর ৪৫০ বছরের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। একথা তিনি এমনিতেই বলেননি। বরং এই মহান সংস্কারক মুজাহিদের জীবনগাঁথা নিয়ে বিস্তারিত অধ্যায়নের পরই তিনি এ মন্তব্য করেছেন।

প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন একজন কায়েদে রব্বানী। ৩০ বছর বয়সে শাসনভার গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তখন তিনি একজন তরুণ। রাত পার করে দিতেন সালাতে দাঁড়িয়ে। শেষ রাতে আল্লাহর কাছে এস্তেগফার করতেন। কুরআন তিলাওয়াত করতেন খুব বেশি। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সবসময় দুআ করতেন। খুব বেশি নীরব থাকতেন। এই গুণ তিনি পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আল্লাহর রাজত্ব নিয়ে সবসময় ভাবতেন। গুনে গুনে কথা বলতেন। গাম্ভীর্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ভূষণ। কখনও বেফাঁস কথা বলতেন না। করতেন না অনিষ্টকর কাজ। তিনি ছিলেন মজলিসের উত্তম ব্যক্তি। মুসলমানদের শাসক হয়েও তিনি ছিলেন একেবারে দুনিয়াবিমুখ। এমনকি তাঁর স্ত্রী কষ্ট পেতেন এবং তাঁর কাছে কিছু আবদার করতেন। তিনি জওয়াবে বলতেন, আমি হিমসের তিনটি দোকান ছাড়া আর কোনোকিছুর মালিক নই। তিনি স্ত্রীকে বলতেন, আমি তোমার কারণে জাহান্নামে যেতে পারব না।

এভাবে তিনি দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন করতেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সমস্ত মুজাদ্দিদের জীবন এমনই ছিল।

নুরুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন ইসলামী ফিকহের বড় আলেম। হানাফী মাযহাবের আলেম। এই সম্প্রদায়ের সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ বিষয়ক একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তি। সবসময় শাহাদাত কামনা করতেন। তবে তিনি শাহাদাতের মৃত্যু পাননি। বরং স্বাভাবিকভাবে মারা যান। কিন্তু তিনি তৎকালীন সময়ে এবং আমাদের সময়েও ইসলামী ইতিহাসের সব গ্রন্থে 'নুরুদ্দীন মাহমুদ শহীদ' নামে পরিচিত। কেনো? কারণ, তিনি খুব বেশি শাহাদাত কামনা করতেন! তিনি সাথী-সঙ্গী ও ভাই-বেরাদারের সাথে খুব বেশি শাহাদাতের কথা আলোচনা করতেন। জুমআর খুতবায় শাহাদাতের খাহেশ প্রকাশ করতেন। এজন্য আল্লাহ ﷻ তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যদিও তিনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হননি। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ ﷻ তাকে শহীদের মর্তবা দান করেন। যদিও সে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করে।

তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তবুও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁর কাছে আব্বাসী খলিফার পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে। এতে আব্বাসী খলিফা– আল্লাহ নুরুদ্দীন মাহমুদকে যে সব বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন, সেগুলোর উল্লেখ করেন। নুরুদ্দীন মাহমুদের সাথে তুলনা করলে আব্বাসী খলিফা তখন নিছক পুতুল ছাড়া কিছুই ছিলেন না। তিনি নুরুদ্দীন মাহমুদের অনেক বৈশিষ্ট্য ও উপাধি উল্লেখ করেন। আমি বলি, আব্বাসী খলিফার বলা সবগুলো বৈশিষ্ট্যেই বাস্তবে নুরুদ্দীন মাহমুদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। খলিফা চিঠিতে লেখেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মঙ্গল করুন– মাওলা [প্রভু] সুলতান, ইনসাফগার বাদশাহ, আমলদার আলেম, নির্লোভ আবেদ, পরহেযগার মুজাহিদ, অতন্দ্র পাহারাদার, দীনের আলো ও চমক, ইসলামের ভিত্তি ও তলোয়ার, রাজ্যের শোভা ও বুনিয়াদ, খেলাফতের প্রিয় ও গৌরব, ইমামাতের জন্য কাম্য আস্থাভাজন, জাতির গৌরব ও সম্মান, জগতের সূর্য ও সম্রাট, পূর্ব-পশ্চিমের রাজাদের নেতা ও সুলতান, দুনিয়াজুড়ে ইনসাফ যিন্দাকারী, জালেম থেকে মজলুমের হক আদায়কারী, আমীরুল মুমিনীনের রাজ্যের ত্রাণকর্তা– নুরুদ্দীন মাহমুদের।

আব্বাসী খলিফা এসব বাক্য নুরুদ্দীন মাহমুদের কাছে অনুমোদনের আবেদন জানান, যাতে আব্বাসী খেলাফতের অধীনস্থ সমস্ত মসজিদে খুতবায় পাঠ করা হয় এবং এভাবে খুতবার শেষে আব্বাসী খলিফা ও নুরুদ্দীনের জন্য দুআ করা হয়। নুরুদ্দীন মাহমুদ তাকে কী জওয়াব দিয়েছিলেন?

তিনি আব্বাসী খলিফাকে জওয়াব দেন, যেন দুআর উল্লিখিত বাক্যগুলো স্থগিত রাখা হয় এবং শুধু এতটুকুই বলা হয়– হে আল্লাহ! আপনার ফকীর বান্দা নুরুদ্দীন ইবনু জঙ্গীর মঙ্গল করুন।

ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে থেকেও তিনি ছিলেন এতটা বিনয়ী। অথচ আব্বাসী খলিফার বাক্যগুলো এই পরহেযগার মুজাহিদের ব্যাপারে যথার্থ ছিল।

আলেপ্পো যুদ্ধে তিনি কিছু মহান কথা বলেছিলেন। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম বড় লড়াই। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনার দীনকে বিজয়ী করুন; মাহমুদকে নয়। এ মাহমুদ আবার কে, যাকে বিজয়ী করতে হবে?

তাঁর এই বাক্যের ব্যাখ্যায় অনেক কথা বলা হয়েছে, কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলো এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

আমি যদি নুরুদ্দীন মাহমুদের জীবনের সারাংশ তুলে ধরতে চাই, তা হলে বলব, তিনি একটি সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

অনেকে মনে করছেন, আমি সাধারণ একজন বিচ্ছিন্ন, গুহায় বসে এবাদতে মগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছি। কক্ষণও নয়, বরং তিনি মানুষের সাথে পূর্ণমাত্রায় মিশতেন। এভাবেই তিনি জীবনের সবগুলো অঙ্গনে অর্জন করেন সফলতা। আর এভাবেই জাতিকে স্বাধীন করতে হয়। তিনি শুধু লড়াইয়ের ময়দান আর সেনাবাহিনী গঠন নিয়েই পড়ে থাকতেন না। বরং তিনি একটি সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। সব জায়গা থেকে আলেমদের ডেকে সমবেত করেন। শুধু হানাফী মাযহাবের আলেমদের সমবেত করেন, এমন নয়; বরং সব মাযহাবের আলেমরাই আগমন করেন। সব শ্রেণির আলেমদের নিয়ে সমাবেশ করেন আলেপ্পোর অভ্যন্তরে। এরপর দামেশক বিজয় এবং সেটা নিজের সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করার পর সেখানেও তিনি আলেমদের নিয়ে সম্মেলন করেন। তিনি সব মাযহাবের আলেমদের সমবেত করেন, যাতে মুসলমানদের সমস্ত বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন মতের উপর ঐক্যবদ্ধ হন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করেন। সুবিন্যস্ত সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এর মানে তিনি ধর্মীয় বিষয়াদির মত সামরিক বিষয়েও সমান গুরুত্ব দিতেন। বহু কেল্লা ও দুর্গ নির্মাণ করেন। সুসংহত করেন সেনাবাহিনী।

নুরুদ্দীন মাহমুদের আমলে বার্তা প্রেরণের জন্য কবুতর ব্যবস্থা চালু হয়। বিশাল রাজ্যের সর্বত্র যাতে কবুতর সহজে বার্তা পরিবহন করতে পারে সেজন্য তিনি বিশেষ কাঠামো সৃষ্টি করেন। একইভাবে তাঁর ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক উন্নত পরিকল্পনা। তিনি তাঁর

সাম্রাজ্যে বড় মাপে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েও তিনি নির্মাণ করেন বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও হাসপাতাল। তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে দামেশক শহরে নির্মিত নুরী হাসপাতাল ধারাবাহিক ৮০০ বছরেরও বেশি সময় চিকিৎসা-সেবা অব্যাহত রাখে। হিজরী ষষ্ঠ শতকে নুরুদ্দীন হাসপাতালটি নির্মাণ করেছিলেন। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার কার্যক্রম চালু ছিল।

তিনি শরীর চর্চারও গুরুত্ব দিতেন। যেমন, পলো খেলার চর্চা। পলো হচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে একপ্রকারের বল খেলা। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে ঘোড়া সঞ্চালন শেখাতেন। শেখাতেন ঘোড়ার সামরিক ব্যবহার। এজন্য কোনো কোনো আলেম তাঁকে তিরস্কারও করতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, না, আসলে এর মাধ্যমে আমি মানুষকে আল্লাহর পথে জিহাদে উৎসাহিত করি। অনেক সময় ময়দানের জিহাদের প্রতি মন সায় দেয় না। এজন্য আমি তাদেরকে শরীরচর্চার মাধ্যমে জিহাদের তালীম দিই।

পিতার শাহাদতের পর ৫৪১ হিজরীতে তিনি আলেপ্পোর শাসনভার গ্রহণ করেন। এসময় ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর শাসিত সবগুলো অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে আসে না। কেননা, ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর ছিল চার পুত্র। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাইফুদ্দীন গাজী ও নুরুদ্দীন মাহমুদ। সাইফুদ্দীন গাজী মসুলের শাসনভার গ্রহণ করেন। আর নুরুদ্দীন গ্রহণ করেন আলেপ্পোর শাসনভার। ক্রুসেডারদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ ﷻ-ই যেন তাকে এখানে নিযুক্ত করেন। কেননা, তাঁর অন্তরে ছিল জিহাদের প্রবল আগ্রহ। তাঁর ভাই সাইফুদ্দীন গাজীও ছিলেন একজন পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি। তিন বছর মসুল শাসনের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সন্তানরা মসুলের শাসন ক্ষমতায় বসেন। ক্রুসেডার বিরোধী অভিযানে তারা সবসময় নুরুদ্দীন মাহমুদের সাথে থাকতেন।

নুরুদ্দীন মাহমুদ যখন আলেপ্পোর শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল ক্রুসেডারদের দখলে। পুরো ফিলিস্তিন ও লেবাননের অর্ধেক জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য।

তরাবলুস ও উত্তর সিরিয়ার আন্তাকিয়াও ছিল তাদের হাতে। তবে রুহা আমিরাতের পতন নুরুদ্দীনের পিতার যুগেই হয়েছিল। সে রাজ্যের শুধু তিল-বাশির শহরই ক্রুসেডারদের হাতে ছিল।

শাসনভার গ্রহণের শুরু থেকেই তাঁর মাথায় পিতার মত অভিন্ন বিষয় ঘুরপাক খেতে থাকে। তা হল 'ঐক্য ও জিহাদ'। তখনও এখানে তিনটি ক্রুসেডার রাজ্য বিদ্যমান। তবে সমস্যা ছিল এই যে, এসব ক্রুসেডার রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছতে হলে দামেশক তাঁর সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দামেশক ছিল মুসলমানদের পথের কাঁটা। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীও দামেশককে ইসলামী শাসনে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নুরুদ্দীন মাহমুদের সময় দামেশকের ক্ষমতায় ছিলেন আমীর মুজিরুদ্দীন ইবনু আবুক। তবে দামেশকে তার কোনো কর্তৃত্বই ছিল না। সবকিছু ছিল মুইনুদ্দীন আনারের হাতে। তিনি ছিলেন একজন ফেতনাবাজ, জালেম, শরীয়ত-বিরোধী ধূর্ত লোক। কখনও ক্রুসেডারদের সাথে, কখনও মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতেন। অর্থাৎ স্বার্থের জন্য তিনি বারবার পক্ষ পরিবর্তন করতেন। এ বিষয়টি ছিল নুরুদ্দীন মাহমুদের জন্য বড় সমস্যা। বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাত বা তরাবলুস আমিরাত পৌঁছতে হলে আগে পেছন দিক অর্থাৎ দামেশকের দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল তাঁর জন্য আবশ্যক।

আফসোসের বিষয়, ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর ক্রুসেডাররা রুহা আমিরাতের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেয়ে যায়। আর্মেনিয়ানদের সাথে আঁতাত করে ক্রুসেডাররা রুহা ভূখণ্ডের দিকে রওয়ানা হয়। অথচ নুরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী এদের সাথে খুবই নম্র আচরণ করেছিলেন। তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দেন এবং তাদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে খেয়াল রাখেন। বহাল রাখেন তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও। তাদের সাথে তিনি এমন আচরণ করেন, ক্রুসেডারদের থেকে যা আশাও করা যেত না। তবুও রুহা আমিরাতে নতুন করে ক্রুসেড অভিযান শুরু হয়। তবে নুরুদ্দীন মাহমুদ তার বাহিনী মোতায়েন করে ক্রুসেডারদের সমুচিত জওয়াব দেন। তাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে, ইমাদুদ্দীন জঙ্গী যদিও মারা

গেছেন; কিন্তু তিনি তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে একজন তাজা সিংহ রেখে গিয়েছেন। তিনি ক্রুসেডারদের পরাজিত করে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-পোষাক, হাতিয়ার ও গনীমত লাভ করেন। এটা ছিল নুরুদ্দীন মাহমুদের শাসনভার গ্রহণের প্রারম্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, ইসলামী ভূখণ্ড এখনও নিরাপদ নেতৃত্বেই রয়েছে।

এ পরাজয়ের পর ক্রুসেডাররা খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে যে, সামনে তাদের খুবই দুর্দিন। ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ আল-কুদসে সমবেত হয়। বিস্তারিত পরামর্শ হয় তাদের। শেষ পর্যন্ত তারা একমত হয় যে, ইউরোপের কাছে তাদের সহযোগিত প্রার্থনা করা আবশ্যক। তাদের বর্তমান শক্তি নুরুদ্দীন মাহমুদ ও তাঁর বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়।

পরামর্শ অনুপাতে ক্রুসেডাররা ইউরোপে সাহায্যের আবেদন পাঠায়। বার্তা পেয়ে পোপ তৃতীয় ইউজেনিয়াস বাহিনী প্রস্তুতের কাজ শুরু করে, ইতিহাসে যা 'দ্বিতীয় ক্রুসেডার অভিযান' নামে পরিচিত। প্রথম ক্রুসেড অভিযান প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান করেছিল পোপ দ্বিতীয় আরবান। দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযানের নেতৃত্বে ছিল ফ্রান্সের সম্রাট সপ্তম লুইস ও জার্মানি-অস্ট্রিয়ার সম্রাট তৃতীয় কনর‍্যাড। এটা ছিল খুব বড় ধরণের অভিযান। এজন্য জার্মানির সম্রাট পুরো ইউরোপ ঘুরে বেড়ায়। ক্রুসেড বাহিনী একপর্যায়ে এশিয়া মাইনরে এসে পৌঁছে। বায়যান্টাইন সম্রাট (অ্যালেক্সাস কমনেন-পুত্র) ইমানুয়েল তাদেরকে পথিমধ্যে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কেননা, আগের ক্রুসেড বাহিনী তাকে ইসলামী ভূখণ্ডের কিছুই দেয়নি। এবার সে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের ব্যাপারে নিজের ভূখণ্ড নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়ে। তবে সে বাধা প্রদানে ব্যর্থ হয়। অবশ্য সে জার্মান বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়। রোমান সালজুকদের সাথে দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয়। মুসলমানদের জাগ্রত জিহাদী স্পৃহার উত্তাপে জার্মান বাহিনীতে পালায়ন শুরু হয় এবং এই বাহিনীর মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য শেষ পর্যন্ত শামে পৌঁছতে পারে। অথচ যখন

তারা জার্মানি ও অস্ট্রিয়া থেকে বের হয়েছিল তখন তাদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ।

অপর দিকে ফরাসি বাহিনী সাগরপথে ইয়াফা এবং সেখান থেকে আল-কুদস এসে পৌঁছে। তারা আল-কুদসের খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হয়। কোথায় সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদকে প্রতিহত করবে, তা নিয়ে পরামর্শ শুরু করে। তখন নুরুদ্দীন মাহমুদের সাম্রাজ্য ছিল আলেপ্পো ও তার আশপাশের কিছু অঞ্চল। রুহা বিজয়ের পর সেটাও যুক্ত হয়েছিল। তাঁর ভাই সাইফুদ্দীন গাজী ছিলেন মসুলের শাসক। ভেবে-চিন্তে ক্রুসেডাররা এক বিরল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, দামেশক পুনরুদ্ধারের জন্য তারা শহরটি অবরোধ করবে। দামেশক তখন ছিল আমীর মুইনুদ্দীন আনারের শাসনাধীন। নুরুদ্দীন মাহমুদ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে দামেশকের পতন আবশ্যক। আগে দীর্ঘ সময় যা তাদেরই অনুগত হিসাবে শাসিত হয়েছে। তবে ক্রুসেডারদের চুক্তির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। সত্যি সত্যি তারা বাহিনী প্রস্তুত করে দামেশক অবরোধ করে বসে। মুইনুদ্দীন আনার তখন আশপাশের সবার কাছে সাহায্য প্রর্থনা করেন। কিন্তু কেউ তার আবেদনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অবশেষে তিনি নুরুদ্দীন মাহমুদের বড় ভাই সাইফুদ্দীন গাজীর কাছে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে পত্র পাঠান। সাইফুদ্দীন গাজী নিরাশ করেন না। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে দামেশক এসে পৌঁছেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর ভাই নুরুদ্দীন মাহমুদকেও সঙ্গে নেন। দামেশকের চারপাশে সবগুলো বাহিনী সমবেত হয়। তখন মুইনুদ্দীন আনার ক্রুসেডারদের কাছে বার্তা পাঠান। তাতে তিনি বলেন, যদি তোমরা এ অবরোধ না উঠাও, তা হলে আমি সাইফুদ্দীন গাজী ও নুরুদ্দীন মহামুদকে দামেশক সোপর্দ করব। তখন সম্মিলিত ইসলামী বাহিনীর মোকাবেলা করতে ক্রুসেডাররা ভয় পেয়ে যায়। যদিও সংখ্যা ছিল অনেক বেশি; তবুও আল্লাহ ﷻ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন। ফলে যুদ্ধ না করেই তারা দামেশকের আশপাশ থেকে সরে যায়; বরং নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়। এভাবে দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযান চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

নুরুদ্দীন মাহমুদ পথ চলতে থাকেন। ক্রুসেডারদের সাথে লড়াই করেন। ৫৪৫ হিজরী পর্যন্ত অনেকগুলো বিজয় অর্জন করেন। একযুদ্ধে আন্তাকিয়ার শাসক রাজা রেমন্ড নিহত হয়।

একবার এক ক্রুসেডারের আচমকা আক্রমণে নুরুদ্দীন পরাজিত হন। সেই ক্রুসেডারের নাম ছিল জোসেলিন। নুরুদ্দীনের বাবার হাতে রুহা আমিরাতের পতনের আগে সে ছিল রুহার রাজা। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে নুরুদ্দীন মাহমুদ পরিকল্পনা করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জন করেন। এমনকি জোসেলিন বন্দী হয়।

৫৪৮ হিজরী এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তা হল আসকালান শহরের পতন। আসকালান ছিল ফিলিস্তিনের একমাত্র শহর, তখনও পর্যন্ত ক্রুসেডারদের হাতে যার পতন ঘটেনি। ফিলিস্তিনের মাটিতে একমাত্র স্বাধীন শহর ছিল আসকালান। যদিও তা ছিল মিসরের উবায়দী সাম্রাজ্যের অধীন। উবায়দীরা তখন নুরুদ্দীন মাহমুদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। নুরুদ্দীন সেখানে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, দামেশক তাঁর ফিলিস্তিন বিশেষত আসকালান পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হয়। তখন নুরুদ্দীন মাহমুদ দামেশককে জিহাদের ঝান্ডাবাহী ইসলামী সাম্রাজ্যের সাথে মেলানোর সংকল্প করেন। দামেশক অভিযানের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করেন তিনি। ৫৪৯ হিজরীতে তিনি দামেশক অবরোধ করেন। তখন নুরুদ্দীনকে মোকাবেলা করার সাহস দামেশক বাহিনীর ছিল না। ফলে শহরের ফটকসমূহ খুলে দেওয়া হয়। শহরের ভিতরে জনগণ তখন নুরুদ্দীন মাহমুদের নামে শ্লোগান দিতে থাকে। দামেশকের জনগণ এতদিনে ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও নুরুদ্দীনের মর্যাদা বুঝতে পেরেছিল। এতগুলো বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দামেশকের জনগণ বদলাতে শুরু করে। দামেশক দুর্গের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা। মানুষ তাদের রবের দিকে ফিরে আসতে আরম্ভ করে। ফলে তারা নুরুদ্দীন মাহমুদকে ব্যাপক অভ্যার্থনার সাথে বরণ করে। এভাবে দামেশকের শক্তি ইসলামী শক্তির সাথে যুক্ত হয়। নুরুদ্দীন মাহমুদ দামেশক শহরকে নিজের

রাজধানী করেন। যাতে তিনি ক্রুসেডারদের দখলকৃত তরাবলুস ও ফিলিস্তিনের আরও নিকটবর্তী হতে পারেন।

নুরুদ্দীন মাহমুদ দামেশক জয় করলে দামেশকের শাসক মুজিরুদ্দীন আবুক ক্রুসেডারদের কাছে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সময় তার আর তেমন শক্তি ছিল না।

নুরুদ্দীন মাহমুদ ক্রুসেডারদের সাথে একের পর এক যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ৫৫৮ হিজরীতে আল-কুদসের শাসক তৃতীয় বাল্ডউইন মারা যায়। ইসলামী গ্রন্থাদির তথ্য অনুযায়ী তার পর ইমুরি বা আমুরি (Amalric or Amaury) আল-কুদসের রাজা মনোনিত হয়। এর সাথে মুসলমানদের বিশেষ কিছু কাহিনী আছে।

এ সময়ে নুরুদ্দীন মাহমুদের দৃষ্টি ছিল মিসরের দিকে। তিনি বুঝতে পারছিলেন মিসরের সহযোগিতা ছাড়া ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের পরাজিত করা বেশ কঠিন। তখন তিনি মিসরকে তার রাজ্যভুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কাজটি খুব কঠিন। কেননা, মিসর তখনও ছিল উবায়দীদের (ফাতিমীদের) শাসনাধীন। নুরুদ্দীন মাহমুদের শাসনভার গ্রহণের সময় উবায়দী সাম্রাজ্যের ১৮০ বছর পূর্ণ হয়েছিল। এই ১৮০ বছর মিসরে উবায়দীদের পা শক্তিশালী করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাই মিসর অভিযান তাঁর জন্য বেশ কঠিন ছিল। বিশেষ করে দুই সাম্রাজ্যের মাঝে বিদ্যমান ছিল ফিলিস্তিন। উত্তরে শাম, দক্ষিণে মিসর–মাঝখানে ফিলিস্তিন। স্বপ্ন থাকলেও তখন তা বাস্তবায়নের শক্তি নুরুদ্দীন মাহমুদের ছিল না। তবে আল্লাহ ﷻ তার পরিশুদ্ধ নিয়তের দরুণ এমনসব পরিস্তিতি সৃষ্টি করে দেন, যেগুলো মিসরকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব করে দেয়। একই সাথে ফিলিস্তিন স্বাধীন করার জন্য ক্রুসেডার বাহিনীকে দমন করার প্রস্তুতিও সহজ হয়।

আসুন, জেনে নিই, পরবর্তীতে কী ঘটতে যাচ্ছে?

মিসরকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে নুরুদ্দীন মাহমুদ কী পদক্ষেপ নেন?

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর প্রচেষ্টা

আমরা নুরুদ্দীন মাহমুদ শহীদ ﷺ-এর মত আদর্শ মুসলমান সম্পর্কে জানছিলাম। তিনি ইসলামী ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। আমরা তার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিসত্তা দেখতে পাই। যিনি স্থাপনা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জিহাদের সমন্বয়ে একটি আদর্শ ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা কেমন ছিল, তা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্রুসেডারদের উপর বিজয় অর্জন করতে হলে ইসলামী বিশ্বের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

আল-কুদসের মুক্তিই ছিল তার সার্বক্ষণিক চিন্তা। এজন্য তিনি বিশাল আকৃতির মনোমুগ্ধকর একটি মিম্বার নির্মাণ করেছিলেন, স্বাধীন করার পর মসজিদে আকসায় স্থাপন করার জন্য। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। যেন তারা এই মিম্বার মসজিদে আকসায় স্থাপনের স্বপ্ন দেখে। তিনি অনুভব করেছিলেন মিসরকে নিজের শাসনাধীন করতে না পারলে ফিলিস্তিন স্বাধীন করা প্রায় অসম্ভব। আগেই যেমন আমরা বলেছি, আল্লাহ ﷻ তার অন্তরের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অবগত ছিলেন। এজন্য ঘটনাপ্রবাহ তার অনুকূল করে দেন। ৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে) মিসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উবায়দী উজিরদের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। তাদের একজনের নাম ছিল শাওয়ার (Shawar) এবং আরেকজনের নাম ছিল দিরগাম (Dergham)। উজির দিরগাম অপর উজির শাওয়ারের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাহায্য প্রার্থনা করে। যা ছিল উবায়দীদের চিরাচরিত

অভ্যাস। যখন শাওয়ার বুঝতে পারে যে সবকিছু তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন সাহায্য চাওয়ার জন্য নুরুদ্দীন মাহমুদ ছাড়া আর কাউকে পায় না। স্বাভাবিকভাবে সে নুরুদ্দীন মাহমুদের শক্তি ও তাকওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চায়নি; বরং এ ছিল রাজনৈতিক বোঝাপড়া। যাইহোক, নুরুদ্দীনের কাছে সাহায্য চেয়ে সে বলে, যদি আপনি সফল হন এবং আমার মন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে দেন, তা হলে মিসরের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব আপনার। মিসরের অভ্যন্তরে আমি আপনার লোক হয়ে থাকব। তখন নুরুদ্দীন মাহমুদ মিসরের অভ্যন্তরে পা রাখার একটি সুযোগ পেয়ে যান। কাজেই তিনি শাওয়ারের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন এবং তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার কাছে একটি বাহিনীও পাঠিয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রধান ছিলেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর চাচা আসাদুদ্দীন শেরকোহ। এখানে আমরা সর্বপ্রথম ইতিহাসের পাতায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নাম দেখতে পাই। এ সময়ে তিনি ছিলেন তরুণ। বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। তিনি নুরুদ্দীন মাহমুদের যুগেই বেড়ে ওঠেন। নুরুদ্দীন তাঁর ব্যাপারে খুব আশাবাদী ছিলেন। তিনি সালাহুদ্দীনকেও তাঁর চাচা আসাদুদ্দীন শেরকোহ'র সাথে মিসরে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল মিসরকে নুরুদ্দীন মাহমুদের শক্তির সাথে যুক্ত করা এবং শাওয়ারকে সাহায্য করা।

এ পথে আসাদুদ্দীন শেরকোহ ও সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে বহু জটিলতা এবং একের পর এক শাওয়ারের খিয়ানতের সম্মুখীন হতে হয়। শেষে আসাদুদ্দীন শেরকোহ'র বাহিনী বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। কথামত শাওয়ারকে তার মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ক্ষমতা পাওয়ার পর শাওয়ার থেকে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায়। আসাদুদ্দীন শেরকোহকে শামে ফেরত পাঠাতে সে ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করতে থাকে। সত্যি সত্যি ক্রুসেডাররা শাওয়ারের ডাকে সাড়া দেয়। ফলে এক ভয়ঙ্কর সংকট দেখা দেয়। যাতে আসাদুদ্দীন শেরকোহ'র বাহিনী প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।

অপর দিকে একই সময়ে নুরুদ্দীন মাহমুদ আন্তাকিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। তিনি হারিম অঞ্চলে বিশাল একযুদ্ধে

ক্রুসেডারদের মুখোমুখি হন। শুরু হয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তরাবলুস ও বাইযান্টাইন সাম্রাজ্য থেকেও বহু খ্রিস্টান সৈন্য নুরুদ্দীন মাহমুদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে যোগ দেয়। ৫৫৯ হিজরীতে (১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে) রমাদান মাসে নুরুদ্দীন মাহমুদ 'হারিম যুদ্ধে' জয় লাভ করেন। এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এমনকি তিনি আন্তাকিয়ার শাসক তৃতীয় বোহেমন্ডকে বন্দী করেন। তরাবলুসের শাসক রেমন্ড এবং রোমানদের আমীরও বন্দী হয়।

আসাদুদ্দীন শেরকোহ এ বিজয়ের সংবাদ শুনতে পান না। শাওয়ারের বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে ক্রুসেডাররা তাকে বড় রকমে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি ক্রুসেডারদের সাথে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হন যে, তিনি মিসর ছেড়ে শামে ফিরে যাবেন। সত্যিই তিনি শামে ফিরে আসেন। তার স্মৃতিতে তখন শাওয়ারের বিশ্বাস-ঘাতকতার বেদনাদায়ক দৃশ্যগুলো ভাসতে থাকে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মিসর গমনের প্রচেষ্টা হয়। তৃতীয় বারের প্রচেষ্টায় আসাদুদ্দীন শেরকোহ মিসরের পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে সক্ষম হন। শাওয়ারকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উবায়দী শাসক আল-আযিদ বিল্লাহ ছিলেন তখন মিসরের খলিফা। যখন শেরকোহ শাওয়ারকে হত্যা করেন, তখন আসাদুদ্দীন শেরকোহকে মিসরের প্রধান উজির না করে খলিফার কাছে আর কোনো উপায় থাকে না।

স্বভাবতই পরিস্থিতি ছিল বিস্ময়কর। আসাদুদ্দীন শেরকোহ কুর্দী, সুন্নী মুসলিম ছিলেন। আবার জঙ্গীর অনুগত। অপরদিকে উবায়দী খলিফা ছিলেন ফাতেমী (শিয়া)। তার বাহিনীও ছিল উবায়দী। আসাদুদ্দীন শেরকোহও তাঁর বাহিনী নিয়েই এসেছিলেন।

আসাদুদ্দীন শেরকোহের মৃত্যুর পর উবায়দী শাসক আল-আযিদ বিল্লাহ শেরকোহের ভাতিজা সালাহুদ্দিন আইয়ুবীকে মিসরের প্রধান উজির বানানোর সুযোগ পান। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, সে তো তরুণ যুবক! মাত্র ২৭ বা ২৮ বছর বয়স। তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁর বাহিনীকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগানো যাবে। একইভাবে শাসন

বিন্যাসেও পরিবর্তন আনা যাবে। তবে উবায়দী শাসকের ধারণা ভেস্তে যায়। মুসলিম বিশ্বের এক বিস্ময়কর ব্যক্তি হিসাবে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি পর্যায়ক্রমে মিসরের পরিস্থিতি নুরুদ্দীন মাহমুদের অনুকূলে নিয়ে যেতে থাকেন। নুরুদ্দীন মাহমুদ তখন পুরো শাম শাসন করছিলেন। তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল দামেশক, হামাত, হিমস ও অন্যান্য অঞ্চল। মসুলের নিকটবর্তী বহু অঞ্চলও ছিল তাঁর শাসনাধীন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মাধ্যমে মিসরও তখন তাঁর প্রভাব বলয়ে। এ সময়ে নুরুদ্দীন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কাছে নির্দেশ পাঠান যে, যেন তিনি সেনাবহিনী পাঠিয়ে হেজায ও ইয়ামান নিজের শক্তির সাথে যুক্ত করেন।

উবায়দী সাম্রাজ্যের মধ্যেই সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বাহিনী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭১ খ্রিস্টাব্দে) সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সিদ্ধান্ত নেন উবায়দী (ফাতিমী) খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটাবেন এবং নিজেকে মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। বহু চেষ্টা এবং পরিকল্পনার পর এই খেলাফতের পতন ঘটাতে এবং নিজেকে মিসরের উপর অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। আর এভাবে মিসর থেকে ২০৮ বছরের উবায়দী আগ্রাসনের বিলুপ্তি ঘটে। তবে উবায়দীরা ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করে অনেকবার মিসর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সালাহুদ্দীন দৃঢ়ভাবে মিসরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন।

উবায়দী সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির মাত্র দুই বছর পরই ন্যায়পরায়ণ শাসক নুরুদ্দীন মাহমুদ দামেশকে ইন্তেকাল করেন। তবে তিনি তার বাসনা অনুযায়ী যুদ্ধের ময়দানে শহীদী মৃত্যু পাননি। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তাকে শহীদের প্রতিদান নসিব করেন।

১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরীতে (১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে) নুরুদ্দীন মাহমুদের মৃত্যুতে মুসলমানরা আঁতকে ওঠেন। তবে আল্লাহ ﷻ এই জাতির উপর দয়াশীল। তিনি মুজাহিদদের শিরোমণি, বাইতুল মুকাদ্দাস স্বাধীনকারী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

যেন তিনি নুরুদ্দীন মাহমুদের পর ঝাণ্ডা ধারণ করেন। এরপর ইসলামের পতাকার আর পতন হবে না।

ইসলামী ইতিহাসে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এক অনন্য ব্যক্তি। তিনি বৃহত্তর জিহাদের এমন এক প্রতীক, যা কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়। তাঁর ব্যক্তিসত্তা ছিল পরিপূর্ণ। নুরুদ্দীন মাহমুদ ও ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মত এবং ইসলামী ইতিহাসের অন্যান্য মুজাদ্দিদদের মত। তাঁর ভূমিকা পাবেন সালাতের মিহরাবে, পাবেন যুদ্ধের রণাঙ্গনে, পাবেন সংলাপের টেবিলে, পাবেন দরিদ্রদের মাঝে, পাবেন রাজা-বাদশাহর দরবারে। তিনি অধিকহারে আল্লাহর যিকির করতেন। জামাতে সালাত আদায়ের পাবন্দী করতেন। সুন্নত-নফল ও তাহাজ্জুদের এহতেমাম করতেন। অন্যের মুখে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন। তেলাওয়াত শুনে তাঁর অন্তর সন্ত্রস্ত হত। দীনের প্রতীকসমূহকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। আল্লাহ ﷻ-এর উপর সুধারণা রাখতেন। তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে লালন করতেন দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহর পথে যার সামান্য ভূমিকা আছে, তাকেও তিনি সম্মান করতেন। আলেমরা সব ছিলেন তাঁর বন্ধু ও আপনজন। তিনি ছিলেন ভদ্র। তাঁর ব্যবহার ছিল মাধুর্যপূর্ণ। তাঁর মজলিস ছিল চমৎকার। অহেতুক কথা-বার্তা থেকে সারা জীবন ছিলেন দূরে। ছিলেন মিষ্টভাষী। যুদ্ধের ময়দানে কঠোর হলেও, (অসামরিক ক্ষেত্রে) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, মমতাবান। এমনকি মানুষ তার দয়ার কথা উল্লেখ করে বলত, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অতিরিক্ত, সীমার চেয়ে বেশি।

তাঁর এই দয়া কিছু সংকট সৃষ্টি করেছিল, যার ভোগান্তি এই উম্মতকে পোহাতে হয়েছে। তিনি ছিলেন অতিউচ্চ মাত্রার সাহসী। এখানে আপনাদের কাছে তাঁর একটি বক্তব্য তুলে ধরছি, যা তিনি বেঁচে থাকতে বলতেন, যখন আল্লাহ ﷻ আমাকে এই দেশগুলো জয় করার এবং ক্রুসেডারদের পতন ঘটানোর তাওফীক দিবেন, আমার ইচ্ছা যে, আমি এই সাগরের (ভূমধ্য সাগরের) তরঙ্গমালা পাড়ি দিয়ে তাদের দ্বীপ আর অঞ্চলসমূহে পৌঁছে যাব। সেখানে তুলে ধরব আল্লাহর

কালিমা। দুনিয়াতে এমন একজন কাফেরও রাখব না, যে আল্লাহকে চেনে না।

সালাহুদ্দীন ছিলেন মিসরের শাসক, যা তখন ছিল নুরুদ্দীন মাহমুদের আমিরাতের অধীন। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ছিল যে অংশ, তা হল শাম। নুরুদ্দীন মাহমুদের ইন্তেকালের পর সালাহুদ্দীন দুটি বিষয়ে খুব ক্রুদ্ধ হন। প্রথম বিষয় হল আলেপ্পো ও শামের বড় একটি অংশের শাসনক্ষমতায় আমীররা মালিক সালিহকে বসায়। মালিক সালিহের আসল নাম ইসমাঈল। তিনি নুরুদ্দীন মাহমুদের পুত্র। তার বয়স তখন ছিল মাত্র ১১ বছর। স্বভাবতই এমন করুণ পরিস্থিতিতে শামের মত দেশের সিংহাসনে ১১ বছর বয়সী শিশুকে বসানো বিধি, বিবেক ও সমাজ— কোনো দৃষ্টিতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। শাম তখন মোকাবেলা করছিল ক্রুসেড যুদ্ধের; মোকাবেলা করছিল আন্তাকিয়া, তরাবলুস ও বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের। যদিও এই শিশু ছিল নুরুদ্দীন মাহমুদের ছেলে; তবুও তাকে ক্ষমতায় বসানো ছিল এমন কাজ, যা জনগণ ও আলেমসমাজকে খুশি করতে পারেনি। খুশি করতে পারেনি আল্লাহ ﷻ-কেও।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি সালাহুদ্দীনকে ক্রুদ্ধ করেছিল, তা হল ক্রুসেডারদের বানিয়াস দুর্গ অবরোধ করা। এটা সিরিয়ায় অবস্থিত একটি ইসলামী দুর্গ। এ দুর্গের অধিপতি ছিলেন শামসুদ্দীন ইবনু মুকাদ্দাম। তিনি ক্রুসেডারদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। সালাহুদ্দীন অনুভব করেন, নুরুদ্দীন মাহমুদ যা করে গিয়েছিলেন, তা শেষ হওয়ার পথে। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে শামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য, মিসরের সাথে শামকে নিজের আমিরাতে যুক্ত করা। ইতোমধ্যে নুরুদ্দীন মাহমুদের সাম্রাজ্যভুক্ত ইসলামী বিশ্ব পুরোটাই সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অধীনে চলে এসেছিল। যেমন, হেজায ও ইয়ামান প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

৫৭০ হিজরীতে তিনি শাম অভিমুখে রওয়ানা হন। দামেশক যদিও তখন আলেপ্পোর বাহিনীর অধীনে ছিল তবুও তিনি খুব সহজে দামেশকে প্রবেশ করেন। সালাহুদ্দীন শিশু মালিক সালিহকে পত্র

পাঠান। তিনি তাকে অবগত করেন যে, সে এমন কিছু করছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। মূলত তার পাশে এমন কিছু দরবারী লোক ছিল, যারা ক্ষমতা দখলে লালায়িত ছিল। তারা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে খুব শক্ত ভাষায় উত্তর পাঠায়, তুমি নুরুদ্দীন মাহমুদের এক বিশেষ গোলাম ছাড়া আর কিছু নও। তোমার উচিত তাঁর ছেলেকে দেখাশোনা করা এবং এই শিশুকে দেখাশোনা করার জন্য এই বাহিনী কাজে লাগানো।

সালাহুদ্দীন তাদেরকে খুব প্রজ্ঞাপূর্ণ জওয়াব দেন। বিষয়টি রূঢ়তার সাথে না নিয়ে তিনি তাদেরকে বলেন, আমি এ ভূখণ্ডে শুধু মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থেই এসেছি। তার মধ্যে নুরুদ্দীন মাহমুদের পুত্রের দেখাশোনাও অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সময় এই শিশুর মুসলমানদের শাসক হওয়া সমীচীন নয়।

অনেক দ্বন্দ্ব ও বিবাদের পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আলেপ্পো অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, তখন আলেপ্পোর শাসক ক্রুসেডারদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। চিন্তা করুন, নুরুদ্দীন মহামুদের ছেলে সাহায্য চায় ক্রুসেডারদের কাছে। সে ছিল এক ছোট্ট শিশু। করণীয় স্থির করতে অক্ষম। তবে তার পাশের দরবারীরা তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছিল। তারা তরাবলুস আমিরাতের শাসককে দূত পাঠিয়ে সংবাদ দেয়, সালাহুদ্দীন আলেপ্পো দখলে আসছেন। যদি তিনি আলেপ্পো দখল করে নেন, তা হলে তা ক্রুসেডারদের জন্য বিরাট কিয়ামত ডেকে আনবে।

তরাবলুসের শাসক সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে আলেপ্পো আসতে নিষেধ করে বার্তা পাঠান। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে সংক্ষেপে উত্তর দেন, আরে শুনে রাখুন! আমি ক্রুসেডারদের ভয় পাওয়ার লোক নই। অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাঁর বাহিনী বিন্যস্ত করে আন্তাকিয়া অভিমুখে বের হন এবং আন্তাকিয়া বাহিনীর উপর বিরাট বিজয় অর্জন করেন। বিপুল পরিমাণ যুদ্ধপোষাক ও গনীমত নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। তখন তরাবলুসের শাসক ফিরে আসেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে

যুদ্ধের চিন্তা মাথা থেকে ঝেরে ফেলেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে নিয়ে এই কাহিনী তরাবলুসের ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

এখানে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সামনে সেই চিন্তাই ছিল, যা ছিল নুরুদ্দীন মাহমুদ ও ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর সামনে। তা হল ঐক্য ও জিহাদ।

মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করতে থাকেন সালাহুদ্দীন। একই সময়ে ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধও অব্যাহত রাখেন। তবে তিনি বুঝে ফেলেন যে, শাম ও মিসরের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া ফিলিস্তিন ও ক্রুসেডারদের দখলকৃত অন্যান্য ভূখণ্ড স্বাধীন করা সম্ভব নয়। তিনি এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার পেছনে একাধারে বারো বছর ব্যয় করেন। ৫৭০ হিজরী থেকে ৫৮২ হিজরী পর্যন্ত। কিন্তু তিনি কখনও বলেননি যে, এই সময় খুব দীর্ঘ। এও বলেননি যে, ইসলামী বিশ্বের ঐক্য প্রচেষ্টায় মানুষ কখনও বিরক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর কোনো তাড়াহুড়া ছিল না। এ সময়ে তিনি ক্রুসেডারদের সাথে বড় ও চূড়ান্ত নয়, এমন কিছু লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। যাতে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে না যায়। তাঁর প্রধান লক্ষ ছিল ইসলামী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করা। তারপরও তিনি বেশকিছু যুদ্ধে ক্রুসেডারদের উপর বিজয়ী হন। ৫৭৩ হিজরীতে তিনি আসকালানে বিজয় অর্জন করেন। ৫৭৪ হিজরীতে তিনি হামাতের উপকণ্ঠে বিজয় অর্জন করেন। ৫৭৫ হিজরীতে বিজয় অর্জন করেন বানিয়াসের উপকণ্ঠে।

অবশেষে দীর্ঘ ১২ বছর পর ৫৮২ হিজরীতে ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি সফল হন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অধীনে সুদান, মিসর, হেজায, ইয়ামান, পুরো শাম, লেবাননের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ তুরস্কের কিছু অংশ সমবেত হয়। সেই সাথে শক্তি-সামর্থ্যসহ যুক্ত হয় মসুলও। এভাবে এক বৃহত্তর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, যা ক্রুসেডারদের পরিবেষ্টন করছিল। এমন সময় সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে ভাবতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এসবকিছু ছিলে এক বিখ্যাত লড়াইয়ের ভূমিকা। তা হল হিত্তীনের লড়াই। যা ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য প্রতীক।

আল-কুদসের শাসন ক্ষমতা নিয়ে সৃষ্ট কিছু বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী পূর্ণরূপে কাজে লাগান। শেষে আল-কুদসের শাসনভার এমন এক ব্যক্তির কাঁধে অর্পিত হয়, যার নেতৃত্বের প্রতি সবাই সন্তুষ্ট ছিল না। তার নাম গাই অব লুসিগনান (Guy of Lusignan)। বিশেষ করে তরাবলুসের রাজা রেমন্ড তাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। সে তাকে পরাজিত করতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। বিনিময়ে সে তাকে তরাবলুস আমিরাতের শাসনক্ষমতায় চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখার দাবি জানায়।

এখানে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বিশেষ সুযোগ পেয়ে যান। সত্যি সত্যি তিনি তরাবলুসের রাজা রেমন্ডের সাথে একমত হন। ক্রুসেডার বাহিনী যখন জানতে পারে তাদেরই একজন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে হাত মিলিয়েছেন, তখন বিষয়টি তাদের মধ্যে খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আমরা যেমন বলেছি যে, মিসর ও শাম ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বড় এক সমস্যা দেখা দেয়। তা হল রোনাল্ড ডি চ্যাটিলনের বিশ্বাস ঘাতকতা। ইসলামী ইতিহাসে সে আরনাত নামে প্রসিদ্ধ। আরনাত তখন দুটি বিশাল দূর্গের মাধ্যমে জর্ডান শাসন করত। দূর্গ দুটি হচ্ছে কার্ক ও শোবাক। এই দূর্গ দুটি মিসর ও শামের মধ্যবর্তী রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করত। হেজায গমনকারী হজযাত্রীদেরও লুণ্ঠন করত। বহু বিবাদ-বিতণ্ডা এবং বড় একটি লড়াইয়ের পর আরনাত ও সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মধ্যে তিন বছরের জন্য চুক্তি হয় যে, সে মুসলিম সেনাবাহিনী বা হজে গমনকারী মুসলমানদের কাফেলার উপর আক্রমণ করবে না। কিন্তু ক্রুসেডারদের স্বভাবমত আরনাত গাদ্দারী করে। হজের উদ্দেশ্যে মিসর থেকে হেজায গমনকারী এক বিশাল কাফেলাকে সে বন্দী করে। এ কাফেলায় বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, নারী ও শিশু ছিল। তাদের সবাইকে বন্দী করে আরনাত শোবাক দূর্গে আটকে রাখে। যখন তারা আরনাতকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি তো সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে সন্ধি করেছিলেন যে, মুসলমানদের নৌযান ও কাফেলায়

আক্রমণ করবেন না। তখন সে তাদেরকে বলে, তোমরা তোমাদের মুহাম্মাদের কাছে যাও। পারলে সে যেন তোমাদেরকে উদ্ধার করে।

লক্ষ্য করুন, ক্রুসেড অন্তরের কঠোরতা। তার এই কথা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কাছে গিয়ে পৌঁছে। তিনি কসম করেন যে, যদি আরনাত তাঁর হাতে পড়ে, তা হলে তিনি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবেন। আমরা সামনে দেখব, কীভাবে সময় সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে তাঁর রবের সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করে?

এসব ঘটনার পর মুসলমান ও ক্রুসেডারদের মধ্যে আবার এক উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ক্রুসেডারদের হাতে এই সন্ধি ভঙ্গ হয়। ফলে সালাহুদ্দীনের জন্য তাদেরকে প্রতিহত করার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। আর সত্যিই তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে টাইব্রিস অবরোধে বেরিয়ে পড়েন, যা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের অধীন। টাইব্রিস জয় করে ফেলেন তিনি। আর এখানে তিনি সৈন্য মোতায়েন শুরু করেন। মোতায়েনকৃত সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। ১২ হাজার তাঁর নিজের সঙ্গে টাইব্রিসে এবং দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ৮ হাজার। ক্রুসেডারদের তুলনায় তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে ক্রুসেডারদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশের অঞ্চলে ছিল আরও ৬৩ হাজার। তবে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন না। যাতে তারা ক্রুসেড রাজ্যের অভ্যন্তরে তার বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে না পারে। সেনাদের প্রদর্শনী শুরু করেন তিনি, যাতে ক্রুসেডারদের উত্তেজিত করে তুলতে পারেন। তখন ক্রুসেডাররা সমবেত হয় এবং বলাবলি করতে থাকে, টাইব্রিসের পতন কিছুতেই বোধগম্য নয়। সেখানকার দূর্গগুলোর পতন কীভাবে হতে পারে, অথচ টাইব্রিসে কিছু আমিরাতও রয়েছে। এসব বিষয় বড় ধরণের লজ্জায় ফেলে। কাজেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ঠিক এই সময়ে তরাবলুস আমিরাতের শাসক উপস্থিত হয়। তার ও সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মধ্যে তখন মৈত্রীচুক্তি ছিল। সে ঘোষণা করে যে, সে সালাহুদ্দীনকে দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে। এরপর পুনরায় সে

ক্রুসেডারদের সাথে যুক্ত হয়। আরনাতের সাথে তার মতবিরোধ থাকলেও ক্রুসেডাররা তাকে স্বাগত জানায়। যাহোক, টাইব্রিস হ্রদের কাছে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে লড়াইর উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে ক্রুসেডাররা। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীও এটাই চাইছিলেন। ক্রুসেডারদের উপর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ ﷻ এই সেনাপতির সবকিছু সহজ করে দেন।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যুদ্ধের ময়দান নির্বাচন করেন। ক্রুসেডারদেরকে তিনি এক কঠিন জায়গায় অবস্থান নিতে বাধ্য করেন। তিনি জানতেন যে, এমন এক জায়গায় লড়াই হতে যাচ্ছে, যেখানে টাইব্রিস হ্রদ ছাড়া অন্য কোথাও পানি থাকবে না। তিনি তাঁর বাহিনী হ্রদের চারদিকে মোতায়েন করেন, যাতে হ্রদের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এতে ক্রুসেড বাহিনী থেকে পানি বিচ্ছিন্ন থাকবে। জুলাই মাসে ক্রুসেডার বাহিনী যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। এখানে ক্রুসেডার বাহিনীর উপর সমবেত হয় পানিশূন্যতা ও তৃষ্ণা। সেই সাথে ছিল জুলাই মাসে আবহওয়ার উত্তাপ।

সালাহুদ্দীন তাদের দূরাবস্থা আরও বাড়িয়ে দেন। এ অঞ্চলের শুকনো ঘাসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। যাতে আগুন ও ধোঁয়ার তাপ তাদের দিকে ধেয়ে যায়। ফলে তারা একযোগে হামলা করতে বাধ্য হয় এবং ২৪ রবিউল আউয়াল ৫৮৩ হিজরী (৪ জুলাই ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর 'হিত্তীন যুদ্ধ'। মাত্র ১২ হাজার মুসলমান আর ৬৩ হাজার ক্রুসেডারের যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ধারণার চেয়েও অনেক বেশি।

চলুন, দেখা যাক কী ঘটে এই রণাঙ্গানে?

কী হয় এর ফলাফল?

ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের জওয়াব কী ছিল?

হিত্তীন যুদ্ধের বিস্ময়কর বিজয়ের পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পরবর্তী পদক্ষেপ কী ছিল?

হিত্তীন যুদ্ধ

আমরা আগে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মিসর, সুদান, শাম, হেজায, তুরস্কের কিছু অংশ ও মসুলকে কীভাবে একই সাম্রাজ্যে একিভূত করেছিলেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। কীভাবে তিনি একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য বাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলেন তা-ও তুলে ধরেছি। তিনি টাইব্রিস হ্রদের পাশে তাঁর বাহিনীকে সমবেত করেন। উপযুক্ত স্থান ও সময় বেছে নেন। ক্রুসেডারদের টেনে আনেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যেখানে যেভাবে চাইছিলেন, আল্লাহ ﷻ-ও তাদেরকে সেখানে নিয়ে আসেন, যাতে মুসলমান ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও চূড়ান্ত লড়াই সংঘটিত হয়ে যায়। ক্রুসেড হামলার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হিত্তীন যুদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন।

সালাহুদ্দীস আইয়ুবী ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবেলার চূড়ান্ত নকশা তৈরি করেন এভাবে যে, ক্রুসেডাররা মুসলমানদের মুখোমুখি হবে পানিহীন অবস্থায়। আপনারা যেমন বোঝেন যে, এই বিরাট বাহিনীর টিকে থাকার অন্যতম উপকরণই ছিল পানি। বিশেষ করে যখন সৈন্যসংখ্যা ছিল বিপুল। ৬৩ হাজার সৈন্যের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উত্তর ফিলিস্তিনের টাইবেরিয়াস পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ পানি সাথে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তারা এ অঞ্চলের কূপ ও হ্রদসমূহের উপর নির্ভশীল হতে বাধ্য ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহ ﷻ-এর মহিমায় এবং মহান বীর মুজাহিদ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কৌশলে এই পানি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে যায়।

এরপর সালাহুদ্দীন শুকনো ঘাসে আগুন জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। বাতাসের গতিও তখন ছিল তাঁর অনুকূলে। আগুনের ধোঁয়ার রোখ

ছিল পুরোপুরি ক্রুসেডার বাহিনীর দিকে। ফলে জুলাই মাসের আবহওয়ার উত্তাপ, পিপাসার তাপ এবং আগুন ও ধোঁয়ার উত্তাপ– সব তাদের উপর গিয়ে পতিত হয়। এজন্য তারা একযোগে মুসলমানদের উপর হামলে পড়ে। মুসলিম বাহিনীও ক্রুসেডার বাহিনীকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করে। ধুলো-বালি উড়তে শুরু করে। সর্বত্র তাকবীর ধ্বনি মুখরিত হয়। অবশেষে মুসলমানরা বিরাট বিজয় অর্জন করে।

হিত্তীনের ময়দানে তরাবলুসের শাসক ইসলামী বাহিনীর বেষ্টনির ফোকর খুঁজতে থাকে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে দূর থেকে দেখে ফেলেন। তিনি জানতেন যে, সে আসলে যুদ্ধ করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। কাজেই তিনি তার জন্য পালানোর ফাঁক তৈরি করে দেন। সেই ফাঁক দিয়ে তরাবলুসের রাজা চতুর্থ রেমন্ড বের হয়ে তরাবলুসের পথ ধরে। এভাবে ক্রুসেডার বাহিনী করুণ মুহূর্তে তাদের বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হারিয়ে ফেলে। এতে সমগ্র ক্রুসেড বাহিনীর উপরই নৈরাশ্য ছেয়ে যায়। তারা মুসলিম বাহিনীর তলোয়ারের অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এ যুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেন, তা ছিল একটি বিস্ময়কর বিজয়। ইতিহাসবিদদের ভাষ্যমতে যারা হিত্তীনের বন্দীদের দেখত, তাদের কাছে মনে হত, এ যুদ্ধে হয়তো কেউ নিহত হয়নি। আর যারা মৃতদেহ দেখত, তাদের কাছে মনে হত এ যুদ্ধে হয়তো কেউ বন্দী হয়নি। সীমার অতিরিক্ত বন্দী এবং নিহত হওয়ার কারণে এমন ধারণা হত। এই যুদ্ধে ৩০ হাজার ক্রুসেডার নিহত হয়। বন্দী হয় ৩০ হাজার। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী স্বেচ্ছায় চতুর্থ রেমন্ডকে রাস্তা করে দেওয়ায় তার সাথে মাত্র ৩ হাজার ক্রুসেডার পালাতে সক্ষম হয়।

এ যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক রাজা গাই ডি লুসিগনানকে বন্দী করেন। সে ছিল তৎকালীন মুসলিম ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার সাথে আরনাত নামে খ্যাত রোনাল্ড ডি চ্যাটিলনও বন্দী হয়। এই লোক মুসলমানদের সাথে আগে

গাদ্দারী করেছিল। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে ধরতে পারলে নিজ হাতে হত্যা করার শপথ করেছিলেন।

এসব গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদেরকে সালাহুদ্দীনের তাঁবুতে নিয়ে আসা হয়। মুসলিম জাতির ইতিহাসে এ ছিল এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষাৎ। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আজব পরিস্থিতিতে আরনাতের সাথে আজব সংলাপে লিপ্ত হন। তিনি তাকে বলেন, হে আরনাত! এই তো আমি, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষে বিজয়ী হয়েছি।

তার উপর তলোয়ার উঠানোর আগে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তার কাছে ইসলাম পেশ করেন। বলেন, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তা হলে বেঁচে যাবে। একটু চিন্তা করুন, এমন পরিস্থিতিতেও তিনি দাওয়াতের কথা ভোলেননি। কিন্তু আরনাত তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নিজের তলোয়ার দিয়ে এককোপে তার ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেন। এসময়ে আল-কুদসের রাজা গাই ডি লুসিগনানের মধ্যে চরম ভয় ঢুকে যায়। ভয় গোপন করতে ব্যর্থ হয় সে। কাঁপতে কাঁপতে তার এক পা আরেক পায়ের সাথে বাড়ি খেতে থাকে। বিষয়টি লক্ষ্য করে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে বলেন, ভয় পেয়ো না, কম্পিত হয়ো না। রাজাদের নিয়ম, তারা অন্য রাজাকে হত্যা করেন না।

তবে এই লোকটি সীমালংঘন করেছিল। সালাহুদ্দীন গাই ডি লুসিগনানের সাথে খুব নম্র ও দয়ার আচরণ করেন। সম্রাট হওয়ায় তাকে উপযুক্ত সম্মানও দেন। যদিও সে রাজা হয়ে বসেছিল বাইতুল মুকাদ্দাস জবর-দখলকারীদের এবং মুসলমানদের ভূখণ্ডের।

রবিউস সানীর ২৫ তারিখ। অর্থাৎ হিত্তীন যুদ্ধের লাগোয়া পরের দিন। সালাউহদ্দিন আইয়ুবী টাইবেরিয়াসের সবচেয়ে বড় দূর্গ জয় করতে রওয়ানা হন। তিনি এই দূর্গটি বাদে পুরা টাইবেরিয়াস আগে জয় করেছিলেন। এখন এর পতন ঘটান। এই দূর্গে মুসলমানদের সাথে প্রতারণাকারী তরাবলুসের শাসক চতুর্থ রেমন্ডের স্ত্রী ছিল। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে ইসলামী নিরাপত্তায় মুক্ত করে দেন এবং বলেন, ক্রুসেডার রাণীদের আমরা বন্দী করি না। রেমন্ডের স্ত্রী তরাবলুসে

পৌঁছার কয়েক দিন পরই রেমন্ড দুঃচিন্তা ও হতাশায় মারা যায়। ক্রুসেডার বাহিনী পুরোপুরি বিপর্যস্ত হওয়ার খবর শোনার পর থেকেই তার এ দুরাবস্থা হয়েছিল। এভাবে মুসলমানরা ক্রুসেডার বাহিনীর এক ধূর্ত লোক থেকে রেহাই পান।

হিত্তীন যুদ্ধের মাত্র ৫ দিন পর। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান এবং আক্কা অবরোধ করেন। এটা ছিল শামের ভূখণ্ডে সবচেয়ে সুদৃঢ় উপকূলীয় শহর। মুসলিম-অমুসলিম অনেকেই এ শহর জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ২৯ রবিউস সানী তিনি এই শহর অবরোধ করেন। পরের দিনই ৩০ রবিউস সানী তাঁর হাতে শহরের পতন ঘটে। শহরের ফটকগুলো খুলে যায়। মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করেন। মুসলমানদের প্রবেশের এই দিনটি ছিল জুমাবার। ক্রুসেড লড়াই শুরু হওয়ার পর সমগ্র শাম উপকূলে মুসলমানরা প্রথম জুমআর সালাত আদায় করেন। আক্কা থেকে সালাহুদ্দীন এই পরিমাণ গনীমত লাভ করেন, যার মূল্য নির্ণয় করা কঠিন। কেননা, আক্কা ছিল অনেক বড় বাণিজ্যিক শহর। ইতালিয়ান বণিকদের বিপুল ধন-সম্পদ ছিল এই শহরে।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আক্কা থেকে বের হয়ে নাসিরাহ শহর স্বাধীন করেন। এরপর স্বাধীন করেন কায়সারিয়া ও হাইফা। আক্কা দখলের পর আক্কাকে কেন্দ্র বানিয়ে তিনি এ অভিযানগুলো পরিচালনা করেন।

এরপর তাঁর ভাই আদিলের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি হলেন তাঁর ভাই আদিল ইবনু নাজমুদ্দীন আইয়ুবী। তাকে মিসরে রেখে তিনি শামে গমন করেছিলেন। আদিলকে তিনি হিত্তীনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিপর্যস্ত করে দেওয়ার সুসংবাদ পাঠান। আরও জানান যে, এখন তাঁর অবশিষ্ট অঞ্চল ও দুর্গগুলো জয় করার পালা। আদিলকে তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে আসার নির্দেশ দেন।

নির্দেশ পেয়ে আদিল বাহিনী নিয়ে মিসর থেকে চলে আসেন। তিনি সিনাই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। পথিমধ্যে ইয়াফায় ক্রুসেডারদের সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হন

এবং তিনি ইয়াফা স্বাধীন করেন। এরপর আদিল ইবনু নাজমুদ্দীন আইয়ুবী বাহিনী পাঠিয়ে নাবলুস শহরও স্বাধীন করেন।

হিত্তীন যুদ্ধের পর এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এসব অঞ্চল ছেড়ে লেবানন অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছিলেন। আমরা যেমন জানি যে, লেবাননের অর্ধেক তখন ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অধীন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সারফান্দ শহরে অভিযান চালান। এরপর ২১ জুমাদাল উলা তিনি সাইদা গিয়ে পৌঁছেন। অর্থাৎ হিত্তীন যুদ্ধের মাত্র কয়েক দিন পর। সাইদা স্বাধীন করে তিনি বৈরুত যাত্রা করেন। ৮ দিন অবরোধ করে রাখার পর বৈরুতের পতন নিশ্চিত করেন এবং সেটা মুসলমানদের সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন। এরপর জাবিল শহর তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করে। যা ছিল তৎকালীন তরাবলুস আমিরাতের অধীনে। এর আমীর হিত্তীন যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল এবং তাকে দামেশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমীরকে মুক্ত করার বিনিময়ে তিনি এ শহরের আত্মসমর্পনের প্রস্তাব করেন। সে এতে রাজি হয়ে যায়। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী জাবিলকে লেবাননের কাছে ন্যস্ত করেন। এরপর তিনি ফিলিস্তিনে আসেন। ১৬ জুমাদাল উখরা থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত আসকালান শহর অবরোধ করে রাখেন। এরপর সালাহুদ্দীনের হাতে আসকালানের পতন ঘটে। রামাল্লা স্বাধীন করার জন্য সৈন্য পাঠান তিনি। এরপর একে একে গাজা, তিবনিন, বেথেলহেম ও বাইত জিবরীন স্বাধীন করেন।

আপনারা কল্পনা করতে পারেন? মাত্র দুই মাসেরও কম সময়ে সমগ্র ফিলিস্তিন কি স্বাধীন করা সম্ভব? কিন্তু বাস্তবে এটাই ঘটেছিল। শুধু আল-কুদস বাদে ফিলিস্তিনে তখন আর কোনো অঞ্চল পরাধীন ছিল না। আল-কুদসে কয়েকটি দূর্গ বিদ্যমান ছিল। এক দূর্গের নাম ছিল কাওকাব। সফাদে ছিল আরেকটি ছোট দূর্গ। এরকম আরও কয়েকটি দূর্গ।

দুই মাসেরও কম সময়ে এসব ঘটে যায়। আমরা একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের বিস্ময় দূর হয়ে যায়, যখন আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কথা পড়ি—

> তোমরা তাদের হত্যা করনি; বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। যখন তুমি নিক্ষেপ করেছ, তখন তুমি নিজে নিক্ষেপ করনি; বরং নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ। যেন এর মাধ্যমে তিনি মুমিনদের উত্তম পরীক্ষা নিতে পারেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [সুরা আনফাল : ১৭]

সুতরাং আল্লাহ ﷻ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর উপর সাহায্য নাযিল করেন। আপনি যদি এই বিজয়ে বিস্মিত হয়ে থাকেন তা হলে রব্বুল আলামীনের শক্তির কথা চিন্তা করুন, যিনি কোনো কিছু হয়ে যেতে বললেই হয়ে যায়। শুধু প্রয়োজন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মত একজন আদর্শ সেনাপতি ও তাঁর বাহিনীর মত একটি মুজাহিদ-দল, যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য।

আমরা আগে যেমন বলেছি, ক্রুসেডারদের হাতে ফিলিস্তিনে কয়েকটি দুর্গ ও আল-কুদস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এজন্য সালাহুদ্দীন এবার সরাসরি– ফিলিস্তিনের মুক্তা, মুসলিম বিশ্বের মুক্তা– আল-কুদস অভিমুখে রওয়ানা হন।

তা হলে আল-কুদসে কী ঘটেছিল?

কীভাবে শহরটি অবরোধ করা হয়?

ফলাফল কী হয়েছিল?

আল-কুদসের অভ্যন্তরে তখনও ৬০ হাজার ক্রুসেডার সৈনিক বিদ্যমান ছিল। এরা সেই ৬৩ হাজারের কেউ নয়, যারা হিত্তীনের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল। আল-কুদস দীর্ঘ ৯২ বছর ধরে ক্রুসেডারদের দখলকৃত রাজধানী। তার মানে এটা ছিল অত্যন্ত দৃঢ় সাম্রাজ্য। এখানকার দূর্গগুলো উঁচু উঁচু এবং সেনাবাহিনী প্রশিক্ষিত ছিল। কেননা, এটা ছিল ক্রুসেডারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। এসব সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসা করে মাত্র ১২ হাজার সৈনিকের ছোট্ট একটি দল নিয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-কুদস গমন করেন। আল-কুদস শহর তিনি অবরোধ করেন, যার ভিতরে তখনও ছিল ৬০ হাজার নিয়মিত যোদ্ধা।

এ সংখ্যা নারী, শিশু ও ধর্মজাযক বাদে। এটা ছিল দুনিয়ার অন্যতম এক প্রাণচঞ্চল শহর।

৫৮৩ হিজরীর ১৫ রজব সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-কুদস অবরোধ করে শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করার আহ্বান জানান। আল-কুদসের পাদ্রী তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। দূত পাঠিয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে সে বলে– যে শহরে আমাদের ঈশ্বর মারা গেছেন, সেই শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

বাধ্য হয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী শহরের চারপাশে মিনজানিক স্থাপন করেন এবং উত্তর দিক থেকে আঘাত হানতে আরম্ভ করেন। টানা ১২ দিন পর্যন্ত আঘাত অব্যাহত থাকে। তখন ক্রুসেডারদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, নিঃসন্দেহে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে শহরের পতন ঘটতে যাচ্ছে। এসময় তারা সালাহুদ্দীনের কাছে শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন– আমি তোমাদের সাথে সেই আচরণই করব, দীর্ঘ ৯২ বছরে তোমরা এখানকার মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করেছ। তোমরা এখানকার অধিবাসীদের হত্যা করেছ।

তখন ক্রুসেডারদের নেতা বলে ওঠে– আমরা আমাদের সন্তান, নারী ও সমস্ত পশু হত্যা করব। তারপর বাইতুল মুকাদ্দাস জ্বালিয়ে দিয়ে বের হব। এখানকার ৫ হাজারেরও অধিক মুসলিম বন্দীকে আমরা জবাই করে ফেলব। এরপর আমরা বের হয়ে তোমাদের সাথে মৃত্যুর লড়াই লড়ব।

একথা শুনে সালাহুদ্দীন দ্বিধায় পড়ে যান। সহচরদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করেন। তারা পরামর্শ দেন, সমগ্র বাইতুল মুকাদ্দাস অর্পন করার পর আমরা জিযিয়া নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি। তারা অস্ত্র ছাড়া বের হবে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাদের মত গ্রহণ করেন।

তাদেরকে প্রস্তাব দেন যুদ্ধ সক্ষম ব্যক্তি দশ দিনার মুক্তিপণ দিয়ে নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে। নারী মাত্র ৫ দিনার মুক্তিপণ দিবে। শিশুর জন্য মাত্র ২ দিনার। ক্রুসেডাররা তাঁর এ প্রস্তাবে একমত হয়।

আল-কুদসের সমস্ত প্রবেশ ও বাহির-পথে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেন। আল-কুদসে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করা হয়। এই ঘটনা ঘটে ৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব। হিত্তীন যুদ্ধের মাত্র আড়াই মাস পর।

ক্রুসেডাররা বের হতে শুরু করে। শহরের এই হস্তান্তর ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। মনে আছে, ক্রুসেডাররা যখন আল-কুদসে প্রবেশ করেছিল তখন তারা এখানকার অধিবসীদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল? অথচ এখন আমরা দেখি, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ﵀ তার অঙ্গীকার ষোলো আনা রক্ষা করছেন। মানুষের জানের পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছেন। রানীদেরকে বিনাশুল্কে এবং কোনো প্রকার মানহানী না করে মুক্ত করছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের বন্দী শাসক গাই ডি লুসিগনান-এর স্ত্রীকে মুক্ত করে দেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে নিহত হওয়া আরনাতের স্ত্রীকেও মুক্ত করে দেন। অনেক দরিদ্র খ্রিস্টানের মুক্তিপণ মাফ করে দেন, যাদের জিযিয়া দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। মুসলমানদের হাতে আল-কুদসের একটি গীর্জারও কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হয় না।

আল-কুদসের পাদ্রী ইরাক্লোসকে বহন করে বের করা হয়। কারণ, তখন তার সাথে এই পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার ছিল যে, তার জন্য হাঁটা সম্ভব ছিল না। তৎকালীণ পাদ্রী ও ধর্মজাযকরা খ্রিস্টানসমাজে সবচেয়ে ধনী ছিল। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তার কাছ থেকেও মাত্র ১০ দিনার মুক্তি পণ নেন। মানুষ বলতে থাকে, সে তো বিশাল ধনভাণ্ডার নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাদেরকে এমন একটি কথা বলেন, যা তার জীবনের আদর্শ ফুটিয়ে তোলে। তিনি তাদের বলেন— আমি তার সাথে প্রতারণা করব না। আমি বলেছি, অস্ত্র ছাড়া যে যা পারে, নিতে পারবে।

কাজেই এই পাদ্রী তার সমস্ত স্বর্ণালংকার সাথে নিয়ে বের হয়; কিন্তু সালাহুদ্দীন ﵀ তার সাথে প্রতারণা করেননি। আর এজন্যই এমন লোকেরা বিজয়ী হন। এরপর তিনি তাদের সাথে শক্তিশালী ইসলামী রক্ষিবাহিনী দিয়ে দেন, যাতে আল-কুদস থেকে বের হওয়া এই লোকগুলো নিরাপদে সুর শহরে পৌঁছতে পারে এবং কোথাও কেউ

তাদের উপর চড়াও না হতে পারে। তা হলে তারা আবার সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে।

তা হলে ইনি কোন লোক?

তিনি সেই লোক, আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন।

এ দীর্ঘ সময়ে মসজিদে আকসাকে ক্রুসেডাররা গোডাউনে পরিণত করেছিল। আশপাশে অনেক টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করে তার অবমাননা করেছিল। এসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মসজিদকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পূর্ণ এক সপ্তাহ লেগে যায়। তারপর উন্নত মানের গালিচা বিছানো হয়। আসন্ন জুমায় খতীবের বক্তব্য প্রদানের জন্য একটি কাঠের মিম্বার স্থাপন করা হয়। এ মিম্বারটি ছিল অস্থায়ী। যে যাবৎ না সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নুরুদ্দীন মাহমুদ নির্মিত সেই ঐতিহাসিক মিম্বারটি নিয়ে আসেন। যেটা নির্মাণই করা হয়েছিল আজকের এই মহান দিনের জন্য। তিনি আল-কুদসের সমস্ত মসজিদের পুনঃনির্মাণ শুরু করেন।

পরবর্তী জুমার দিন। ৪ শাবান ৫৮৩ হিজরী। খতীব মুহিউদ্দীন আবুল মাআলী আল-কুরাশী ﷺ আল-কুদসের ভূখণ্ডে আগ্রাসনের দীর্ঘ ৯২ বছর পর প্রথম জুমার খুতবা দেন। এ খুতবায় তিনি মহান বিজয়ের উপর আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা করেন। এ খুতবা ছিল খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ। পূর্ণ খুতবা তুলে ধরার মত অবকাশ এখানে নেই। তবে আমি সেই খুতবার ভূমিকা তুলে ধরছি। তিনি বলেন—

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সাহায্য করে ইসলামকে সম্মানিত করেন; যিনি গযব দিয়ে শিরককে লাঞ্ছিত করেন; যিনি নিজ আদেশের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনা করেন; যিনি কৃতজ্ঞতার উপর নিয়ামত স্থায়ী করেন; যিনি সুকৌশলে কাফেরদেরকে অবকাশ দেন। যিনি নিজের ইনসাফে সময়কে পরিবর্তনশীল করেছেন; যিনি নিজের অনুগ্রহে শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন; যিনি নিজের বান্দাদের উপর আপন ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছেন। যিনি সমস্ত ধর্মের উপর নিজের মনোনীত দীনকে বিজয়ী করেছেন। ...

এ খুতবায় এমন অনেক কথা ছিল, যেগুলো এই ইসলামী বাহিনীর প্রশংসা করে এবং এই বাহিনীকে অব্যাহতভাবে আল্লাহর প্রশংসা করতে উৎসাহ দেয়। খুতবার শেষে ছিল সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্য চমৎকার এক দুআ। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুলতানকে, আপনার ভয়ে সন্ত্রস্ত বান্দাকে দীর্ঘজীবী করুন।

তিনি এখানে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। তা হল, তিনি আল্লাহ ﷻ-এর বান্দা, যাকে তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি খুতবায় বলেন—

> হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুলতান, আপনার ভয়ে সন্ত্রস্ত বান্দা, আপনার নিয়ামতের শোকর আদায়কারী, আপনার অনুদানের কথা স্বীকারকারী, আপনার উন্মুক্ত তলোয়ার, আপনার উজ্জ্বল নক্ষত্র, আপনার দীনের হেফাযতকারী, আপনার হারাম (বাইতুল মুকাদ্দাস)-এর পক্ষে আত্মবিসর্জনকারী প্রতিরোধক, মহান নেতা, বিজয়ী সম্রাট, ঈমানের দাবি পূরণকারী, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ, ইসলাম ও মুসলমানদের সুলতান, বাইতুল মুকাদ্দাস পবিত্রকারী, আবুল মুযাফফার ইউসুফ ইবনু আইউব, আমীরুল মুমিনীনকে দীর্ঘজীবী করুন।

এ খুতবা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে প্রার্থনা করি, যেদিন আমরা আবার বাইতুল মুকাদ্দাস স্বাধীন করব, তিনি যেন আমাদেরকে এমন আরও একটি খুতবার তাওফীক দেন।

আমি এখানে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সেই পরিশ্রম ও কুরবানীর কথা, যা ব্যয় করেছেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও তাঁর আগে মওদুদ এবং তাঁর আগে বহু মুজাহিদ। এরপর নুরুদ্দীন মাহমুদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁরা নিজ চোখে বিজয় দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু এসব ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছিল, অথচ তখনও হয়তো সালাহুদ্দীনের জন্মও হয়নি।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর বিজয়কালে ৫৩২ হিজরীতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম হয়। অর্থাৎ ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর শাহাদাতের মাত্র ৯ বছর আগে।

এভাবে দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের পর আল্লাহ ﷻ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে এই সংগ্রামের ফল তোলার জন্য মনোনীত করেন। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাঁর অন্তরে এবং যাদেরকে তিনি এই বিজয়ের জন্য গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের অন্তরে এখলাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এখানেই সব-কিছুর শেষ ছিল না। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-কুদসের পরিস্থিতি সুবিন্যস্ত করেন। প্রাচীরগুলো সুরক্ষিত করেন। আল-কুদসের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন।

এরপর রামাদান মাসে আবার সুর শহর অবরোধের জন্য রওয়ানা হন। যে শহর এখান-সেখান থেকে পালাতক সব ক্রুসেডারকে আশ্রয় দিত। ফলে বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডার এখানে জড়ো হয়েছিল। ৫৮৩ হিজরীর রামাদান মাসে সালাহুদ্দীন সুর শহর অবরোধ করেন। সুর শহর ছিল খুবই সুরক্ষিত। সমুদ্রের দিক থেকে এর বড় আকারে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়। এ সময়ে সেনাপতিরা জমা হন। তাঁরা তাকে বলেন, হিত্তীন যুদ্ধের পর ইসলামী বাহিনী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এরপরও তারা ফিলিস্তিনে দীর্ঘ লড়াই ও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ে সীমাহীন পরিশ্রম করেছে।

তারা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে সেনাবাহিনী নিয়ে পিছপা হওয়ার এবং অবরোধ তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি যদিও অবরোধ তুলে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন না, তবুও বাধ্য হয়ে তাদের সাথে একমত হন। সুর শহরকে এভাবে ফেলে যাওয়া ছিল এই মহান বীরের জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল। এখানে বিরাট সংখ্যায় ক্রুসেডাররা বিদ্যমান ছিল। এই সুর শহরই পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নতুন করে ক্রুসেড যুদ্ধের বীজ বোপন করে। আসলে তেজী ঘোড়াও হোঁচট খায়।

৫৮৪ হিজরীর শুরুর দিকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী অনবরত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং ফিলিস্তিনের ওইসব শহর ও দূর্গ জয় করেন, যেগুলোর কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের সাথে যেগুলো অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি লেবাননের কাওকাব ও জাবাল্লাহ স্বাধীন করেন। সিরিয়ার লাতাকিয়া শহর স্বাধীন করেন। এরপর আন্তাকিয়া অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। যদি আন্তাকিয়ার

শাসক বিপুল সংখ্যক মুসলিম বন্দী মুক্তির মাধ্যমে সীমিত সময়ের জন্য তাকে সন্ধির প্রস্তাব না দিত, তা হলে তিনি আন্তাকিয়া অভিযান করতেন। তার সন্ধির প্রস্তাবে তিনি অভিযান মুলতবি করেন এবং মুসলিম বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে তার সাথে সন্ধিবদ্ধ হন।

এই বছরই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাই ডি লুসিগনানকে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার শর্তে মুক্তি দেন। সে এ শর্ত মেনে নেয়। কিন্তু মুক্তি পেয়ে শর্ত ভঙ্গ করে এবং সুর শহরে গিয়ে ওঠে। সে-ই পরবর্তীতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। আফসোস! যদি মুসলমানরা তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিত!

এ বছর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-কুদসে ঈদুল আযহা উদযাপন করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ ঈদ উদযাপিত হয় খুব আনন্দঘন পরিবেশে। তবে এ ঈদে তিনি গত বছরের সুর অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার কারণে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এ সুর থেকে তাঁর দিকে বড় কোনো অনিষ্ট ধেয়ে আসছে। কেননা, গাই ডি লুসিগনান সেখানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর এ আশঙ্কা ভুল ছিল না। ক্রুসেডাররা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নতুন করে সমবেত হতে শুরু করে। তারা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হয় না। ইউরোপেও সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ফলে ইউরোপে নতুন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের প্রস্তুতি। যে যুদ্ধে ইউরোপের বড় বড় সম্রাটরা মুসলমানদের সাথে লড়বার জন্য আসছে।

আসুন, দেখে নিই তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে কী ঘটে?

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী কীভাবে এ হামলার মোকাবেলা করেন?

এ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের হাতে কতগুলি শহরের পতন ঘটে?

মুসলমানরা কতগুলো শহর থেকে তাদেরকে প্রতিহত করতে পারেন?

সুর অবরোধ তুলে নেওয়া ও ক্রুসেডারদের নতুন ধৃষ্টতা

ইতোপূর্বে আমরা পুরো ফিলিস্তিনের স্বাধীন করতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ইতিহাস জেনেছি। আমরা হিত্তীনের ঐতিহাসিক যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করেছি। মাত্র এক-দুটি দুর্গ বাদে সমগ্র ফিলিস্তিনী উপকূল মুক্ত করার বিস্ময়কর দাস্তানও আমরা পেশ করেছি। এরপর পবিত্র আল-কুদস শহর তিনি স্বাধীন করেন। তিনি এমন এমন সাফল্য অর্জন করেন, ইতিহাসে যেগুলো মুসলমানদের রক্ত ও ঘাম দিয়ে লেখা হয়েছে। এগুলো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অন্যতম বড় বিজয়।

আমরা বলেছি যে, তিনি সমগ্র বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ সাম্রাজ্যের সীমান্ত শুধু ফিলিস্তিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং লেবাননেরও অর্ধেক আয়তন ছিনিয়ে নিয়েছিল। এজন্য তিনি বাহিনী নিয়ে লেবাননের দিকে অগ্রসর হন। স্বাধীন করেন বৈরুত, সাইদা ও লেবাননের অন্যান্য শহর। এমনইভাবে তিনি কার্ক ও শোবাক দুর্গও স্বাধীন করেন, যেগুলো বর্তমান জর্ডানে অবস্থিত। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের অবশিষ্ট অংশের উপর দৃষ্টি রাখছিলেন।

এখন আমরা সেই দুর্ভোগ নিয়ে আলোচনা করব, যা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জীবদ্দশাতেই মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত হয় এবং তাঁর পরেও।

নিঃসন্দেহে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী উল্লিখিত বিজয়গুলোতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। তবে তিনিও ছিলেন অন্যদের মত মানুষ এবং ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। আমরা বলছি না যে, আমরা তাঁর ভুল ধরছি,

অথবা এমনও নয় যে, আমরা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পর্যায়ে উঠতে পারব, এজন্য তাঁর কাজ ও কথা নিয়ে আপত্তি করছি। কিন্তু ইতিহাস কাজটি করেছে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ কিছু মতামত তুলে ধরেছেন। ব্যক্ত করেছেন তার কিছু সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাবের কথা। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মহান ব্যক্তিত্ব আর সুউচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর খুদে ভুলগুলো উল্লেখ করছি, যেগুলোর নেতিবাচক প্রভাব ছিল ব্যাপক।

সেগুলোর মধ্যে যেমন তিনি সুর শহর জয় না করে ফেলে চলে আসেন। আমরা আগেই বলেছি, সুর শহর ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের অধীন লেবাননের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। বহু ক্রুসেডার সেখানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

হিত্তীনের যুদ্ধে যখন ক্রুসেডারদের পরাজয় হয়, তখন ফিলিস্তিনের বিভিন্ন উপকূলীয় শহর ও অন্যান্য স্থান থেকে পালিয়ে তারা এখানে এসেছিল। এমনকি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সুর শহর অবরোধও করেছিলেন। কিন্তু তার বাহিনী দীর্ঘ অবরোধে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। তারা বিশ্রামের আবেদন জানায় এবং অবরোধ তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। বিশেষ করে এ অবরোধ ছিল শীতকালে। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাদের কথা মেনে নেন। তবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা তাঁর উচিত হয়নি। কারণ, সিংহভাগ ক্রুসেড শক্তি ছিল এই সুরে। তাঁর বাহিনীর উচিত ছিল ক্লান্তি নিয়েও জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। যাতে বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের পুরোপুরি মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু যা ঘটে, তা হল তারা শহরটি ছেড়ে দেন। ফলে এ শহরই ফিলিস্তিন ও শামে নতুন করে ক্রুসেড হামলার আখড়ায় পরিণত হয়।

যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়বেন, তিনি দেখতে পাবেন যে, এর আগে আন্দালুসে হুবহু ঘটনা ঘটেছিল। মুসলমানরা সাখরা নামের এক ক্ষুদ্র অঞ্চল বিজয় না করে চলে আসেন। পরবর্তীতে এই সাখরা থেকেই আন্দালুসের পতন হয়।

সুর অবরোধ অব্যাহত না রাখায় সালাহুদ্দীন নিজেই পরবর্তীতে দুঃখ প্রকাশ করেন। ক্রুসেডাররা নিজেদেরকে সুরে জড়ো করতে থাকে।

একপর্যায়ে তাদের সংখ্যা বহু হাজারে পরিণত হয়। এখানে মনে করিয়ে দিই, আল-কুদস থেকে যেসব অশ্বারোহী অক্ষত বের হয়েছিল, তারাই ছিল ৬০ হাজার। এবার ভেবে দেখুন, ইয়াফা, হাইফা ও আক্কাসহ ফিলিস্তিসের বিভিন্ন জায়গার ক্রুসেডাররা এখানে এসে সমবেত হলে তাঁদের সংখ্যা কত দাঁড়াবে! তখন অবশ্যই তারা কোনো সংকট সৃষ্টি করতে পারবে।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী দ্বিতীয় যে ভুলটিতে পতিত হন, তা হল প্রায় আট মাস বন্দী রাখার পর বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাতের সম্রাট গাই ডি লুসিগনানকে ছেড়ে দেওয়া। মুক্ত করে দিলে সে ফ্রান্সে চলে যাবে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তার সাথে এই মর্মে একমত হন। অথচ ক্রুসেডারদের ব্যাপারে সালাহুদ্দীনের বিরাট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি জানতেন যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। গাই ডি লুসিগনানের কথায় ভরসা করা তাঁর জন্য সমীচীন হয়নি। বিশেষ করে সুরে বিরাট বাহিনী থাকাবস্থায়। বাস্তবে সেটাই ঘটে। গাই ডি লুসিগনান চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ফ্রান্স না গিয়ে সুরে আস্তানা গাড়ে। সুর শহরে অবস্থান করে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকে এবং নতুন করে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে লড়াই শুরু করে।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুই বছর পর। ৫৮৫ হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝি গাই ডি লুসিগনান তার ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে সুরের নিকটবর্তী ফিলিস্তিনী শহর আক্কা অভিমুখে বের হয়। শহরটি উত্তর ফিলিস্তিন থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। তার প্রতারণার এই ঘটনায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবী খুব ক্ষিপ্ত হন। তিনি আক্কা শহর রক্ষা করার উদ্যোগ নেন। বাহিনী নিয়ে আক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন তিনি। একটি অগ্রবর্তী বাহিনীও পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা ক্রুসেডারদের আগেই আক্কায় পৌঁছতে পারে। এই অগ্রবর্তী দল ক্রুসেডারদের আগেই আক্কা পৌঁছে যায়। তারা শহরে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অবস্থান নেয়। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে মুসলমানদের বাহিনীর মূল শক্তি পৌঁছার আগেই ক্রুসেডাররা পৌঁছে যায় এবং তারা আক্কা শহর চর্তুদিক থেকে অবরোধ করে

ফেলে। এর তিন দিক ছিল স্থল, আর এক দিকে ছিল সমুদ্র। সেখানেও ক্রুসেডারদের নৌবহর মোতায়েন ছিল। ফলে খুব শক্তিশালী অবরোধের মুখোমুখি হয় আক্কা শহর, যার ভিতরে ছিল মুসলমানরা।

দৃশ্যপট সম্পূর্ণ উল্টে যায়। দুই বছর আগে আমরা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে আক্কা অবরোধ করছিলাম। তখন আক্কার পতন হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলমানরা জয়লাভ করে বিপুল পরিমাণ গনীমত অর্জন করে। আর এখন ক্রুসেডাররাই আক্কা অবরোধ করে রেখেছে। মুসলমানদের উপর এই অবরোধ দীর্ঘ হতে থাকে। এরপর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাঁর বাহিনী নিয়ে আগমন করেন। তিনি আক্কা উদ্ধার করতে এবং অবরোধ ভাঙতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের শক্তি ও সংখ্যা বড় হওয়ায় তিনি ব্যর্থ হন। শেষে আক্কার মুসলিম নিরাপত্তা প্রধান অবরোধের পূর্ণ দুই বছর পর ক্রুসেডারদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তার নাম ছিল সাইফুদ্দীন মাশতুব।

এখানে আমি বলতে চাই, এই পরিস্থিতি– সুর শহরে ক্রুসেডারদের অবস্থান, তাদের মধ্যে গাই ডি লুসিগনানের উপস্থিতি এবং বাইতুল মুকাদ্দাস আমিরাত পুনরুদ্ধারের উদ্দীপনার কারণে আরও একটি ঘটনা ঘটে যায়। তা হল বাইতুল মুকাদ্দাসে ক্রুসেডারদের সাহায্যের জন্য ইউরোপের ঐক্য। এটা ছিল তৃতীয় বৃহত্তর ঐক্য।

ইউরোপের প্রথম ঐক্য যেটা ছিল, সেটাকে আমরা প্রথম ক্রুসেড অভিযান নাম দিয়ে থাকি। যা মুসলিম বিশ্বের উপর আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। সেটা ছিল খুব সফল অভিযান। যার ফলে ইসলামী বিশ্বে চারটি ক্রুসেড সাম্রাজ্য অস্তিত্ব লাভ করে।

আর দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযান ছিল রুহা আমিরাতের পতনের পর। নুরুদ্দীন মাহমুদ এ অভিযান প্রতিহত করেন এবং একে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হন। এই অভিযানের কোনো ফলাফল ছিল না।

আর ইউরোপের এবারের আয়োজন তৃতীয় ক্রুসেড অভিযান। যা সুর ও আক্কার ক্রুসেডারদের সহায়তার জন্য প্রেরিত হতে যাচ্ছে।

এখনকারটা হচ্ছে তৃতীয় ক্রুসেড অভিযান, যা আক্কা ও সুরে ক্রুসেডারদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়। এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকে বিশাল সেনাবাহিনী। তার মধ্যে অস্ট্রিয়া ও জার্মানি সাম্রাজ্যের বাহিনী ছিল উল্লেখ করার মত। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল ফ্রেডরিক বারবারোসা। ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত এক রাজা। এ অভিযানের অপর সেনাপতি ইতিহাসের খুবই পরিচিত এক ব্যক্তি। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড। 'লায়নহার্ট' ছিল যার উপাধি। অপর সেনাপতি ছিল ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্ট। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল রাজা-বাদশাহদের অভিযান। এর প্রত্যেক সেনাপতি ছিল হয়তো রাজা অথবা ইউরোপের কোনো গভর্নর।

তৃতীয়টি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রুসেড অভিযান। জার্মানি ও আস্ট্রিয়ার সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লাখ। যা ছিল খুব শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর। ইউরোপের বিস্তৃর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে কর্তৃত্ব চালাত এই বাহিনী। তবে আল্লাহর লীলা উপলব্ধির বাইরে– তোমার রবের সৈন্যের রহস্য শুধু তিনিই জানেন। [সুরা মুদ্দাসসির: ৩১]

এই বাহিনী এশিয়া মাইনরে প্রবেশের পর রাজা ফ্রেডরিক বারবারোসা এক নদীতে গোসল করতে নেমে ডুবে মারা যায়। এতে অস্ট্রিয়ার বাহিনীর মারাত্মক বিপত্তি ঘটে। সেনাপতি ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। এশিয়া মাইনর, শাম ও অন্যান্য এলাকার মুসলমানরা এই বাহিনীর উপর নজরদারী করার সুযোগ পান। মূলত হিত্তীনের উদ্দীপনা ও বিজয়ের কারণে মুসলমানরা জার্মানি-অস্ট্রিয়ার বাহিনীর উপর বিরাট বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হন। অস্ট্রীয় বর্ণনা মতে এই বাহিনীর দুই লাখ সৈন্যের মধ্য থেকে মাত্র ৫ হাজার শেষ পর্যন্ত আক্কা গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল। অর্থাৎ প্রায় একলাখ ৯৫ হাজার জার্মান-অস্ট্রীয় সৈন্য পথিমধ্যে ধ্বংস হয়ে যায় এবং বেঁচে থাকে মাত্র পাঁচ হাজার।

কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসি বাহিনী ছিল মুসলমানদের জন্য বড় বিপদ। তারা ছিল সমগ্র ইউরোপের সবচেয়ে বড় বাহিনী। এই বাহিনী আক্কার সমুদ্র-উপকুলে পৌঁছে এবং জল ও স্থল উভয় দিক থেকে আক্কা শহর অবরোধ করে। ফলে বাধ্য হয়েই শহরের নিরাপত্তা প্রধান সাইফুদ্দীন মাশতুব সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রুসেডারদের

সাথে সন্ধি করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এই সন্ধির পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অবগতি ছাড়াই চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। কারণ, চতুর্দিক থেকে আক্কা ক্রুসেড বাহিনীর মাধ্যমে বেষ্টিত হয়ে পড়ায় মুসলমানদের দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ কঠিন হয়ে পড়ে। এই সন্ধির মাধ্যমে সাইফুদ্দীন মাশতুব পুরো আক্কা শহর ক্রুসেডারদের হাতে সোপর্দ করেন। সব অস্ত্র-শস্ত্রও তাদের কাছে অর্পণ করেন। ক্রুসেডাররা যেসব মুসলমানকে বন্দী করেছিল তাদেরকে মুক্ত করতে তিনি ২ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করতেও রাজি হয়ে যান। সিদ্ধান্ত হয় এই অঙ্ক পরিশোধের আগ পর্যন্ত বন্দী মুসলমানরা বন্ধকহিসাবে ক্রুসেডারদের কাছে থাকবে। স্বভাবত এমন আত্মসমর্পনে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সম্মতি ছিল না।

তা হলে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জওয়াবী তৎপরতা কী হবে?

ক্রুসেডারদের হাতে আটক মুসলমানদের মুক্তির জন্য তিনি কী করবেন?

লায়নহার্ট সম্রাট রিচার্ড-এর পদক্ষেপই বা কী?

পরিস্থিতিটা কী হতে চলেছে?

এই সন্ধির কথা যখন সালাহুদ্দীন জানতে পারেন, তখন তিনি খুব শক্তভাবে বিষয়টি অস্বীকার করেন। তবে তাঁর কিছু করার ছিল না। কাজেই বাধ্য হয়ে তিনি নির্ধারিত অঙ্ক জমা করতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্ক ছিল অনেক বড়। কাজেই তিনি নিজের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে যোগাযোগ আরম্ভ করেন এবং কিছু জমা হয়ে যায়। তবে সালাহুদ্দীন বন্দীদের মুক্তির আগে ক্রুসেডারদের হাতে এই মোটা অঙ্ক হস্তান্তর করতে ভয় করছিলেন। কেননা, তিনি তাদের প্রতারণার সাথে পরিচিত ছিলেন। কাজেই তিনি চালাকি করে সহজ একটি প্রস্তাব করেন। তা হল এই অর্থ কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে সোপর্দ করে তিনি কোনো কিছু বন্ধক চান। যাতে সেই তৃতীয় পক্ষ উভয়ের মধ্যে বিচারক হতে পারে। আর বন্দীদের মুক্ত করার পর এই অর্থ ক্রুসেডারদের দেওয়া হবে। অথবা 'দাবিয়্যা' এ বিষয়ে শপথ করবে। দাবিয়্যা কী?

দাবিয়্যাহ হল ক্রুসেডার বাহিনীর অন্তর্গত একটি বিশেষ শক্তিশালী ইউনিট। তারা ধর্মের প্রতি খুব যত্নবান ছিল। তারা শপথকে খুব মারাত্মক বিষয় মনে করত। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী দাবি জানান যে, এ দাবিয়্যাহ ইউনিট মুসলিম বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার শপথ করবে। কিন্তু দাবিয়্যাহ ইউনিট হলফের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কারণ, ক্রুসেডার রাজাদের প্রতি তাদের আস্থা ছিল না। কাজেই কোনো সমাধান বের করতে না পেরে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী অর্থ প্রদানের বিষয়টি স্থগিত রাখেন। কিন্তু রাজা রিচার্ড এ বিলম্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না। সাথে সাথে সে তিন হাজার মুসলিম বন্দী বের করে মুসলমানদের চোখের সামনেই তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা বিরাট অপরাধ এবং ইউরোপের জন্য চরম কলঙ্কতিলক। অথচ সে এসেছিল উন্নত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন বিশ্বাসঘাতক, অসহায় বন্দীদের হত্যাকারী এবং চুক্তি লঙ্ঘনকারী। এছাড়াও তার আরও অনেক গর্হিত কাজ রয়েছে, যেগুলো কোনো প্রকারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি তার চরিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস, ক্রুসেডার বা মাসীহের স্বার্থ রেখে নিজের খ্যাতি ও সুনাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ধার্মিক লোকদের যেসব ব্যস্ততা থাকে, তার ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে ছিল না।

এ দুঃখজনক ঘটনার পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের উপর হামলে পড়েন। তাঁর ও ক্রুসেডারদের মধ্যে কয়েকটি লড়াই সংঘটিত হয়। তবে এসব লড়াইয়ের কোনো ফলাফল ছিল না। কেননা, সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর তুলনায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বাহিনী ছিল অনেক ছোট। ফলে ক্রুসেড হামলা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, ইয়াফা শহরও ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। এমনকি তাদের হাতে আরসোফ এবং আসকালান শহরেরও পতন ঘটে। যেগুলো বড় ধরণের সংকট সৃষ্টি করে। বাধ্য হয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ৫৮৮ হিজরীর ২১ শাবান– অর্থাৎ আক্কা পতনের এক বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে ক্রুসেডারদের সাথে রামাল্লা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধি অনুসারে ইয়াফা, কায়সারিয়া, আরসোফ, হাইফা ও আক্কা শহর ক্রুসেডারদের

দিয়ে দিতে হয়। যেগুলো তখন ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। সালাহুদ্দীন ﷺ তাদেরকে এসব শহরের উপর এই শর্তে মেনে নেন যে, লুদ, রামাল্লা ও নাসিরাহ মুসলমানদের হাতে থাকবে। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩ বছর ৩ মাস।

আমরা এখানে এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে একটু থামতে চাই। আমরা বলতে চাই যে, কয়েকটি শর্তের আলোকে এমন চুক্তি বৈধ। এসব শর্ত সালাহুদ্দীন আইয়ুবী পূর্ণ করেছিলেন। প্রথম শর্ত হচ্ছে এ সন্ধির কোথাও তিনি ইসলামী ভূখণ্ডের এক টুকরো জমিন স্থায়ীভাবে ক্রুসেডারদেরকে কিংবা অন্যদেরকে দেওয়ার কথা স্বীকার করেননি। এসব শহর তিনি তাদেরকে স্থায়ীভাবে দেওয়ার কথা কখনও স্বীকার করেননি। তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন শুধু তিন বছর তিন মাসের জন্য।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে চুক্তি হতে হবে নির্দিষ্ট মেয়াদের। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এ শর্তও পূরণ করেছিলেন।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে যদি কাফেররা চুক্তি ভঙ্গ করে, তা হলে মুসলিম পক্ষ তাদের জওয়াব দিতে সক্ষম থাকবে। কেননা, তাদের থেকে প্রতারণা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা খুবই স্বাভাবিক। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর এ ক্ষমতা ছিল।

যাইহোক, এভাবে রামাল্লা চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসে নতুন করে ছোট এক ক্রুসেড সাম্রাজ্য অস্তিত্ব লাভ করে। ইয়াফা থেকে শুরু করে লেবাননের সুর পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী পুরো ফিলিস্তিনে তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। রামাল্লা চুক্তির ছয় মাস পরই সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ক্লান্ত দেহের বিশ্রাম নেওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে এবং ৫৮৯ হিজরীর ২৭ সফর তিনি ইন্তেকাল করেন।

মহান নেতা, বিজয়ী সম্রাট সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ﷺ মারা যান। তাঁর মৃত্যু মুসলমানদের জন্য অনেক বড় বেদনার কারণ হয়। সম্ভবত সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বেদনার বিষয়। তাঁর মৃত্যু শুধু মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের একজন মহান নেতাকে হারানোর বিপর্যয়ই ছিল না; বরং তাঁর মৃত্যুপরবর্তী সময়ে

মুসলিম জাতি কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতি আমাদেরকে একটি ভুলের প্রতি নির্দেশ করতে বাধ্য করে। আমি মনে করি, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যেকয়টি ভুলের শিকার হয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। তা হল তাঁর মৃত্যুর পর জাতিকে পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত শক্তিশালী উত্তরসূরি রেখে না যাওয়া। তাঁর মৃত্যু হয় আচমকা। তখনও তিনি ষাট বছর পূর্ণ করেননি। তবে নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু অবধারিত। মুসলিম জাতিকে পরিচালনা করার নিয়ম-নীতির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মজবুত একজন প্রতিনিধি থাকা ছিল আবশ্যক। যার উপর সবাই একমত হতে পারে। যাতে তার মৃত্যুর পর বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজটি হয়ে ওঠেনি।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মৃত্যুর পর মুসলিম জাতির ঐক্য মারাত্মকভাবে তছনছ হয়ে যায়। কয়েকটি শক্তি সিংহাসন দখলের বিবাদে লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে তিনজন তাঁর সন্তান। আফযাল, আযীয ও যাহের। আযীয উসমান মিসরের অঞ্চল দখল করে নেন। যাহের গাজী গিয়াসুদ্দীন দখল করেন আলেপ্পো। আর দামেশক আমিরাত থাকে সালাহুদ্দীনের বড় ছেলে আফযাল নুরুদ্দীন আলীর হাতে। কার্ক ও শোবাক দূর্গের ক্ষমতায় বসেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিল। হামাত শহরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনু তকিউদ্দীন উমার। হিমস ও রাহবা চলে যায় তাঁর চাচা আসাদুদ্দীন শেরকোহ-এর পৌত্রের হাতে এবং ইয়ামান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই যহিরুদ্দিন সাইফুল ইসলাম তুগতাকীনের হাতে। এভাবেই ভাই-বেরাদার ও চাচাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর রক্ত বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শুধু এই বিভক্তিই নয়; বরং ভাই-বেরাদার ও চাচাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ চরমে পৌঁছে। কখনও কখনও এই বিবাদ রক্তাক্ত হয়ে উঠত এবং মুসলমানরা প্রাণ হারাত। এসব বিবাদে এমন অনেক লোক মারা যান, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস লড়াইয়ে এবং ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর স্বাধীন করতে গিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এটাই আমাদেরকে বিচলিত করে।

কিন্তু আমরা পুনরায় প্রিয়নবী ﷺ-এর হাদীসের দিকে ফিরে যাই। তিনি বলেন—

> আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না; বরং আমি ভয় করি যে, তোমাদের সামনে দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমরা দুনিয়া নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবে, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিল এবং দুনিয়া তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। [বুখারী : ৬৪২৫]

এর মধ্যেই মুসলমানরা পতিত হয়। নিঃসন্দেহে সালাহুদ্দীনের সাম্রাজ্য ছিল অনেক বেশি বিস্তীর্ণ। মিসর, পুরো সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, তুরস্কের কিছু অংশ, ইরাকের কিছু অংশ, সমগ্র হেজায ও ইয়ামান। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ইন্তেকালের পর তাঁর ভাই ও সন্তানেরা এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং এদের মধ্যে সংঘটিত হয় দুঃখজনক অনেক বিবাদ। মুসলিম জাতি পতিত হয় বিরাট সংকটে। যদি আল্লাহ ﷻ-এর দয়া না হত এবং ক্রুসেডাররা দুর্বল অবস্থায় না থাকত, তা হলে এ জাতির ঐক্য একেবারে বরবাদ হয়ে যেত এবং মুসলিম বিশ্বের বহু অঞ্চল আগ্রাসনের শিকার হত।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিলই ছিলেন বিবাদমান লোকগুলোর মধ্যে উত্তম। তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পর্যায়ের না হলেও এদের সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন। মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদের ৯ বছর পর আদিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। মিসর, শাম ও অন্যান্য অঞ্চল তার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন। হিজরী ৫৯৮ সনে তিনি এই সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এরই মধ্যে ক্রুসেডারদের হাতে বৈরুতের পতন ঘটে। আর এই বিশৃঙ্খলা ইউরোপকে নতুন করে মুসলমানদের সাথে লড়ার জন্য শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। আদিল ইসলামী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে নিলে ইউরোপ চরম বিপদ অনুভব করে এবং ইউরোপিয়ানদেরকে চতুর্থ ক্রুসেড অভিযানের জন্য উদ্দীপ্ত করতে শুরু করে। ৫৯৯ হিজরী (১২০২ খ্রিস্টাব্দে)-তে এই চতুর্থ ক্রুসেড অভিযান পরিচালিত হয়।

তবে এই চতুর্থ ক্রুসেড অভিযান লক্ষভ্রষ্ট হয়। শাম, আল-কুদস ও অন্যান্য ইসলামী শহরের মুসলমানদের পরিবর্তে বায়যান্টাইন

সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দুর্বলতা আঁচ করে তারা সেদিকে ধাবিত হয়। অথচ এরাও খ্রিস্টানই ছিল। ক্রুসেড অভিযানের শিকার হয় কনস্টান্টিনোপল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তৎকালীন বায়যান্টাইন সম্রাটকে হত্যা করা হয়। তারা কনস্টান্টিনোপল শহরও দখল করে নেয়। সমগ্র বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যে তারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। যেহেতু এ অভিযানের অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ফ্রান্সের, তাই ধারাবাহিক দীর্ঘ ৫৭ বছর বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর ফরাসি শাসন চলতে থাকে। অর্থাৎ ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত। ইউরোপীয় ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এ সময়ে কনস্টান্টিনোপলের অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের উপর কী পরিমাণ হত্যাজজ্ঞ, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি ও জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, তার হিসাব তুলে ধরার সাধ্য কারও নেই। ক্রুসেড যুদ্ধে যে ধর্মের চরম অবনতি হয়েছিল, এ ছিল তারই এক নিদর্শন।

আসুন, দেখে নেওয়া যাক যে, এতটুকুতে কি ইউরোপ খুশি?

না কি মুসলমানদের উপর আবার অভিযান চালাবে?

মিসর ও শামকে ঐক্যবদ্ধ করার পর আদিলের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃদখলে বিবিধ ক্রুসেড অভিযান

আমরা বিগত আলোচনায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মৃত্যুতে সৃষ্ট বিপদজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছি। আমরা চাচা ও ভাই-বেরাদারের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বগুলোও দেখেছি। আমরা দেখেছি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিল দীর্ঘ নয় বছর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাতৃবৃন্দের সাথে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই ও দ্বন্দ্বের পর সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আদিল সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পর্যায়ের শাসক ছিলেন না। কিন্তু তিনি লোকহিসাবে খুব ভালো ছিলেন। তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত সবার চেয়ে তিনি ছিলেন উত্তম। তিনি হুকুমাতের সিংহাসনের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হন এবং মিসর ও শামের ঐক্য ফিরিয়ে আনেন।

যেমন আমরা দেখেছি যে, ইউরোপে আবার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং চতুর্থ ক্রুসেড অভিযানের প্রচেষ্টা চলে। তবে এই অভিযান কনস্টান্টিনোপলের দিকে ধাবিত হয়।

আদিল তাঁর সাম্রাজ্য শক্তিশালী করতে মনোনিবেশ করেন। তিনি ৫৯৮ হিজরী থেকে ৬১৫ হিজরী (১২১৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব শাসন করেন। ৬১৫ হিজরীতে মিসর ও শামে আদিলের শাসনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর শাসনামলে বড় বিপত্তি ছিল এই যে, তিনি এই দীর্ঘ সময়ে ক্রুসেডারদের সাথে কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হননি।

আমরা আগে বলে এসেছি যে, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মৃত্যুর তিক্ত ফল হচ্ছে ফিলিস্তিন ও লেবাননী উপকূলে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য

স্থিতিশীল হওয়া। ইয়াফা শহর থেকে সুর শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্য। এই স্থিতিশীলতা কিছুতেই বোধগম্য ছিল না। কেননা, লায়নহার্ট রাজা রিচার্ড ও ফিলিপ অগাস্টের চলে যাওয়ার ফলে ক্রুসেড শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ ক্রুসেড অভিযান কন্সটান্টিপোল অভিমুখে তাড়িত হওয়ার সময়ই আদিলের উচিত ছিল অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের আঘাত হানা, যাতে নতুন করে তারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত না হতে পারে এবং যাতে ক্রুসেড অভিযান অব্যাহত হতে না পারে। এসময় নীরব থাকা ছিল তাদেরকে সাহায্য করা আর সুদৃঢ় করার শামিল।

কিন্তু আফসোস, এমন কিছু হয়নি। ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকায় আদিলের সমস্ত. মনোযোগ ছিল রাজ্য সুবিন্যস্ত করার প্রতি। এ সবকিছুর পরিণতি ছিল পঞ্চম ক্রুসেড অভিযান। ৬১৫ হিজরীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর পরিচালিত হয় পঞ্চম ক্রুসেড অভিযান। এ অভিযান ছিল খুব শক্তিশালী। এ অভিযানে ক্রুসেডারদের সাথে সাইপ্রাসও অংশগ্রহণ করে। সাইপ্রাস তখন ক্রুসেডাদের দ্বারা শাসিত হত। সাইপ্রাসের রাজা নিজে এ অভিযানের নেতৃত্ব দেয়। এ অভিযান শামের একটি অঞ্চলে আপতিত হয়। তারা শাম হয়ে আল-কুদসে প্রবেশে সচেষ্ট ছিল। আদিল এ অভিযানের কথা শুনে সাথে সাথে মিসর ছেড়ে ফিলিস্তিন রক্ষার্থে ছুটে আসেন। তবে তিনি এসে জানতে পারেন ক্রুসেডারদের সংখ্যা তাঁর বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করার মানসে দামেশকে চলে যান।

ক্রুসেডাররা আদিলের মিসর ত্যাগের কথা জেনে যায়। কাজেই তারা দিক পরিবর্তন করে নেতৃত্বশূন্য মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়। আদিল মিসরে তাঁর সন্তান কামিলকে রেখে এসেছিলেন। পরিতাপের বিষয়, তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। মিসরের দমিয়াত বন্দরে ক্রুসেডার বাহিনী অবতরণ করে। এটা ছিল মিসরের প্রধান বন্দর। ক্রুসেড বাহিনীতে ছিল ৭ লাখ অশ্বারোহী ও ৪ লাখ পদাতিক সৈন্য। এই সামরিক শক্তি ছিল বিশাল। তারা দমিয়াতের কেল্লার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়, যা পুরো শহর পরিচালনা করত। পরিতাপের বিষয়, এ সময় দামেশকে আদিলের মৃত্যু হওয়ার খবর মিসর পৌঁছে। এ বিষয়টি

বিরাট সংকট সৃষ্টি করে। কেননা, দমিয়াত দখলের সময় এই ঘটনা ঘটে। এতে ইসলামী বিশ্ব কঠিনভাবে এক ঝাঁকুনি খায় এবং পুরো মিসরে ক্রুসেডার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়।

এরপর কামিল ৬১৭ হিজরীতে নীল নদের পথে একটি শহর নির্মাণ করেন। শহরটির নাম রাখেন আল-মানসুরাহ। এটা সেই শহর এখন যেটা মিসরে আল-মানসুরাহ নামে পরিচিত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দমিয়াত থেকে মিসরের রাজধানী কায়রোগামী ক্রুসেডার বাহিনীর গতিরোধ করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আদিলের মৃত্যুতে মিসরের অভ্যন্তরে এবং ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

বিবাদ ছিল কামিল, ফায়িয ও মুআযযামের মধ্যে। তবে একপর্যায়ে মানসুরার সীমান্তে ইসমলামী শক্তি ও ক্রুসেড শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কামিল যখন দেখেন যে, পরিস্থিতি খুব হজবরল, তখন সংকট থেকে বের হওয়ার জন্য তিনি ক্রুসেড শক্তির কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক প্রস্তাব পেশ করেন। ক্রুসেডারদের কাছে তিনি প্রস্তাব করেন যে, দমিয়াত থেকে বের হয়ে গেলে তিনি তাদেরকে আসকালান, টাইবেরিয়াস, লেবাননের জাবাল্লা, সিরিয়ার লাতাকিয়াসহ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ফাতাহকৃত সমস্ত ভূখণ্ড দিয়ে দিবেন; বরং আল-কুদসও দিবেন। তাঁর এই প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর। তিনি চাইছিলেন, তারপরও যেন ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে কোথাও মুখোমুখি হতে না হয়। কিন্তু ক্রুসেড অভিযানের ধর্মীয় সেনাপতি ও ইউরোপীয় পোপের প্রতিনিধি ব্লেকিউস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, কামিল শর্ত করেছিলেন যে, সব এলাকা দিলেও কার্ক ও শোবাক দিবেন না। আর জর্ডানের এ দূর্গ দুটি ছিল খুব সুদৃঢ়। এ দুটি দূর্গ দিতে রাজি না হওয়ার কারণ এগুলোর সুদৃঢ় হওয়া নয়; কিংবা ওখান থেকে ক্রুসেডারদের উপর পুনরায় হামলা করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাঁর ভাষ্যমতে এ দূর্গ দুটি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পক্ষ থেকে তাকে উত্তরাধিকার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি দূর্গ দুটি ছাড়তে চান না। কিন্তু ব্লেকিউস কার্ক ও শোবাক দূর্গ পেতে একগুঁয়েমি করতে থাকে। কামিলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ﷻ দরিদ্র, দুর্বল ও সাধারণ মানুষের দুআর বরকতে এই জাতিকে রক্ষা করেন। কামিলের পক্ষ থেকে এমন লাঞ্ছনাকর প্রস্তাব দেওয়ার পর মুসলমানরা ক্রুসেডারদের উপর জয়লাভ করেন। শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে ক্রুসেডাররা কোনো কিছু না নিয়েই নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার আকুতি জানায়। কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ ﷻ আবার আল-কুদস ও ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডকে হেফাযত করেন।

৬২৪ হিজরীতে ইউরোপীয়রা ষষ্ঠ ক্রুসেড অভিযানের উদ্দেশ্যে একমত হয়। এ অভিযানের নেতৃত্ব দেয় জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। পোপের সাথে এই লোকের দ্বন্দ্ব ছিল। এমনকি পোপ এই সম্রাট স্বর্গ পাবে না বলে ঘোষণা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এটা ছিল তার জন্য বিরাট বিপদ। কেননা, এ কারণে তার প্রতি জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার জনগণের আনুগত্য কমে যাচ্ছিল। এজন্য পোপের পক্ষ থেকে আরোপকৃত বঞ্চনার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছিল সে। কাজেই সে ইসলামী বিশ্বে ষষ্ঠ ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সে কিছুতেই এ যুদ্ধের জন্য সতস্ফুর্তভাবে প্রস্তুত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সে খ্রিস্টান ধর্মের উপরও সন্তুষ্ট ছিল না। আসলে তার আস্থা ছিল না কোনো ধর্মের উপরই। আমরা তাকে একজন নাস্তিকই বলতে পারি। তার নেতৃত্বে পরিচালিত ক্রুসেড অভিযানটি ছিল খুবই ছোট। এ বাহিনীতে যোদ্ধা ছিল মাত্র ৫০০। তারা ইসলামী বিশ্বে পৌঁছে দেখতে পায় যে, এখানকার শাসকরা নিজেদের মধ্যেই বিবাদে লিপ্ত। দামেশক ও কায়রোর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। কামিল জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিককে পুনরায় প্রস্তাব দেন যে, সে যদি কোনো যুদ্ধ না করে নিজ দেশে ফিরে যায় তা হলে তাকে আল-কুদস দিয়ে দেওয়া হবে। অথচ তার সাথে তখন মাত্র ৫০০ যোদ্ধা। তবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে কামিল নতুন কোনো বিবাদে জড়াতে চাচ্ছিলেন না। কামিল দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের হাতে সত্যি সত্যি আল-কুদস সোপর্দ করে দেন। মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে এসেই ৬২৫ হিজরী (১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় ফ্রেডরিক আল-কুদসের ক্ষমতা বুঝে নেয়। তবে এই সমর্পণের সময় কামিল শর্ত জুড়ে দেন যে, ক্রুসেডারদের মসজিদে আকসা ও

কুব্বাতুস সাখরা দেওয়া হবে না। এর মাধ্যমে তিনি কিছুটা হলেও মুসলিম আকিদা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি বিষয়টি ছোট করে আনেন এবং শুধু আল-আকসা ও কুব্বাতুস সাখরার মধ্যে সীমিত করেন। কেমনযেন আল-কুদস ক্রুসেডারদের দখলে চলে গেলে কোনো সমস্যা নেই। পুরো ফিলিস্তিন তাদের দখলে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেন ক্রুসেডাররা তাকে ভাইদের সাথে লড়াই করা এবং ক্ষমতার বিবাদের জন্য অবসর করে দেয়।

৬১৫ হিজরী থেকে ৬৩৫ হিজরী পর্যন্ত কামিল মুসলমানদের শাসন করেন। অর্থাৎ পূর্ণ ২০ বছর। এ সময়ে তিনি আল-কুদস হারান। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিককে দিয়ে দেন। মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে এসে দ্বিতীয় ফ্রেডরিক আল-কুদস ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। অথচ ইতোপূর্বে ৫ লক্ষ সৈন্য নিয়ে এসেও লায়নহার্ট রাজা রিচার্ড সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কাছ থেকে আল-কুদস নিতে পারেনি। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও তাঁর ভাতিজা কামিলের মধ্যে কতইনা ব্যবধান, যিনি মুসলমানদের সম্পদ ও সম্মান ধ্বংস করে দেন।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-কুদস স্বাধীন করার ৪৩ বছর পর পতনের এই ঘটনা ঘটে। ৬৩৫ হিজরী (১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ) কামিল মারা যান। মিসর, শাম, ইয়ামান ও হিজাজ জুড়ে বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্যের সিংহাসনে রেখে যান তার পুত্র আদিলকে। আগের মত কামিলের মৃত্যুর পর ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ৬৩৭ হিজরী (১২৩৯ খ্রিস্টাব্দ) মিসরে এমন একজন লোক শাসনভার গ্রহণ করেন, আমরা যাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পর আইয়ুবী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক। নেককার সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ুবী।

এই বাদশাহ নতুন করে সবকিছু ঢেলে সাজাতে শুরু করেন। জিহাদের উদ্দীপনাও ছিল তাঁর মধ্যে। প্রশাসনিক বিষয়াদিতে তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। একটি বিষয়ই তাঁকে ত্রস্ত করে রাখত, যতটুকু সম্ভব ইসলামী বিশ্বকে স্বাধীন করা। কাজেই নতুন করে তিনি মুসলিম বাহিনী বিন্যস্ত করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, কামিলের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান ও

ভাতিজাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে সময় নাজমুদ্দীন আইউব ইবনু কামিল মিসরের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখনই তাঁর ভাতিজা ইসমাঈল দামেশকের ক্ষমতায় বসেন। এই ইসমাঈল ছিলেন বিকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। ক্রুসেডারদের সীমাহীন পক্ষপাতি। নিজের ক্ষমতার জন্য এমন কোনো কাজ নেই, যা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলান, যাতে মিসর আক্রমণ করে নাজমুদ্দীন আইয়ুবীর কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারেন।

এ সময়ে কার্ক ও শোবাক অঞ্চলে আন-নাসির দাউদ নামক এক লোক ছিলেন। তিনিও ছিলেন এমন ব্যক্তি, ইতিহাসে যার কোনো মূল্য নেই। তবে যেহেতু আন-নাসির দাউদের অবস্থান ছিল আল-কুদসের কাছে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, আল-কুদসে ক্রুসেড নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব দুর্বল। এজন্য ৬৩৭ হিজরীতে তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে আল-কুদসে অভিযান চালান এবং ক্রুসেডারদের থেকে আল-কুদস ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। তার এই আল-কুদস দখল ইসলামী বিশ্বকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং ছিল শুধু নিজের রাজ্য সম্প্রসারণের মানসে। এভাবে কামিলের আল-কুদস হস্তান্তরের ১১ বছর পর তিনি আল-কুদস থেকে ক্রুসেডার শাসনের অবসান ঘটান। তবে আন-নাসির দাউদ আল-কুদস দখল করতেই ইসমাঈল তার কাছে এসে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন দাউদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী। তিনি মিসর দখলের অভিযানে সহযোগিতার জন্য ক্রুসেডারদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বিনিময়ে তিনি দাউদের কাছ থেকে আল-কুদস ছিনিয়ে নিয়ে ক্রুসেডারদেরকে সোপর্দ করবেন বলে ওয়াদা করেন। এমনকি তিনি তাদেরকে মসজিদে আকসা ও কুব্বাতুস সাখরা দিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। আর সত্যি সত্যি ইসমাঈল একাজটি করে ফেলেন।

তৎকালীন আলেমসমাজ তার বিরোধিতা করেন। তাদের মধ্যে ইয ইবনু আব্দুস সালাম ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দামেশকের মিম্বার থেকে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। এর শাস্তিহিসাবে ইযকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাকে কাজীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

এরপর দামেশক থেকে দূরে আল-কুদসে তাঁকে দেশান্তর করা হয়। আলেমদের সমস্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে তিনি ৬৩৮ হিজরীতে (১২৪০ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় বার ক্রুসেডারদের হাতে আল-কুদস তুলে দেন।

মিসরের সুলতান নাজমুদ্দীন আইউব এসব বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি ইসমাঈলের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার ও মুসলমান জোটের সাথে লড়ার জন্য জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এরপর তাদের মধ্যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। যুদ্ধে আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইউব বিজয়ী হন। এরপর তিনি সরাসরি আল-কুদস অভিমুখে রওয়ানা হন। ৬৪২ হিজরী (১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ)-তে তিনি আল-কুদস পুনরুদ্ধার করেন। তবে এবারের আল-কুদস পুবরুদ্ধার ছিল ইসলামী চিন্তাধারা থেকে এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' খচিত পতাকা উত্তোলন করে। এভাবে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যে মর্যাদা সৃষ্টি করেছিলেন, সেটা তিনি ফিরিয়ে আনেন। এরপর দীর্ঘ ৬৯৩ বছর ধারাবাহিক আল-কুদসে ইসলামী শাসন অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ প্রায় সাত শতাব্দী। ১০ ডিসেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৫ হি.) বৃটিশ বাহিনীর প্রবেশ পর্যন্ত আর কোনো শত্রুবাহিনী আল-কুদসে প্রবেশ করতে পারেনি। আমরা আল্লাহর কাছে দোআ করছি, তিনি যেন আল-কুদস পুরাপুরি স্বাধীন করে দেন। স্বাধীন করে দেন ফিলিস্তিন এবং মুসলমানদের সমস্ত দেশ।

নাজমুদ্দীন আইউবের নেতৃত্বাধীন মিসরীয় বাহিনীর মধ্যে এ সময় কিছুটা দুর্বলতা ও সংখ্যস্বল্পতা ছিল। ফলে বেশি কিছু করার সাধ্য তাঁর ছিল না। এই বাহিনী কামিলের যুগে গঠন করা হয়েছিল। কামিল ইসলামী বাহিনীর ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপারে অতটা মনোযোগী ছিলেন না। এজন্য সুলতান নাজমুদ্দীন আইউব খাওয়ারিজমী সৈনিকদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। তৎকালীন ইসলামী প্রাচ্য শাসনকারী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য থেকে তিনি এসব সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। তবে আফসোসের বিষয়, তাতারীরা তখন এ সাম্রাজ্য তছনছ করে দিয়েছিল। এতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নাজমুদ্দীন আইউব তাদেরকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন। তাঁর সাথী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদেরকে নিজের বাহিনীতে ভর্তি

করে নেন। তবে খাওয়ারিজম সৈন্যদের নিয়ে সমস্যা ছিল এই যে, তারা ছিল ভাড়াটে সৈন্য। তাদের সামনে কোনো ইসলামী প্রেরণা ছিল না। যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্যও ছিল না। নাজমুদ্দীন আইয়ুবের পক্ষ হয়ে তারা লড়ত, কারণ তিনি তাদের অর্থ দিতেন। তবে তার কোনো শত্রু যদি তাদেরকে তার চেয়েও বেশি অর্থ দিত, তা হলে তারা পক্ষ পরিবর্তন করে তার শত্রুর হয়ে যুদ্ধ করত। এতে নাজমুদ্দীন আইয়ুবের বাহিনীতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতি তাঁকে নতুন একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। যা মুসলিম উম্মাহর জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে এনেছিল। তা হল, কম বয়সী গোলামদের (দাসদের) প্রশিক্ষণ প্রদান। তিনি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কম বয়সী গোলামদের (দাসদের) সংগ্রহ করা শুরু করেন। যেন তাঁর নিজের প্রাসাদে এবং প্রাসাদের পাশে নির্মিত কেল্লায় তাদের খাঁটি ইসলামী কায়দায় প্রতিপালন করা যায়।

তাদেরকে আগে তিনি আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই সাথে তাদেরকে শিক্ষা দেন প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়, রাজনীতি, অশ্বারোহন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের রীতিনীতি। এভাবে তিনি একটি ইসলামী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, যার প্রত্যেক সিপাহিকে শৈশব থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল। যারা প্রত্যেকে যুবক হয়ে জিহাদের স্পৃহা ধারণকারী শক্তিশালী যোদ্ধায় পরিণত হয়। প্রত্যেকের ছিল বিশুদ্ধ আকিদা ও ইলম, সামরিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দেশ ও জাতি পরিচালনার যোগ্যতা। ফলে এটা ছিল খুব উচ্চমানের একটি সেনাবাহিনী। এই বাহিনী পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় মিসরের বাহিনী হিসাবে নিয়োজিত ছিল।

নাজমুদ্দীন আইউবের সুখ্যাতি ইউরোপে গিয়ে পৌঁছে। তারা ইসলামী বিশ্বে একজন শক্তিশালী সুলতানের উপস্থিতি জানতে পারে। তারা এটাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের হাতে আল-কুদসের পতন ঘটেছে। ফলে তৎকালীন ক্যাথলিক পোপ সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেয়। এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিল ফরাসি সম্রাট নবম লুইস। এটা ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধতম ক্রুসেড অভিযান। এই অভিযান দামেশক

অভিমুখে প্রেরিত হয়। তবে যেহেতু নাজমুদ্দীন আইউব মিসর ও শামকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং মিসরে তিনি অবস্থান করছিলেন, এজন্য ক্রুসেডাররা মিসরের দিকে তাদের গতি ঘুরিয়ে ফেলে। একই সাথে দামেশকের দিকেও তারা নজর রাখতে থাকে। ক্রুসেডাররা মিসরের সবচেয়ে বড় বন্দর দমিয়াতে অবতরণ করে দখল করে নেয়। মিসরীয় বাহিনীর যে ইউনিট দমিয়াত পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তারা গ্রহণযোগ্য কোনো সামরিক পদক্ষেপ না নিয়ে বন্দর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে সুলতান নাজমুদ্দীন আইউব ৪৫ জন সিপাহিকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

নাজমুদ্দীন আইয়ুব দ্রুত বাহিনী প্রস্তুত করে দমিয়াত উদ্ধারে রওয়ানা হন। কিন্তু তিনি তা পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন। ক্রুসেডাররা দমিয়াত দখল করে দানবীয় হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। নারী, শিশু ও বৃদ্ধ কেউ বাদ যায় না হত্যাকাণ্ড থেকে। দমিয়াতের পথ-ঘাট মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। দমিয়াতের মসজিদকে গির্জায় পরিণত করে তারা। এমনকি দমিয়াত থেকে কায়রো অভিমুখে রওয়ানা হয়। নাজমুদ্দীন আইয়ুব দ্রুত তাঁর বাহিনী নিয়ে মানসুরাহ অভিমুখে রওয়ানা হন। যাতে ক্রুসেডারদের আগেই তিনি সেখানে পৌঁছতে পারেন। মানসুরাতে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। এ সময় ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ফারিসুদ্দীন আকতাঈ ও রুকনুদ্দীন বাইবার্স। আর মূল নেতৃত্ব ছিল নাজমুদ্দীন আইউবের হাতে। তবে আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। নাজমুদ্দিন আইউব ১৪ শাবান ৬৪৭ হিজরী (১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) যুদ্ধের ময়দানে মারা যান। ফলে মুসলিম উম্মাহ এক কঠিন সংকটে পতিত হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামযাদা স্ত্রী শাজারাতুদ দুর শাসনের দায়ভার কাঁধে নেন। তিনি সেনাপতি ফারিসুদ্দীন আকতাঈ ও রুকনুদ্দীন বাইবার্স এর সাথে মতবিনিময় করেন। শাজারাতুদ দুর খুব নৈপুণ্যের সাথে পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে তিনি নিজ পুত্র তুরানশাহ ইবনু নাজমুদ্দীন আইউবকে ডেকে পাঠান। তুরানশাহ তখন ছিলেন বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত হাসানকেফ-এ। শাজারাতুদ দুর তাকে মিসর আসতে এবং পিতার সাম্রাজ্য ও ইসলামী বিশ্বের শাসনভার কাঁধে নিতে নির্দেশ দেন।

পত্র পেয়ে তুরানশাহ দ্রুত মিসর অভিমুখে রওয়ানা দেন। এরই মধ্যে মানসুরার ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে মুসলমানরা ক্রুসেডারদের উপর বিরাট বিজয় অর্জন করেন। পরাজিত হয়ে ক্রুসেডার বাহিনী দমিয়াতের দিকে ফিরে যায়। এমন সময় তুরানশাহ ইবনু নাজমুদ্দীন আইউব পৌঁছে যান এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

২ মুহাররাম ৬৪৮ হিজরী (১২৫০ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে 'ফারিস্কুর যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তুরানশাহ ক্রুসেডারদের চরমভাবে পরাজিত করেন। নবম লুইস বন্দী হয়। ক্রুসেডারদের ৩০ হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত হয়। তবে আফসোসের বিষয়, এ বিজয়ের মাত্র কয়েক মাসের মাথায় মিসরের কিছু অভ্যন্তরীণ ফেতনার পর তুরানশাহ নিহত হন এবং মুসলমানরা বিরাট সংকটের মুখোমুখি হয়।

আসুন, জেনে নিই তুরানশাহের পর কে হতে যাচ্ছেন আইয়ুবী সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসক– যাকে আইয়ুবী সাম্রাজ্যের শেষ শাসক সাব্যস্ত করা হয়?

শাজারাতুদ দুরের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

মামলুক (গোলাম)-দের উপর নির্ভরশীল মিসরীয় বাহিনী আগামীতে কী করতে যাচ্ছে?

ক্রুসেডার ও তৎকালীন ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কী পদক্ষেপ নিবে?

মামলুক সাম্রাজ্য ও বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার

সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মৃত্যুর পর আইয়ুবী সাম্রাজ্যের পরিণতি আমরা দেখেছি। ভাই-বেরাদার ও চাচাদের পারস্পরিক বিবাদ ও দ্বন্দ্বও আমরা দেখেছি। এরপর আমরা আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইউবের উত্থান লক্ষ্য করেছি। তিনি ছিলেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পর আইয়ুবী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি দ্বিতীয় বার ইসলামী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন এবং মানসূরার যুদ্ধে ক্রুসেডারদের উপর বিজয়ী হন। তবে এ বিজয় তিনি দেখে যেতে পারেননি। তিনিই বাহিনী বিন্যাস ও যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এরপর যুদ্ধের ময়দানে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সেনাপতি ফারিসুদ্দীন আকতাঈ ও রুকনুদ্দীন বাইবার্স এবং তাঁর স্ত্রী এই লড়াই সম্পন্ন করেন। তাঁর স্ত্রী শাজারাতুদ দুর পুত্র তুরানশাহ ইবনু নাজমুদ্দীন আইউবকে মিসর ও শামের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ডেকে আনেন। তুরানশাহ এসে ফারিস্কুর যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং নবম ক্রুসেড অভিযান ব্যর্থ করে দেন। ৩০ হাজার বা তারও বেশি ক্রুসেডারকে হত্যা করতে এবং বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডারকে বন্দী করতে সক্ষম হন। এমনকি ফরাসি সম্রাট নবম লুইসকেও বন্দী করেন। পরে সে বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে।

এমন বিরাট বিজয় সত্ত্বেও নাজমুদ্দীন আইউবের মৃত্যুর পর এক বিরাট ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্য কার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে মানুষ সন্দেহে পড়ে যায়। কেননা, তারা তুরানশাহের মধ্যে প্রকৃত নেতৃত্বগুণ দেখতে পাচ্ছিল না। ফলে ফেতনা সংঘটিত হয় এবং

তুরানশাহ নিহত হন। আর তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে মিসর এমন আইয়ুবী শাসক থেকে খালি হয়ে যায়, যে শাসনভার সামলাতে পারে। এ কারণে শাজারাতুদ দুর নিজেকে মিসরের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মত কোনো নারী নিজেকে মুসলমানদের শাসক ঘোষণা করেন। তাও এমন কঠিন পরিস্থিতিতে, যখন দেশ তাতার সাম্রাজ্যের সাথে লড়ছিল, যেমন আমরা খানিকবাদেই দেখব। আরও লড়ছিল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও স্পেনের সাথে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য একজন নারীর শাসন মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও সেই নারী শাজারাতুদ দুরের মত শক্তিশালীই হোক না কেন। তখন মিসরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এমনইভাবে শামেও। এমনকি বিদ্রোহ বাগদাদেও পৌঁছে। সবখানে শাজারাতুদ দুরের নেতৃত্বের উপর আপত্তি। নিরুপায় হয়ে শাজারাতুদ দুর ইজ্জুদ্দীন আইবেক নামের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাঁর কাছে এই শর্তে শাসনভার ন্যস্ত করেন যে, পর্দার আড়াল থেকে তিনিই পরিচালনা করবেন। ইজ্জুদ্দীন আইবেক মিসর শাসন শুরু করেন। আর এটাই হচ্ছে মিসরে 'মামলুক শাসন'-এর সূচনা।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সুলতান নাজমুদ্দীন আইউব ইসলামী মামলুকদের সংগ্রহ করেছিলেন, যেন তারা তাকে সাহায্য করতে পারে। আর সত্যিই তারা দক্ষতা, অশ্বারোহণ, তাকওয়া, ফিকহ ও দীনের উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়। তারা সেনাবাহিনী পরিচালনায়ও দক্ষ হয়ে ওঠে। এমনকি পুরো দেশ পরিচালনার যোগ্যতাও তারা অর্জন করে। ফলে ইজ্জুদ্দীন আইউবেকের মত বড় এক মামলুকের শাসন এবং মিসরের নেতৃত্বে পৌঁছনো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। এরপর শাজারাতুদ দুরের উপর অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। এক পর্যায়ে শাজারাতুদ দুর নিহত হন। নিহত হন ইজ্জুদ্দীন আইউবেকও।

পরে সাইফুদ্দীন কুতযের ক্ষমতায় পৌঁছার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তিনি ছিলেন ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম এক প্রসিদ্ধ সেনাপতি। ৬৫৭ হিজরীর যিলকদ মাসে তিনি মিসরের ক্ষমতায় আরোহন করেন। অর্থাৎ নাজমুদ্দীন আইউবের ইন্তেকালের প্রায় দশ বছর পর। এই বছরগুলো অস্থিরতা আর মুসলমানদের বিরোধে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল।

সাইফুদ্দীন কুতযের শাসনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তিনি বাহিনী প্রস্তুত শুরু করেন। তাতারদের প্রসঙ্গ আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে বাধ্য করছে।

৬০৩ হিজরীতে চীনের উত্তরে মোঙ্গালিয়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তাতার সাম্রাজ্য'। চেঙ্গিস খান এই তাতার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় খুনী। খুব দ্রুত এই সাম্রাজ্য বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হতে থাকে। মোঙ্গালিয়া, চীন, ভিয়েতনাম ও পূর্ব এশিয়ার বহু অঞ্চল দখল করে। ৬১৭ হিজরীতে এই সাম্রাজ্য সমগ্র পূর্ব এশিয়া দখল করে ফেলে। যখন এই সাম্রাজ্য এমন বিস্তৃতি লাভ করে, তখন পশ্চিমের প্রতিবেশী সাম্রাজ্যগুলোর উপর হামলার পরিকল্পনা শুরু করে। এগুলো সব ছিল ইসলামী সাম্রাজ্য। ফলে ইসলামী বিশ্বে তাতারী হামলা শুরু হয়। এই হামলার সূচনা খাওয়ারিযমের সাম্রাজ্য থেকে। তাতার বাহিনী ইসলামী বিশ্ব কেড়ে নিতে থাকে। বুখারা, সমরকন্দ, মারো, নিশাপুর, কাবুল, গজনী প্রভৃতি অঞ্চল এবং উজবেকিস্তান, কাজাখাস্তান, আযারবাঈজান, ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বড় বড় শহরের পতন ঘটায়। একপর্যায়ে ২০ মুহাররাম ৬৫৬ হিজরী (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)-তে আব্বাসী খেলাফতেরও পতন ঘটে। অর্থাৎ মাত্র ৪০ বছরেরও কম সময়ে আব্বাসী খেলাফতসহ ইসলামী বিশ্বের অর্ধেক তাতারদের হাতে পতনের শিকার হয়। এসব ঘটনা এবং সাইফুদ্দীন কুতযের মিসরের ক্ষমতায় আরোহন ছিল একই সময়ে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতার বাহিনী বাগদাদের সীমানা অতিক্রম করে দামেশক ও আলেপ্পো জয় করে নিয়েছে। এরপর আরও অগ্রসর হয়ে তারা ফিলিস্তিনও দখল করে নিয়েছে। এই আগ্রাসন গাজা বন্দর পর্যন্ত পৌছে গেছে। অর্থাৎ তারা প্রায় মিসর সীমান্তের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী আর বিশ্লেষক সবাই বুঝতে পারছিল যে, তাতার বাহিনী সত্বর মিসর দখল করে নিবে। আর এর মাধ্যমে পূর্ব ইসলামী বিশ্ব পুরোটাই তাদের দখলে চলে যাবে। কেননা, মিসরের পতন হয়ে গেলে এদিকে এমন কোনো শক্তিই থাকবে না, যা তাদেরকে থামাতে পারে।

তাতাররা শুধু মুসলমানদের সাথে লড়েই ক্ষান্ত ছিল না; বরং ইউরোপেও তাদের যথেষ্ট বিস্তৃতি সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব ইইরোপের প্রায় অর্ধেকটাই তাতার শক্তি গ্রাস করে ফেলেছিল। পোল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তারা। এক ব্যক্তি মঙ্গোলিয়া বসে পুরো তাতার সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত, যার পূর্বসীমা ছিল কোরিয়া এবং পশ্চিম সীমা ছিল পোল্যান্ড। উত্তরের সীমা ছিল রাশিয়ার শেষ প্রান্তে এবং দক্ষিণ সীমা আরবসাগর ও ভারত মহাসাগর। আসলে তাতার সাম্রাজ্য এতটাই বড় ছিল যে, ইতিহাস আজ পর্যন্ত ওরকম আর কোনো সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ করেনি।

তাতার কুতুযকে পত্র দিয়ে যেকোনো প্রতিরোধের চেস্টা করতে নিষেধ করে দেয়। তারা তাঁর কাছে দাবি করে মিসর দখল করার জন্য যেন পথ ছেড়ে দেওয়া হয়, যেমন অন্যান্য আরব ইসলামী দেশ তারা বিনা বাধায় দখল করেছে। কুতুয তাদেরকে কী উত্তর দিয়েছিলেন?

কুতযের জিহাদের স্পৃহা ছিল অনেক উঁচু। আমাদের ধারণা, তাঁর নিয়তও ছিল সত্য ও খাঁটি। তাঁর জীবনে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, তা এই দাবিকেই সুদৃঢ় করে। তাঁর জ্ঞান ও অনুভূতি ছিল খুব স্পষ্ট। তিনি যখন মিসরের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৫ বছর। তাঁর শাসনকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ১১ মাস। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ ﷻ তাঁর জীবন ও কর্মে কতটা বরকত দিয়েছিলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে অসামান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

কুতুয বুঝতে পারেন যে, তাতারদের প্রতিরোধ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাঁর কাছে রাজনৈতক সংলাপ ও কূটনৈতিক আলোচনার কোনো সুযোগ ছিল না। অথবা মিসর থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়াও সম্ভব ছিল না, যেমনটা ইতোপূর্বে অনেক শাসকই করেছেন। তিনি বুঝতে পারেন, যে বাহিনী ইসলামের উপর ত্রাস চালাচ্ছে, তাকে কিছুতেই নিজ দেশে ফিরে যেতে রাজি করানো যাবে না। বরং তাকে নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করতে হবে। এজন্য তিনি প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

তৎকালীন প্রজন্ম ছিল নানা সংকট আর ফেতনায় জর্জরিত। পরিস্থিতি আর করণীয় মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল না। তবে মিসরের তৎকালীন

প্রজন্মের কাছে তখনও উন্নত দুটি মূল্যবোধ বিদ্যমান ছিল। তা হল ইলম ও আলেমের মূল্য এবং আল্লাহর পথে জিহাদের মূল্য। কুতুয এ বিষয়টি কাজে লাগান। তিনি আলেমদের কদর বাড়িয়ে দেন। তৎকালীন আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন ইয ইবনু আব্দুস সালাম ﷺ। তিনি সেই মহান ব্যক্তি, যিনি ইসমাঈল আইয়ুবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ইসমাঈল তাঁকে দেশান্তর করে আল-কুদসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নাজমুদ্দীন আইউব যখন ফিলিস্তিন জয় করেন, তখন তিনি সেখানে ইয ইবনু আব্দুস সালামের সন্ধান পান। তিনি তাঁকে মিসর নিয়ে আসেন। তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এবং বিশেষভাবে মিসরীয় জনতার মধ্যে বিরাট কল্যাণ সাধিত হয়। ইয ইবনু আব্দুস সালাম মিসরীয় জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অন্যান্য আলেমও এ সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। কুতুয সবার উপরে নেতৃত্ব দিয়ে মানুষকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন।

মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। তবে নেতৃত্ব যেহেতু ছিল মামলুকদের হাতে, এজন্য এখানে একটি সমস্যাও ছিল। বিষয়টি খুব সহজ ছিল না। কেননা, এ অসাধ্য সাধনে প্রয়োজন ছিল খুব সাহসী লোকজনের। কারণ, তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সাথে। অথচ মামলুকদের সাধ্য ছিল খুব সীমিত। আর তাতার বাহিনীর সুখ্যাতি ছিল তুঙ্গে। এমনকি মানুষ বলাবলি করত, যদি কাউকে বলতে শোন, তাতার পরাজিত হয়েছে তা হলে তাকে বিশ্বাস করো না।

মামলুকদের অন্তরে আত্মবিশ্বাস ও চেতনা জাগ্রত করতে কুতুয তা হলে কী করবেন? তিনি গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ আঞ্জাম দেন, যেগুলো ছাড়া কোনো জাতি বিজয় অর্জন করতে পারে না।

প্রথম কাজ— নেতৃত্ব। তিনি বলেন, আমি নিজে তাতার বাহিনীর মুখোমুখি হব। এমন নয় যে, তাতারদের মোকাবেলায় বাহিনী প্রেরণ করে আমি ময়দান থেকে দূরে নিজের প্রাসাদে বসে থাকব। বরং আমি থাকব অগ্রবর্তী বাহিনীতে। এভাবে তিনি নিজেকে আদর্শ হিসাবে পেশ

করেন। আমাদের রসুল ﷺ যা করতেন, তিনি তা-ই করেন। তখন তাঁর অনুপ্রেরণায় মানুষ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় কাজ— তিনি জিহাদের বিষয়কে আল্লাহর সাথে যুক্ত করেন। নিজের সাথে, বা আলেমসমাজের সাথে, অথবা দুনিয়ার স্বার্থের সাথে, কিংবা গনীমত ও সম্পদের সাথে নয়। এভাবে তিনি বিষয়টি পুরাপুরি আল্লাহ ﷻ-এর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে বলেন—

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। আমি কাউকে জিহাদের জন্য বাধ্য করব না। তবে মুসলমানদের সম্মান রক্ষার দায় পড়বে (জিহাদ থেকে) পিছিয়ে পড়াদের কাঁধে। মুসলমান নারীদের যে সম্ভ্রমলুণ্ঠন ঘটবে, তার দায়ভার পড়বে এই পিছিয়ে পড়াদের কাঁধে।

এরপর তিনি এক বিস্ময়কর কথা বলেন, যদি আমরা ইসলামের না হই, তা হলে কে ইসলামের?

তিনি যখন এসব কথা অন্তরের গভীর থেকে বলেন, তখন মুসলিম সেনাপতিদের চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে এবং তারা কুতুযের নেতৃত্বে তাতারদের মোকাবেলার প্রস্তুতি শুরু করেন।

কুতুয যুদ্ধের ময়দান নির্বাচনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মিসরী বাহিনীর সেনাপতিরা প্রস্তাব করেন মিসরে তাদের আগমনের অপেক্ষা করতে। তাতার বাহিনী মিসরে এলে তারা তাদের সাথে লড়বেন। আর যদি তারা না আসে, তা হলে আল্লাহ ﷻ মুসলমানদেরকে লড়াই থেকে থেকে বাঁচালেন। কিন্তু কুতুয ﷫-এর ছিল ভিন্ন অভিমত। তাঁর কাছে মনে হয়, ফিলিস্তিন গিয়ে তাদের সাথে লড়তে হবে।

কেন?

কারণ, তাঁর মতে মিসরের জাতীয় নিরাপত্তার শুরু পূর্ব সীমান্ত থেকে। সীমান্তে তাতারের মত অস্ত্রে-শস্ত্রে সমৃদ্ধ একটি বিরাট সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে মিসরের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন হতে পারে না। আরও ব্যাপার হচ্ছে লড়াই শত্রুর ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, কায়রোর মাটিতে যদি পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলে আশ্রয় মিলবে

কোথায়? অথচ লড়াই যদি ফিলিস্তিন বা গাজায় হয় তা হলে মিসর এসে নতুন করে বাহিনী বিন্যস্ত করা যাবে এবং নতুন করে শত্রুর উপর হামলা করা যাবে।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে– তিনি অভিনব সামরিক চাল চালবেন। কেননা, তাতাররা ভাববে যে, কুতুয মিসরের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষায় দূর্গ প্রস্তুত করবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ফিলিস্তিনে উপস্থিত করে তাদেরকে হতভম্ব করে দিবেন।

চতুর্থ বিষয়– তিনি তাদেরকে বলেন, মিসরের মুসলমানদের কাঁধে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের দায়িত্ব আছে। যদি তারা মিসরে না-ও আসে, তবুও ফিলিস্তিনের মুসলিম নর-নারীকে তাতার শক্তির কাছে ন্যস্ত করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না। তারা তাদের নির্যাতন করবে, লুট করবে এবং তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করবে। কাজটি আমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিবে। আলেমসমাজ ও নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা করলে তাঁরা তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং তারা মিসরীয় বাহিনীর প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। গ্রীষ্মের উত্তাপ ও প্রতিকুল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে কুতুয ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে পৌঁছেন। সময়টি ছিল ৬৫৮ হিজরী (১২৬০ খ্রিস্টাব্দ)। তারা গাজায় নিযুক্ত তাতার প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর বিজয় অর্জন করেন। আরও পথ অতিক্রম করে এই বাহিনী সেই ভূখণ্ডে পৌঁছে, তাতার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য কুতুয যেটা নির্বাচন করেছিলেন। তা হল আইন জালুত সমভূমি অঞ্চল।

এ অঞ্চলে সংঘটিত হয় বিরাট এক লড়াই, যা শুধু ইসলামী ইতিহাসে নয়, বরং পুরো মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে বড়। কেননা, তাতার সাম্রাজ্য দুনিয়ার মুসলিম বিশ্ব ও অমুসলিম বিশ্ব– সর্বত্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কাজেই আইন জালুতের যুদ্ধ ছিল এমন যুদ্ধ, যা সমগ্র মানবতার পক্ষে সোনার হরফে লিখে রাখার মত। এ যুদ্ধে কুতুয চরমভাবে তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেন। অত্যন্ত নিখুঁত সামরিক পরিকল্পনার পর আল্লাহ ﷻ-এর তাওফীকে আইন জালুত সমভূমিতে তাতার বাহিনীকে কুতুয পুরাপুরি নিঃশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হন।

২৫ রামাদান ৬৫৮ হিজরীতে সংঘটিত হয় আইন জালুত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তাতার বাহিনী পুরাপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। সব নিহত হয়; মুসলমানদের হাতে থেকে কোনো তাতারের রক্ষা হয়নি। তাতারদের হাত থেকে মুসলমানরা শামের ভূখণ্ড স্বাধীন করেন। এর চার-পাঁচ দিন পর কুতুয বিজয়ী বেশে দামেশক প্রবেশ করেন। এটা ছিল ঈদুল ফিতরের দিন। সুতরাং এ ছিল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঈদ, কারণ এই তারিখে মুসলমানরা বিরাট এক বিজয় অর্জন করে।

এসব বিজয় ছিল মামলুক সাম্রাজ্যের আসল জন্ম, যা পরবর্তীতে তিন শতাব্দীকাল মুসলিম বিশ্বকে পরিচালনা করে। মুহূর্তের ব্যবধানে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এক পরাশক্তির পতন হয় এবং আরেক পরাশক্তি জন্মগ্রহণ করে। পতন হয় তাতার পরাশক্তির; জন্ম হয় মামলুক পরাশক্তির।

আইন জালুত যুদ্ধের পর দুই মাস না যেতেই কুতুয ﵀ নিহত হন। কিন্তু তিনি মারা গেলেও তাঁর কৃতিত্বের মৃত্যু হয়নি। তাঁর মৃত্যু নিয়ে এখানে বড় বড় প্রশ্ন দেখা দেয়। ইতিহাসবিদদের অনেক বক্তব্য অভিযোগের ইশারা যায় যাহির বাইবার্সের দিকে, যিনি তাঁর পরে শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে এ ব্যাপারে আমার বেশ সন্দেহ রয়েছে। আমার ধারণা, ঘাতক তিনি নন; অন্যকেউ।

কুতুয ﵀-এর শাহাদাতের পর যাহির বাইবার্স শাসনভার গ্রহণ করেন। মামলুক সাম্রাজ্যে মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

আসুন, দেখে নেওয়া যাক যাহির বাইবার্স ও তাঁর পরবর্তী খলিফারা ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবশিষ্ট তাতারদের সাথে কী আচরণ করেন?

তারা কীবা করতে যাচ্ছেন ক্রুসেডারদের সাথে, যারা অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনী উপকূল, লেবানন উপকূল দখল করছে এবং উত্তর সিরিয়ায় আন্তাকিয়া আমিরাত এখনও দখল করে রেখেছে?

ইসলামী বিশ্ব হতে ক্রুসেডারদের বিতাড়ন

শাসনভার গ্রহণ করেন যাহির বাইবার্স। তিনি ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম এক মহান ব্যক্তি। ৬৫৮ হিজরীর শেষ থেকে ৬৭৬ হিজরী (১২৬০-১২৭৭ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের শাসন করেন। মোট সতের বছর কয়েক মাস ছিল তাঁর শাসনকাল। যাহির বাইবার্সকে বলা হয় মহান বিজেতা। কিন্তু কেন?

কারণ, শাসনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইসলামী বিজয়াভিযানে লিপ্ত ছিলেন। শাসনভার পেয়ে তিনি ইসলামী বিশ্বের তিনটি সমস্যা দেখতে পান।

প্রথম সমস্যা : আইয়ুবীদের অবশিষ্ট বংশধর, যারা তখনও শামে বিদ্যমান ছিলেন এবং তারা আইয়ুবী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করছিল। কেননা, কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল মামলুকদের হাতে, যারা তখন মিসর শাসন করছিলেন। কাজেই প্রথম যে দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছিল, তা হল ইসলামী বিশ্বকে এক পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ করা। সেই পতাকা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। যা বহন করছিলেন তৎকালীন সবচেয়ে শক্তিশালী ইসলামী শক্তি মামলুক সাম্রাজ্য।

দ্বিতীয় সমস্যা : তাতারদের উপস্থিতি। আমরা যেমন আগে উল্লেখ করেছি যে, আইন জালুত যুদ্ধে তাতার বাহিনী নিঃচিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে এখানে যে বাহিনী উদ্দেশ্য, তা হল ইরাক, পারস্য, এশিয়া মাইনর ও ইসলামী প্রাচ্যে বিদ্যমান তাতার বাহিনী। হালাকু খান তখনও বিদ্যমান ছিল। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শামে

মামলুকদের হাতে তাতার বাহিনীর অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে তারা মামলুকদের প্রতি ছিল চরম ক্ষুব্ধ। তাতাররা মামলুকদের বিরুদ্ধে বার বার বাহিনী পাঠাচ্ছিল। যাহির বাইবার্স সেগুলোর বেশিরভাগ লড়াইয়ে নিজে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক বড় বড় বিজয় অর্জন করেন।

তৃতীয় সমস্যা : ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া ও তুরস্কের কিছু অঞ্চলে ক্রুসেডারদের উপস্থিতি। যাহির বাইবার্স যখন ইসলামী বিশ্ব শাসন করছিলেন, তখন ক্রুসেডারদের তিনটি বড় আমিরাত বিদ্যমান ছিল। আক্কা আমিরাত– ইয়াফা ও উত্তর বৈরুত ছিল এর শাসনাধীন। তরাবলুস আমিরাত– ভূমধ্য সাগরের তীর জুড়ে উত্তর লেবানন ও দক্ষিণ সিরীয় উপকূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই রাজ্য। আন্তাকিয়া আমিরাত– উত্তর সিরিয়া ও দক্ষিণ তুরস্ক জুড়ে ছিল এই রাজ্যের অবস্থান। আর তাতার বাহিনী ছিল উত্তর তুরস্ক ও ইরাকে। এ সময় মিসরীয় ইসলামী বাহিনীর ক্যাম্প ছিল কায়রো এবং সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হত অন্যান্য অঞ্চল।

যাহির বাইবার্সের শাসনের প্রথম চার বছর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সুবিন্যাস এবং মুসলমানদেরকে এক পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যয় হয়ে যায়। এই সময়ে তিনি শাম ও মিসরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হন। কয়েকটি ময়দানে তাতারদের মুখোমুখি হন এবং সবগুলোতে জয়লাভ করেন। চার বছর পর ৬৬৩ হিজরীতে তিনি ক্রুসেডারদের দিকে নজর দেওয়া শুরু করেন। শুরু হয় আল্লাহর পথে জিহাদের এক নতুন অধ্যায়। ৬৬৩ হিজরীতে (১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কায়সারিয়া জয় করেন। এরপর জয় করেন আরসোফ। এরপর ৬৬৪ হিজরীতে তিনি সফদ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেন। আরও জয় করেন তরাবলুসের কিছু অংশ। অর্থাৎ তিনি একসঙ্গো একাধিক ক্রুসেড সাম্রাজ্যের সাথে লড়াই করতে থাকেন; শুধু আক্কার সাথে নয়। ৬৬৬ হিজরীতে তিনি ইয়াফা শহর ক্রুসেডার মুক্ত করেন। ৬৬৭ হিজরীতে (১২৬৮ খ্রিস্টাব্দ) তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় বিজয় অর্জন করেন, তা হল আন্তাকিয়া আমিরাতের উপর বিজয়। ৪৯০ হিজরীতে ইসলামী বিশ্বে

এই ক্রুসেড রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ এর বয়স হয়েছিল ১৭৬ বছর। তার মানে এর মধ্যে কয়েক প্রজন্মের মৃত্যু হয়েছে এবং জন্ম হয়েছে আরও কয়েক প্রজন্মের। তারপরও বিষয়টি যাহির বাইবার্সের মাথায় ছিল। যাহির বাইবার্স শহরটি খুব কঠিনভাবে অবরোধ করেন। ৬৬৭ হিজরীর রমাদান মাসে তিনি বিজয়ী বেশে আন্তাকিয়ায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং বিপুল পরিমাণ গনীমত অর্জন করেন। ক্রুসেডারদের পরিসংখ্যান অনুসারে আন্তাকিয়ায় ক্রুসেডার বন্দীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।

আন্তাকিয়ার পতনের পর ক্রুসেডাররা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। সাইপ্রাসের শাসক তৃতীয় হিউ (Hugh Everett III) এ সময় আক্কা আমিরাত ও তরাবলুস আমিরাতকে যাহির বাইবার্সকে মোকাবেলা করার জন্য এক করতে সক্ষম হন। তখন তাতারদের সাথে কয়েকটি সংকটের মুখোমুখি হন যাহির বাইবার্স। কাজেই বাধ্য হয়ে তিনি তরাবলুস ও আক্কা আমিরাত দুটির সাথে সাময়িক সন্ধি করেন। ক্রুসেডাররা তখন ছিল সুলতান যাহির বাইবার্সের ভয়ে চরম ভীত। তাই তারা সানন্দ্যে সন্ধি-প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাকি জীবন তাতারদের সাথে লড়াই চালানোর জন্য এভাবে তিনি নিজেকে ক্রুসেডারদের ঝামেলা থেকে মুক্ত করেন। ৬৭৬ হিজরীতে (১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়।

যাহির বাইবার্সের মৃত্যুর দুই বছর পর শাসন ক্ষমতা নিয়ে মামলুক সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে যা নিতান্তই স্বাভাবিক।

৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে) ইসলামী ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তি শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি হলেন সাইফুদ্দীন কালাউন। তাঁর শাসনামল ১১ বছর স্থায়ী হয়। তাঁর শাসনের মূল কেন্দ্র ছিল কায়রো। তিনি যাহির বাইবার্স কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সমস্ত অঞ্চলের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। তাঁর মাথায়ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্তির বিষয়টি বদ্ধমূল ছিল। ক্রুসেডারদের কাছ থেকে মুরাক্কাব দূর্গ তিনি জয় করতে সক্ষম হন। যা ছিল তাদের খুব শক্তিশালী ও দাম্ভিক একটি দূর্গ। এরপর লাতাকিয়া শহর জয় করেন। এরপর তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করেন। তা হল তরাবলুস শহর জয়, ৫০৩ হিজরীতে ক্রুসেডারদের হাতে যার পতন হয়েছিল। আগ্রাসনের ১৮৫ বছর পর ৬৮৮

হিজরীতে সাইফুদ্দীন কালাউন এই শহর পুনরুদ্ধার করেন। এভাবে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ক্রুসেডারদের শুধু একটি রাজ্য অবশিষ্ট থাকে। তা হল শুধু আক্কা আমিরাত এবং এর অধীনস্ত সাইদা, বৈরুত ও সুরসহ উত্তর ফিলিস্তিন ও মধ্য লেবাননের ভূখণ্ডে কয়েকটি শহর।

৬৮৯ হিজরীতে (১২৯০ খ্রিস্টাব্দে) কালাউনের মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর পুত্র আশরাফ খলীল সালাহুদ্দীন ইবনু কালাউন শাসনভার গ্রহণ করেন। এই আশরাফ খলীলকে মামলুক সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ শাসক গণ্য করা হয়। মামলুকদের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে সফল ছিলেন বলে নয়; বরং তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইসলামী বিশ্ব থেকে অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। অবশ্য যাহির বাইবার্স ও সাইফুদ্দীন কালাউনের পর ক্রুসেডারদের শক্তি একেবারে দূর্বল হয়ে পড়েছিল। দেড় মাস অবরোধের পর তিনি আক্কা শহরের পতন ঘটাতে সক্ষম হন এবং আগ্রাসনের ১৯৩ বছর পর তা জয় করেন। আক্কার পতনের পর অন্যান্য শহর একে একে তাঁর পদানত হতে থাকে। সুর, বৈরুত, হাইফা ও তারাতুস আত্মসমর্পণ করে। এর মাধ্যমে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায়ের পাতা উল্টিয়ে দেওয়া হয়। তা হল ইসলামী বিশ্বে ক্রুসেড লড়াইয়ের কালো অধ্যায়। এর মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ব ক্রুসেডারদের থেকে পুরাপুরিভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এখানে একটি বিষয় খোলাসা করার জন্য আমাদের একটু বিরতি নেওয়া আবশ্যক। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্রুসেড যুদ্ধের এই দীর্ঘ ইতিহাসে মুসলমানরা পরাজয়ের শিকার হয়েছেন শুধু তাদের রব ﷻ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে। যখন মুসলমানরা আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্ক মযবুত করেছেন এবং রাস্তাহিসাবে জিহাদকে বেছে নিয়েছেন, তখন বিজয়ী হয়েছেন। এমনই ঘটেছে নুরুদ্দীন মাহমুদের যামানায়, তাঁরও পূর্বে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর যামানায়। তারপর সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর যামানায়। তার পর কুতুয, যাহির বাইর্বাস ও সাইফুদ্দীন কালাউনের যুগে। এরা সবাই ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুজাহিদ ও মুজাদ্দিদ। মুসলমানরা তখনই বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন, যখন তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। এমন হয়নি যে, তারা বিভক্ত থেকেও বিজয় লাভ করেছেন। এ বিষয়টি আল্লাহ ﷻ-র কিতাবে একাধিক জায়গায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে–

> আর আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো এবং তাঁর রসূলের। তা ছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। [সুরা আনফাল- ৮:৪৬]

মুসলমান ও ক্রুসেডারদের মধ্যকার কোনো যুদ্ধের বিজয়ে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব ছিল না। বরং আমরা দেখেছি এর উল্টো। আইয়ুবী, তুর্কী, মামলুক, আরব– সবার অবস্থান আমরা দেখেছি। সবাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একে অপরকে সাহায্য করেছেন। এই কাহিনীতে আমরা যখনই কোনো বিচ্যুতি দেখেছি, সাথে সাথে তা শোধরানো হয়েছে। আল্লাহর কৃপায়, সবসময় এই জাতির মধ্যে এমন কেউ না কেউ থাকবেন, যিনি ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখবেন। ইসলামের পতাকা কখনও মরবে না, পতিত হবে না।

২০০ বছরের আগ্রাসন যাহির বাইবার্স, সাইফুদ্দীন কালাউন ও আশরাফ খলিলের কাছে হতাশা সৃষ্টিকারী কোনো বিষয় ছিল না। তাই বলে এ দীর্ঘ সময়ের দুশমনও সাধারণ ছিল না। আবার একটি-দুটি রাষ্ট্রও ছিল না; বরং দুশমন ছিল পুরো ইউরোপ। কখনও তারা পূর্ব ইউরোপের বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সাথে জোট করে বিরাট বাহিনী নিয়ে আবির্ভূত হত। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে পঙ্গপালের মত আছড়ে পড়ত। সংখ্যা ও প্রস্তুতির বিবেচনায় তারা ছিল খুব ভয়ঙ্কর শত্রু। তবুও আল্লাহ ﷻ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন, যখন তাঁরা আল্লাহ ﷻ-এর কিতাব আকড়ে ধরেছে।

আমাদের বর্তমান অবস্থার দৃশ্যপট ক্রুসেড যুদ্ধের সময়কালের সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্য রাখে। বর্তমান ইহুদী আগ্রাসন বড় রকমে সেই ক্রুসেড লড়াইয়ের মতই। আদর্শ ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ফিলিস্তিনকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন করা সম্ভব নয়।

ক্রুসেডারদের হাত থেকে ইসলামী বিশ্বকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করার মহান কৃতিত্বের অধিকারী মামলুক সাম্রাজ্য নিয়ে জানাশোনা থাকা

দরকার। ক্রুসেডারদের আগে যে সাম্রাজ্য দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীকেও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

মামলুক সাম্রাজ্য ইসলামী ইতিহাসের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য। মধ্য ইসলামী বিশ্বের বিরাট ভূখণ্ডে তাদের আধিপত্য ছিল। মিসর, শাম, হেজায ও ইয়ামানের বড় একটি অংশ ছিল এর নিয়ন্ত্রণাধীন। আরও ছিল তুরস্ক ও ইরাকের বেশ কিছু অংশও। প্রায় তিন শতাব্দীকাল ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে রেখেছিল এই সাম্রাজ্য। মোকাবেলা করেছে মুসলমানদের সাথে লড়তে আসা বহু শক্তিকে। বিশেষ করে তাতার ও ক্রুসেডার বাহিনীকে। আন্দালুসের পতনের পর পাশ্চাত্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা পর্তুগিজ বাহিনীকেও রুখে দিয়েছিল। মামলুক সাম্রাজ্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যকে প্রতিহত করার দায়িত্ব নিয়েছিল।

মামলুকদের পুরো ইতিহাসে ইহুদীরা ফিলিস্তিনের দিকে ফিরেও তাকাতে পারেনি। তখন মুসলমানদের শক্তি ছিল প্রবল। তবে এখানে পর্যাপ্ত উদারতা ছিল। ইহুদীদেরকে আল-কুদস ও ফিলিস্তিন যিয়ারতের সুযোগ দেওয়া হত। ইসলামের ইতিহাসে খুব দুর্লভ কিছু পরিস্থিতিতে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বিবাদের ঘটনা ঘটত। মামলা দায়ের করা হত ইসলামী মামলুক সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগে। হক ইহুদীর পক্ষে থাকলে বিচারের রায় তার পক্ষেই চলে যেত।

এমন গল্পের মধ্যে অন্যতম একটি গল্প প্রসিদ্ধ মামলুক সুলতান কাইতুবাঈ থেকে বর্ণিত আছে। এক টুকরো জমি নিয়ে ইহুদীদের গীর্জা আর মসজিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। সুলতান কাইতুবাঈ ইহুদীদের পক্ষে রায় দিয়ে দেন, যখন তাঁর কাছে প্রমাণিত হয় যে, গোড়ার দিকে জমিটুকু ছিল ইহুদীদের।

ইহুদীদের সাথে এই ইসলামী উদারতার সমকালে ইউরোপ জুড়ে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে চলছিল ইহুদী নিধন। এমনকি ৬৯০ হিজরীতে (১২৯০ খ্রিস্টাব্দে) ইংল্যান্ডের সম্রাট প্রথম এডওয়ার্ড সমস্ত অবিশ্বাসীকে ইংল্যান্ড থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জারি করেছিল। তার সংজ্ঞায় অবিশ্বাসী ছিল কারা? তারা হল ইহুদী।

এর কয়েক বছর পর ৭০৬ হিজরীতে (১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে) ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফিলিপও সমস্ত ইহুদীকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়নের বিল পাশ করে। তবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে ভিন্ন কথা। এ ছিল ধর্মান্তরের উপর স্পষ্ট চাপ। তখন খ্রিস্টান গির্জাগুলোতে ইহুদীদের আনাগোনা শুরু হয়। যা পরবর্তীতে খ্রিস্টান যায়নবাদের জন্ম দেয়। এরা মূলত ছিল ইহুদী। নির্যাতন ও বিতাড়ন থেকে বাঁচার জন্য তারা খ্রিস্টান ধর্মের আশ্রয় নেয়। কিন্তু এর ফলফল কি হয়? তারা ইউরোপের ইতিহাসের বহু গতি বদলে দেয়। এরপর তারা ইসলামী বিশ্বেও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

মামলুকদের শাসনামলে বহু ফেতনা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকলেও ফিলিস্তিন সবসময় মামলুক আমিরাত হিসাবে শাসিত হতে থাকে। এখানে খুব শান্তি, শৃঙ্খলা ও নীরবতা বিরাজ করত। মামলুকদের শেষ যুগে উসমানী সাম্রাজ্যের উত্থানকালে এখানকার পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়।

মামলুক সাম্রাজ্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই নতুন একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। তবে এ সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে মামলুক ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে। তা হল উসমানী সাম্রাজ্য। এশিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে। উসমানী সাম্রাজ্যের সূচনা ছিল জিহাদী সূচনা। যে উসমান ইবনু আরতুগ্রুলের দিকে সম্বন্ধ করে এ সাম্রাজ্যের নাম রাখা হয় উসমানী সাম্রাজ্য, তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক মুজাহিদ। তাঁর শাসিত ভূখণ্ড খুব ক্ষুদ্র হলেও তার হিম্মত ছিল আকাশচুম্বি। যা তাঁর নিজের জীবনে এবং তাঁর উত্তরসূরিদের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। উসমান ইবনু আরতুগ্রুলের যুগ থেকে প্রায় ৪০০ বছর পর্যন্ত বজায় ছিল তাদের এ প্রতাপ ও শক্তিমত্তা।

উসমান ইবনু আরতুগ্রুলের জীবনে একটি মূলমন্ত্র ছিল। যেটা শাসকদের জীবনে অনুসরণীয় মূলমন্ত্র। তা হল 'হয়তো গাজী, নয়তো শহীদ।' সুতরাং পালানোর কোনো সম্ভাবনা এখানে নেই।

উসমান ইবনু আরতুগ্রুল নিজের নাম রেখে ছিলেন 'সুলতান গাজী'। তাঁর পরবর্তী উসমানী সুলতানরাও নিজেদেরকে এভাবেই পরিচয়

দিতেন। তার নিজের একটি পতাকা ছিল, যা এখনও তুরস্কের জাতীয় পতাকা।

উসমান ইবনু আরতুগ্রুলের পর অত্যন্ত প্রভাবশালী একজনের আগমন ঘটে। তিনি উসমানের ছেলে প্রথম মুরাদ। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর সাম্রাজ্য শাসন করেন। মুসলমানদের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ইউরোপে রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি ইউরোপে অভিযান চালিয়ে এড্রির্ন (Adirne) অঞ্চল জয় করেন। যা বর্তমান তুরস্কের একটি অংশ। এড্রির্ন শহরকে তিনি উসমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন। তিনি কনস্টান্টিনোপল শহরের চারপাশে আনাগোনা শুরু করেন। তবে দূর্ভেদ্য হওয়ায় সেখানে প্রবেশ করতে পারেননি। এরপর তিনি দক্ষিণ বুলগেরিয়া ও দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়া জয় করেন। জয় করেন সোফিয়া শহর। ফাতাহ করেন গ্রিসের স্যালোনিক শহর। এরপর কসোভো জয় করেন।

এখানে আমি তুলে ধরতে চাই সেই দুআ, যা তিনি কসোভো জয় করার রাতে উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া এলাহী! আমি আপনার সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলছি, আমি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া কামনা করি না। আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। আপনার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই আমার কাম্য নয়। ইয়া এলাহী! আপনি আমাকে আপনার পথে জিহাদের নির্দেশনা দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এখন আমাকে আপনার পথে মৃত্যু দিয়ে আরও সম্মানিত করুন।

এর পরের দিন মুসলমানরা কসোভো যুদ্ধে সার্বিয়ার বাহিনীর উপর বিরাট বিজয় অর্জন করেন এবং তারা অঞ্চলটিকে উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন। প্রথম মুরাদ এই লড়াইয়ে শাহাদত বরণ করেন, যেমন তিনি আল্লাহর কাছে দাবি করেছিলেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র প্রথম বায়যিদ শাসনভার গ্রহণ করেন। আর তখন উসমানী সাম্রাজ্য শক্তিমত্তার এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

উসমানী সাম্রাজ্য ও ফিলিস্তিন সংযুক্তি

আমরা সুলতান প্রথম বায়যিদের আলোচনায় চলে এসেছি। ইতিহাসে যিনি 'বজ্র' নামে পরিচিত। শত্রুর উপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ার দক্ষতার কারণে তাঁর এই উপাধি। শেষ জীবনে তিনি একটি দুর্যোগের শিকার হন। তা হল তয়মুর লঙের নেতৃত্বে তাতারদের নতুন উত্থান।

উসমানী সাম্রাজ্যের আধিপত্য নতুন করে ফিরিয়ে আনতে তাঁর পর আগমন ঘটে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের। ৮২৪ হিজরীতে মাত্র ১৮ বছর বয়সে দ্বিতীয় মুরাদ শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের একজন মুজাহিদ। ৮৫৫ হিজরী পর্যন্ত তার শাসনামল স্থায়ী হয়। তিনি মোট ৩১ বছর উসমানী সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে তিনি সমগ্র আলবেনিয়া ও হাঙ্গেরী জয় করেন। তাতারদের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া আনাতোলিয়ার ঐক্য ফিরিয়ে আনেন। মৃত্যুর সময় তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য রেখে যান তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার। সেই উপহার হচ্ছে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ।

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ উসমানী সাম্রাজ্যের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সুলতান। ৮৫৫ হিজরী থেকে ৮৮৬ হিজরী (১৪৫১-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত ধারাবাহিক ৩১ বছর তিনি উসমানী সাম্রাজ্য শাসন করেন।

মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করলেও তার মধ্যে ছিল প্রবীণ ও বড়দের অভিজ্ঞতা। দায়িত্ব গ্রহণের ৩ বছরের মধ্যেই তিনি

বাস্তবায়ন করেন মুসলমানদের স্বপ্ন। প্রমাণ করেন প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সততা। ৮৫৭ হিজরীতে (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে) তিনি জয় করেন বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। এর মাধ্যমে তিনি বাস্তবায়ন করেন হাদীসে নববী—

> অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে। কতইনা ভাগ্যবান আমীর, ওই আমীর! আর কতইনা ভাগ্যবান বাহিনী, ওই বাহিনী! [আহমাদ : ১৮৯৫৭]

সেই বাহিনী হচ্ছে উসমানী সাম্রাজ্যের বাহিনী। আমাদের ইতিহাসে যারা বহু বিকৃতির শিকার। এই তরুণ মহানায়ক বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর এই অবিস্মরণীয় বিজয়, কন্সটান্টিনোপলের পতন এবং সেটাকে ইসলামবুল– (পরবর্তীতে পরিবর্তন করে ইস্তাম্বুল করা হয়)– নাম দিয়ে একটা ইসলামী শহরে রূপান্তর করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি আরও এগিয়ে যান এবং বেলগ্রেড (Belgrade) শহর বাদে পুরো সার্বিয়া ফাতাহ করেন। রোমানিয়া ও বসনিয়ার দেশও ফাতাহ করতে সক্ষম হন। তাঁর যামানায় বসনিয়ার অধিবাসীরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। প্রায় ত্রিশ হাজার বসনীয় যুবক মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের যামানায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য উসমানী বাহিনীতে যোগদান করেন। অথচ তারা মূলত ছিল খ্রিস্টান। গ্রিস, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো ও ইতালির অট্রান্টো (Otranto) শহরের কিছু অংশ জয় করেন। এরপর তিনি রোম বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন। যাতে বাস্তবায়িত হয় নবীজী ﷺ-এর সেই হাদীস, যাতে তিনি কনস্টান্টিনোপল ও রোম বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তার আয়ু ফুরিয়ে আসে এবং তিনি মারা যান। আর মহান স্বপ্ন বাস্তবায়নের ভার ছেড়ে যান পরবর্তী প্রজন্মের উপর।

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের পর উসমানী সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বায়যিদ। তিনি ৩২ বছর শাসন পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন অনেকটা সন্ধিপ্রিয় সুলতান। তাঁর সময়ে মামলুক সাম্রাজ্যের সাথে উসমানী সাম্রাজ্যের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। মামলুক সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন তখন সুলতান কাইতবাঈ। দুই

সাম্রাজ্যের মধ্যে সন্ধির বহু প্রচেষ্টা চলতে থাকলেও কাইতবাঈ উসমানী সাম্রাজ্যে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে সেনা সংগ্রহ করতে থাকেন।

এখানে নতুন করে ফিলিস্তিনের নাম চলে আসে। ফিলিস্তিন তখনও ছিল মামলুক সাম্রাজ্যের অধীনে। কাইতবাঈ ফিলিস্তিন থেকেও সৈন্য সংগ্রহ করেন। যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী প্রস্তুতের ব্যায়ভার মিটাতে তাদের উপর পীড়াদায়ক করের বোঝা চাপিয়ে দেন।

ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা বুঝতে পারছিল অচিরেই তাদের উসমানী সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হতে হবে, যেই সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপলসহ ইউরোপের অর্ধেক জয় করেছে। যার সেনাবাহিনী বহন করে ইসলামের পতাকা। যারা ইসলামী শরীয়ত পালনে বদ্ধপরিকর। এই বিষয়টি তাদেরকে মামলুকদের এই লড়াইয়ে সহায়তা করতে অনাগ্রহী করে তোলে।

এর সাথে আরও যোগ করুন– সুলতান দ্বিতীয় বায়যিদ ও সুলতান কাইতবাঈ'র যুগেই আন্দালুসের পতন হয়। ৮৯৭ হিজরীতে (১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে), যা ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য খুবই বেদনাদায়ক।

৯১৮ হিজরীতে (১৫১২ খ্রিস্টাব্দে) উসমানী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সংঘটিত হয় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। দ্বিতীয় বায়যিদের পুত্র প্রথম সেলিম তখন শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রথম সেলিম ছিলেন একজন সামরিক ব্যক্তি। তাঁর স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ছিল বিশাল। শাসনভার গ্রহণের প্রথম দিকে তাঁকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। এ সময় বিশ্বে বেশ কয়েকটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেগুলোর অন্যতম ছিল ইরানে সাফাবী সাম্রাজ্যের উত্থান। সাফাবী সাম্রাজ্য ছিল ইসনা আশারিয়া মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি শিয়া সাম্রাজ্য।

সাফাবীদের লক্ষ ছিল সুন্নী ইসলামী বিশ্বের উপর শিয়া আগ্রাসন পরিচালনা করা। সত্যি সত্যি সাফাবীরা ইরাক অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করে। এরপর বল প্রয়োগ করে ইরাককে শিয়া বানানো শুরু করে। তখন ইরাকবাসীরা সুন্নীদের সবচেয়ে শক্তিশালী সুলতানের কাছে

সাহায্যের আবেদন জানায়। তিনি হলেন ইস্তাম্বুলের সুলতান প্রথম সেলিম। এতে তাঁর ও ইরানের সাফাবী সাম্রাজ্যের মধ্যে একধরণের কষাকষি শুরু হয়। এমন সময় পর্তুগিজরাও তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রুসেড নৌসেনা। এ সময়েই ভাস্কোদাগামা 'ক্যাপ অব গুড হোপ' আবিষ্কার করেন। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে আরব উপসাগরে এবং ইয়ামানে অভিযান শুরু করেন।

আফসোসের বিষয়, এসময় পর্তুগিজ ও ইরানের সাফাবী সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য সহায়তার ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় সাম্রাজ্য সুন্নী উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আফসোস, মামলুকগণ তখন নিরপেক্ষ সেজে বসে থাকেন। সুলতান প্রথম সেলিম তাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, তিনি এখন পর্তুগিজ এবং ইসলামী বিশ্বে শিয়া আগ্রাসন পরিচালনাকারী সাফাবী সাম্রাজ্যের সাথে লড়ছেন। কাজেই মামলুক সাম্রাজ্যের উচিত সংকট মোকাবেলায় উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে হাত মেলানো। কিন্তু তৎকালীন মামলুক সাম্রাজ্যের কর্ণধার কানসুহ ঘুরী উসমানী সাম্রাজ্যের সহায়তা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উসমানী সাম্রাজ্য তাঁর এ আচরণকে মুসলমানদের হকের উপর সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য করে। এতে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে তীব্র বিভেদ ও রেষারেষি সৃষ্টি হতে থাকে।

সুলতান সেলিম মামলুক সাম্রাজ্যের এসব উস্কানি উপেক্ষা করে নিজের বাহিনী নিয়ে ইরাকের সাফাবী সাম্রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করেন। সাফাবী বাহিনী তখন ইরাক দখল করেছিল। যাত্রা পথে তিনি আনাতোলিয়া অঞ্চলে একটি ইসলামী আমিরাত অতিক্রম করেন। সেটার নাম ছিল যিল কাদির বা দিলগাদির। এ রাজ্যের আমীর আলী দৌলত উসমানী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে। এ ঘটনাকে সুলতান প্রথম সেলিম উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলুক সাম্রাজ্যের প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা বলে ধরে নেন। তবুও তিনি আপাতত এ পর্ব রেখে দিয়ে ইরাক পৌঁছেন। ইরাক অতিক্রম করে সাফাবী সাম্রাজ্যের সাথে একটি চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য তিনি পারস্যের জালদিরান পৌঁছেন। ৯২০ হিজরীতে (১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে) এখানে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক বিরাট লড়াই সঙ্ঘটিত হয়।

সাফাবীদের উপর সেলিম অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেন। এমনকি তিনি সাফাবীদের রাজধানী ইরানের তাবরিয শহরেও প্রবেশ করেন। এভাবে তিনি সমগ্র ইরাক এবং পূর্ব ইরানেও উসমানী সাম্রাজ্যের আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। এরপর ইস্তাম্বুল ফিরে আসেন এবং মামলুকদের অধ্যায় নিয়ে নতুন গবেষণা শুরু করেন।

এসময় কানসুহ ঘুরী বুঝতে পারেন যে, মামলুক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। তাই তিনি নিজের বাহিনী প্রস্তুত করে উসমানী বাহিনীর সাথে লড়ার জন্য আলেপ্পোর উত্তর পশ্চিমে চলে যান। ৯২২ হিজরীতে (১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে) প্রখ্যাত মার্জ-দাবিক ময়দানে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে সুলতান প্রথম সেলিম বিজয়ী হন এবং মামলুক বাহিনী বিপর্যস্ত হয়। কানসুহ ঘুরী এই লড়াইয়ে নিহত হন।

বিজয়ের পর সুলতান প্রথম সেলিম শামের সমস্ত অঞ্চলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবানন– সবগুলি অঞ্চল উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন।

এরপর তিনি মামলুক সাম্রাজ্যের শেষ আশ্রয়স্থল মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। কায়রোর প্রাচীরের বাইরে রিডানিয়া (Ridanya)-এর ময়দানে সুলতান প্রথম সেলিম ও মামলুকদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও সেলিম বিরাট বিজয় অর্জন করেন। সুলতান তুমান বাঈ নিহত হন। তাকে যুওয়াইলার ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যা খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা। এভাবে এ ভূখণ্ডেও মুসলমানদের নতুন যুগের সূচনা হয়। তা হল উসমানী সাম্রাজ্যের যুগ, অথবা বলতে পারেন উসমানী খেলাফতের যুগ।

এ সময় উসমানী সাম্রাজ্য প্রথমবারের মত মুসলিম উম্মাহর খেলাফতের ঘোষণা প্রদান করে। কেননা, উসমানী সাম্রাজ্য তখন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। ইউরোপের অর্ধেক, মিসর, ইরাক ও সমগ্র শাম ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয় উসমানী সাম্রাজ্যে। এখান থেকে আমরা উসমানী শাসনকাল দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম পর্ব, উসমানী সাম্রাজ্যের, যা মামলুকদের সমকালে বিদ্যমান ছিল। মোট ২২৪ বছর দীর্ঘ হয় এ পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব, উসমানী খেলাফতের, যা দীর্ঘ হয় ৪১৯ বছর। ৯২৩ হিজরীতে মামলুকদের পতন থেকে ১৩৪২ হিজরী (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত। আর যদি উসমানী খেলাফত ও উসমানী সাম্রাজ্য উভয় পর্ব একত্র করি তা হলে মোট হয় ৬৪৩ বছর। এটাই উসমানী সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল। মুসলমানদের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদি সাম্রাজ্য। কিন্তু এতদসত্তেও এই সাম্রাজ্যের ইতিহাস সবচেয়ে বেশি বিকৃতির শিকার। তা হবেই না কেন? এই সাম্রাজ্য লড়েছিল ইউরোপের সাথে। আর আফসোস যে, ইউরোপই আমাদের বর্তমান যুগে রচনা করেছে মুসলমানদের ইতিহাস।

এভাবে ফিলিস্তিন মামলুক আমিরাত থেকে উসমানী আমিরাতে পরিণত হয় এবং উসমানী খেলাফতের শেষ তথা ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগ পর্যন্ত অভিন্ন রূপে অব্যাহত থাকে।

উসমানী খেলাফতের শুরুর দিকে ইসলামী বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল খুব স্থিতিশীল। সুলতান প্রথম সেলিমের পর তাঁর পুত্র প্রথম সুলাইমান শাসনভার গ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি সুলতান সুলাইমান আল-কানুনী নামে পরিচিত। তিনি দূর-দিগন্তে ইসলাম বিস্তার করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনামল ছিল উসমানী খেলাফতের সর্বোচ্চ শক্তির যুগ। তাঁর শাসন ব্যাপ্তি লাভ করে ৪৮ বছর। উসমানী খেলাফত তখন দুনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। একই সময়ে এই সাম্রাজ্য ২০ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারেরও বেশি ভূখণ্ড শাসন করতে থাকে। ত্রিশেরও বেশি দেশ অন্তর্ভুক্ত হয় এর অধীনে। সুলাইমান আল-কানুনীর যুগে আলজেরিয়া ও লিবিয়া উসমানী সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়। ফ্রান্সের দখলে চলে যাওয়া তিউনিসিয়া উদ্ধার করে সুলাইমান নিজের সাম্রাজ্যে যুক্ত করেন। যুক্ত করেন রোমানিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো। বেলগ্রেড ও পুরা হাঙ্গেরী ফাতাহ করেন। পূর্ব অস্ট্রিয়া পুরোটা দখল করেন। পৌঁছে যান ভিয়েনার প্রাচীর পর্যন্ত। সেই সাথে জাযীরাতুল আরব আর ইয়ামান যুক্ত করেন। পর্তুগিজদের জুলুমের শিকার হওয়া মুসলমানদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ভারত মহাসাগরের উপকূলে হাযির হন।

সুলাইমান আল-কানুনী ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি আল-কুদসের প্রাচীর নির্মাণ করেন। সাখরা মসজিদ সংস্কার করেন। সুলতান প্রথম সেলিমের প্রণীত আইন বহাল রাখেন। এই আইন সুলতান প্রথম সেলিম ও সুলাইমান কানুনীর বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। তা হল ফিলিস্তিনের কোথাও ইহুদীরা বসবাস করতে পারবে না। তখনই উসমানী খেলাফত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রতি ইহুদীদের লোলুপ দৃষ্টির বিষয়টি উপলব্ধি করেছিল।

কেন তিনি এই আইন প্রণয়ন করেছিলেন?

কারণ, আন্দালুসের পতনের পর স্পেনের ক্রুসেডাররা সেখান থেকে মুসলমান ও ইহুদীদেরকে বের করে দেয়। তখন ইহুদীরা আশ্রয়ের খোঁজে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকে। উসমানী খেলাফত ছিল তাদের শেষ ভরসা। সুলতান দ্বিতীয় বায়যিদ ও সুলতান প্রথম সেলিম তাদেরকে উসমানী খেলাফতের ভূখণ্ডে আশ্রয় দেন। তবে তারা আইন প্রণয়ন করেন যে, ইহুদীরা উসমানী খেলাফতের অভ্যন্তরে যেকোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে; তবে ফিলিস্তিন বাদে। কেননা, তারা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের প্রতি ইহুদীদের লালসার বিষয়টি জানতেন।

সুলাইমান কানুনীর জীবনে এমন উৎকর্ষ থাকলেও তাঁর কিছু ভুল ছিল। যেগুলোর প্রভাব তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ পায়নি; তবে প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর পর। আফসোসের বিষয়, ভুলগুলো প্রভাব ফেলে মুসলমানদের অবস্থার উপর এবং বিশেষত উসমানী খেলাফতের উপর। এসব ভুলের একটি হচ্ছে, রাশিয়ান ইহুদী সুন্দরী খুররম (Hurrem Sultan)-কে বিবাহ করা। তাকে বিবাহ করাটাই সমস্যা ছিল, এমন নয়; বরং সমস্যা ছিল এই যে, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত নারীর কথা মানতে থাকেন।

এসবের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হচ্ছে এই মহিলা সুলাইমানের পুত্র মুস্তফাকে পরবর্তী শাসক করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। অথচ তিনি ছিলেন খুব উঁচু মাপের একজন মুজাহিদ। বরং নিজের গর্ভজাত সুলাইমানের পুত্র দ্বিতীয় সেলিমকে কৌশলে পরবর্তী শাসক মনোনীত করেন। অথচ শাসন পরিচালনা ও নেতৃত্বের যে গুণ মুস্তফা

ইবনু সুলাইমানের ছিল, তার ছিটে-ফোঁটাও দ্বিতীয় সেলিমের মধ্যে ছিল না। ফলে সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের যুগে উসমানী সাম্রাজ্য ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

সুলাইমান আল-কানুনীর শেষ জীবনের একটি বড় ভুল হচ্ছে তিনি উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ফ্রান্সকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দেন। তাঁর জীবদ্দশায় এসবের বড় কোনো প্রভাব পড়েনি। কারণ, তাঁর সাম্রাজ্য ছিল অনেক শক্তিশালী। তবে তাঁর পরে এসবের বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। তা হলে তিনি ফ্রান্সকে কেন এসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন?

কারণ, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ফ্রান্স তাকে কখনও কখনও সাহায্য করেছিল। অস্ট্রিয়া ছিল উভয় পক্ষের শত্রু। এর বিনিময়ে তিনি ফ্রান্সকে সুযোগ-সুবিধা দেন। আর এসব সুযোগ-সুবিধাই উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপের সূচনা সাব্যস্ত হয়। এ বিষয়টি সুলাইমান আল-কানুনীর মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায়।

আসুন, দেখি ৯৭৪ হিজরীতে সুলাইমান আল-কানুনীর মৃত্যুর পর কী ঘটে?

তাঁর পর সন্তানদের অবস্থা কী হয়?

এরপর উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইহুদীদের তৎপরতা কেমন হতে থাকে?

যে উসমানী সাম্রাজ্য অর্ধ ইউরোপ কাঁপিয়ে দিয়েছিল তার সাথে ইউরোপ কী আচরণ করে?

উসমানী খেলাফতের দুর্বলতার যুগে ফিলিস্তিন

আমরা আগে দেখেছি যে, উসমানী খেলাফত দুর্বলতার যুগে পা রেখেছে। তবে তা সম্পূর্ণ দুর্বলতা ছিল না। এ দুর্বলতা ছিল বিস্তৃতির ব্যাপারে। তখনও আগের সব ভূখণ্ড উসমানী সাম্রাজ্যের অধীনেই ছিল।

আমরা বলতে পারি, উসমানী সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তার যুগ ছিল ধারাবাহিক ২০০ বছর। পরবর্তী ১৭০ বছর ছিল বিরতির যুগ। অর্থাৎ সুলাইমান আল-কানুনীর মৃত্যুর পর ৯৭৪ হিজরী (১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ১১৭১ হিজরী (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সাম্রাজ্যের কোনো বিস্তৃতি ঘটেনি।

তবে তখনও উসমানী খেলাফত তার আওতাধীন সব ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল। তখনও এই সাম্রাজ্য ৫টি ফ্রন্টে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। পশ্চিম ফ্রন্টে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার সাথে লড়তে থাকে। এগুলোর পেছনে কখনও কখনও ফ্রান্স এবং রোমান ক্যাথলিক গীর্জার সাথে লড়তে থাকে।

উত্তর ফ্রন্টে লড়তে থাকে রুশ সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের সাথে। রুশ সাম্রাজ্য সবসময় মুসলমান তাতারদের উপর আক্রমণের পাঁয়তারা চালাত। উল্লেখ্য, তাতার সাম্রাজ্য তখন ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। উসমানী সাম্রাজ্য তৎকালীন মুসলমানদের পক্ষে বৃহত্তর রুশ সাম্রাজ্যকে প্রতিহত করত।

দক্ষিণ ফ্রন্টে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহরের মালিক পর্তুগালের সাথে লড়তে থাকে। ভূমধ্য সাগরের ফ্রন্টে লড়তে থাকে স্পেনের সাথে, যারা আন্দলুস থেকে মুসলমানদের বের করে দিয়েছিল। তারা মাঝে মাঝে উসমানী সাম্রাজ্যের আওতামুক্ত মাগরিব উপকূলে হামলা করত। তবুও উসমানী সাম্রাজ্য মাগরিবের মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ইসলামী নৌবহর প্রেরণ করত। পূর্ব ফ্রন্টে এই সাম্রাজ্য লড়তে থাকে শিয়া সাফাবী সাম্রাজ্যের সাথে, যারা প্রকাশ্যে ক্রুসেডার পর্তুগালকে সহায়তা করত।

এ সময় সাম্রাজ্যের বিস্তার স্থগিত হয়ে যায় এবং দুর্বলতা শুরু হয়। এসময় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে নিদর্শনটি ফুটে ওঠে এবং ফিলিস্তিনের কাহিনীর সাথে যার যোগসূত্র রয়েছে, তা হল 'ডোনুমাহ ইহুদী' সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ।

আমরা আগেই যেমন বলেছি, সমগ্র ইউরোপ থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে উসমানী খেলাফতে আশ্রয় নেয় এবং এখানেই তারা বসবাস করতে থাকে। বর্তমান গ্রিসে অবস্থিত উসমানী শহর থেসালোনিকিতে তারা হাঁটু গেড়ে বসে। সেখানে তারা দীর্ঘকাল বসবাস করতে থাকে। এক পর্যায়ে ১০৩৫ হিজরী (১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) সাব্বাতাই জেভি (Sabbatai Zevi) নামের এক ব্যক্তির জন্ম হয়। সে ছিল ইহুদী। যখন তার বয়স ২২ বছর হয়, তখন সে দাবি করে বসে যে, সে হচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ। কিছু সংখ্যক ইহুদী-খ্রিস্টানও তার পাশে জমা হতে থাকে। অনেক মানুষের কাছে তার ভ্রষ্টতা প্রকাশ হয়ে পড়লেও তারা তার অনুসরণ অব্যাহত রাখে। সে দুনিয়া জুড়ে বিচরণ করতে থাকে। উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল বলে এখানেও সে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়। সে ফিলিস্তিন ও ইযমির (Izmir)-সহ বহু ইসলামী অঞ্চল ও ইউরোপীয় ভূখণ্ড পরিদর্শন করে। ১০৭৬ হিজরী (১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে) সে ইযমিরে একটি সম্মেলনের ডাক দেয়। এ সম্মেলনে বিরাট সংখ্যক ইহুদী যোগদান করে।

এই সম্মেলনে সে দুনিয়াকে ৩৮ ভাগে বিভক্ত করে। উপস্থিত ইহুদীদের মধ্যে এই ভাগগুলো বন্টন করে দেয়। প্রতিশ্রুত মসীহ

হিসাবে সে ঘোষণা করে যে, অচিরেই এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলের সম্রাট বনে যাবে।

এরপর সাব্বাতাই জেভি থেকে আরও বড় ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়। উসমানী সাম্রাজ্য থেকে তার দাবিকৃত রাজ্য পাওয়ার জন্য সে তুরস্কে কয়েকটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে। উসমানীরা তাকে পাগল মনে করে ছাড় দিতে থাকেন। কিন্তু এক পর্যায়ে সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তখন তাকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগ মুহূর্তে সাব্বাতাই ঘোষণা করে যে, সে ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এভাবে সে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয় এবং তার মৃত্যুদণ্ড রহিত করে দেওয়া হয়।

সাব্বাতাই জেভি এরপর উপরে উপরে মুসলমান থাকে। সে তার সাথীদেরকে পরামর্শ দেয় ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামের গণ্ডিতে ঢুকতে, যাতে মুসলিম পরিচয়ে উসমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কর্তৃত্ব তারা দখল করে নিতে পারে।

এখানে তারা সেই কাজই করে, যা তারা ইউরোপে করেছিল। যখন ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফিলিপ তাদেরকে হয়তো খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ, নয়তো দেশত্যাগ– এই দুই থেকে কোনো একটি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। তখন তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ এবং ক্যাথলিক গীর্জায় ঢুকে পড়ে।

উসমানী সাম্রাজ্যেও তারা অভিন্ন কাণ্ড ঘটায়। অন্তরে ইহুদীবাদ চেপে রেখে বাইরে ইসলামের ঘোষণা দেয়। তারা ডোনুমাহ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে। ডোনুমাহ অর্থ আবর্তন। অর্থাৎ ইহুদী ধর্ম থেকে ইসলামে আগমন। ক্রমেই তারা সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন স্থানের নেতৃত্বে পৌঁছে যায়। এমনকি তারা 'ঐক্য ও প্রগতি সংঘ' (Committee of Union and Progress)-এও ঢুকে পড়ে, যার কিছু বিবরণ আমরা সামনে তুলে ধরব।

সম্প্রসারণ স্থগিত হওয়া এবং দুর্বলতার প্রারম্ভে এসব সমস্যা ও সংকট সত্ত্বেও উসমানী সাম্রাজ্য বেশ কিছু বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে। এ

সময়ে উসমানী বাহিনী সাইপ্রাস জয় করে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। রুশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে জর্জিয়া ফাতাহ করে। আরও ফাতাহ করে চেচনিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত দাগিস্তান এবং ভূমধ্য সাগরের ক্রিত দ্বীপ।

এরপর উসমানী সাম্রাজ্য প্রবেশ করে পতনের যুগে। ১১৭১ হিজরী থেকে ১৩২৭ হিজরী (১৭৫৭-১৯২৪খ্রি.) পর্যন্ত। অর্থাৎ উসমানী সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত সময়টা ছিল দুর্বলতার যুগ।

এখানে আমি এই যুগ সম্পর্কে কয়েকটি বিশ্লেষণ তুলে ধরতে চাচ্ছি। উসমানী সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ৬ শতাব্দী আয়ুষ্কালের শেষ ১৫৬ বছর ছিল প্রকৃত দুর্বলতার যুগ। এ সময় ছিল খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী। এ সময় ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়। এটাই ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের যুগ। উসমানী সাম্রাজ্য তখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ে। এটাই তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সময়ে পর্তুগাল ও স্পেনের দাপট কমে যায়। বাড়তে থাকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের আধিপত্য।

ইংল্যান্ড পরিণত হয় এক বিশাল সাম্রাজ্যে। দুনিয়ার যত্রতত্র সে যুদ্ধ চালাতে থাকে। হিন্দুস্তানসহ দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ড দখল করে নেয়। উসমানী সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোও দখলের ফন্দি আঁটতে থাকে। একই অবস্থা ছিল ফ্রান্সের। উপরন্তু জারবাদী অর্থোডক্স রাশিয়াও ছিল উত্থানের পথে।

উসমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার এ সময়ে প্রোটেস্ট্যানট মতবাদের অভ্যুদয় ঘটে। মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ১২০৩ হিজরী (১৭৮৯ খ্রি)-তে ইহুদীদের বড় মদদে এর আত্মপ্রকাশ হয়। তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান হিসাবে প্রকাশ করে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের গোড়াপত্তন করে। তারা বলত, এ প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট তথা তাওরাতের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। তারা নিউ টেস্টামেন্ট তথা ইঞ্জিলের তুলনায় তাওরাতকে অধিক প্রাধান্য দিতে থাকে। তারা বলত, নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেক বিকৃতি রয়েছে। এজন্য আমরা ওল্ড টেস্টামেন্টের উপর নির্ভর করব।

তারা একথাও উল্লেখ করে যে, প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের বিশেষ লক্ষ হচ্ছে ফিলিস্তিনের ইহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। যখন তাদের জন্য এ কাজ সম্পূর্ণ করা হবে তখনই দুনিয়াতে যিশু খ্রিস্টের আগমন ঘটবে। এই বানোয়াটি খ্রিস্টান ধর্মে আগে ছিল না। ইহুদীরাই প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে তা ঢুকিয়ে দেয়।

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের অনুসারীরা এসময় ক্যাথলিকদের হাতে নিপীড়নের শিকার হয়। তখন তারা ইংল্যান্ডে তাদের ঘাঁটি গাড়ে। সেখানে তারা আগের চেয়ে বেশি নিপীড়িত হয়, তখন তারা স্পেন কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন ভূখণ্ড তথা আমেরিকায় পাড়ি জমায়। এজন্য দেখা যায় সিংহভাগ আমেরিকান খ্রিস্টান ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের অনুসারী। যাদের সুস্পষ্ট স্বপ্ন হচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের জন্য ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমেরিকা কেন সবসময় ইহুদীদের পাশে দাঁড়ায়? ইংল্যান্ড কেন সবসময় ইহুদীদের পাশে দাঁড়ায়? এবং ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড এমন বড় ভূমিকা রেখেছিল কেন?

এসব সেই বিকৃতির কারণে, যা ইহুদীরা খ্রিস্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ইউরোপে বহু দমন-নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর ইহুদীবাদ গোপন করে খ্রিস্টান ধর্মে প্রবেশ করার পর।

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার সমকালে ১২০৩ হিজরীতে (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে) ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইউরোপে বহু সংখ্যক প্রতিবাদীর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফরাসি বিপ্লব। কিন্তু একই সময়ে ঘটে আধুনিক ইউরোপের আত্মপ্রকাশ; নাস্তিক্যবাদের আত্মপ্রকাশ; রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথককরণ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার আত্মপ্রকাশ। ফরাসিরা জাতীয়তাবাদের চেতনা শুধু ইউরোপে নয়; বরং সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে অনেক বড় ভূমিকা ছিল এই জাতীয়তাবাদী চেতনার।

ফরাসি বিপ্লবের পর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে ফ্রান্সের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আবির্ভাব ঘটে ফ্রান্সের অন্যতম প্রসিদ্ধ, বরং সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সম্রাটের। সে হল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আধিপত্য বিস্তার ও বৃহত্তর ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে থাকে। এজন্য যেসব জায়গার কথা তার মাথায় আসে, সেগুলোর মধ্যে উসমানী সাম্রাজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। সুতরাং সে তার বাহিনী প্রস্তুত করে এবং তার নাকবরাবর অবস্থিত উসমানী ভূখণ্ড মিসর আক্রমণ করে। মিসর তখন ফিলিস্তিনের মত একটি উসমানী রাজ্য। নেপোলিয়ন এত সহজে মিসর জয় করে যে, সে নিজেই বিস্মিত হয়ে যায়। তিন বছর মিসর অবস্থান করে সে। কিন্তু তার লোভ-লালসা ছিল গগণচুম্বি। এজন্য মিসর থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হয়। আক্কা অবরোধ করে। আক্কা দূর্গের শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখে সে হতভম্ব হয়ে যায়। ৩ মাস অবরোধের পরও তা জয় করতে ব্যর্থ হয়। বরং এ সময়ে সে দুই হাজারেরও অধিক ফরাসি যোদ্ধা হারায়।

তবে এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আক্কার প্রাচীর অবরোধকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সারা বিশ্বের ইহুদীদের আহ্বান করে যে, তারা যেন এখানে এসে তাদের জাতিগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। যেহেতু ফরাসি বিপ্লব প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের রূপকার ছিল, যার অনুসারীরা ছিল ক্যাথলিক ইউরোপের নিপীড়নের শিকার, এজন্য ইংল্যান্ড ও রাশিয়া বিচলিত হয়ে পড়ে। এমনকি উসমানী সাম্রাজ্যও। ইংল্যান্ড ও রাশিয়া বিচলিত হওয়ার কারণ হল তারা বিশ্বের নেতৃত্ব দখলে ফ্রান্সের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। কাজেই ফরাসিদের বিরুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্যকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয় ইংল্যান্ড ও রাশিয়া। এই প্রস্তাব কার্যকরও হয়। উসমানী ইংলো-রুশ বাহিনী বের হয় এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে বের করে দিতে সক্ষম হয়। নেপোলিয়ন তিন হাজার উসমানীকে বন্দী করেছিল। ফ্রান্স ফিরে যাওয়ার আগে সে ওই বন্দীদের সবাইকে হত্যা করে। এই সেই ফ্রান্স, যারা বলে বেড়ায় যে, তৎকালীন সময়ে তারাই আলো ও ন্যায়বিচার নিয়ে বিশ্বের দুয়ারে হাজির হয়েছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের ভালোবেসে কিংবা উসমানী সাম্রাজ্যের বন্ধু হিসাবে ইংল্যান্ড ও রুশ ফরাসিদের আগ্রাসন থেকে মিসর ও ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে সাহায্য করেনি। বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থ। এজন্য মিসর ও ফিলিস্তিন থেকে ফরাসিদের বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইংল্যান্ড ইসলামী বিশ্ব দখল করার পাঁয়তারায় লিপ্ত হয়। সুতরাং ইংল্যান্ডের দখল থেকে মিসর উদ্ধারে উসমানী সাম্রাজ্য একদল সেনাবাহিনী পাঠায়। তবে আফসোসের বিষয়, মিসর পুনরুদ্ধারের জন্য উসমানী সাম্রাজ্য যে লোককে সেনাপতি করে পাঠায়, তিনিই উসমানী সাম্রাজ্যের জন্য গলার সবচেয়ে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়ান। তিনি হলেন মুহাম্মাদ আলী পাশা।

মুহাম্মাদ আলী ছিলেন উসমানী সাম্রাজ্যের একজন চাকর। ব্রিটিশের হাত থেকে মিসর পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে উসমানী বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠানো হয়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসর পৌঁছেন। সেখানে উসমানী সাম্রাজ্যের নিরাপত্তায় বসবাসকারী অবশিষ্ট মামলুকদের তিনি হত্যা করেন এবং বহু আলেমকে হত্যা করার পর মিসরের নিয়ন্ত্রণ দখল করেন। এমনকি মিসর নিয়ে তিনি উসমানী সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যান এবং স্পষ্ট দিবালোকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের চাটুকারিতা শুরু করেন।

মুহাম্মাদ আলী ছিলেন একজন স্বার্থপূজারী মানুষ। নিজের কল্যাণ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতি ছাড়া অন্য কিছুই তার চিন্তায় ছিল না। জাতিতে তিনি ছিলেন আলবেনিয়ান। পরবর্তীতে উসমানী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল নিজের ও পরিবারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। তার কর্মকাণ্ড দেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স খুব খুশি হয় এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা শুরু করে। এজন্য তারা বলে থাকে, মুহাম্মাদ আলী আধুনিক মিসরের প্রতিষ্ঠাতা। আর যে মিসরের প্রতিষ্ঠাতা তার সমগ্র মনোযোগ ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের স্বার্থের দিকে।

মুহাম্মাদ আলীর অন্তরে ছিল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নেশা। ইংল্যান্ড তাকে সাহায্য করে এবং একদল সেনা পাঠায়। তিনি বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা দেন এবং তার নিয়ন্ত্র দখল করেন। এতে ফিলিস্তিন উসমানী খেলাফতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে—

উসমানী সাম্রাজ্য বিচূর্ণকারী– মুহাম্মাদ আলীর আধিপত্যে চলে আসে। আমাদের মনে রাখতে হবে, পরবর্তীতে খুদাইভি ইসমাঈলসহ মুহাম্মাদ আলীর সন্তানদের শাসনামলে যেসব অপকর্ম সংঘটিত হবে, সেগুলোর সাথে উসমানী খেলাফতের কোনো সম্পর্ক নেই। বাহ্যত তিনি উসমানী খেলাফতের অনুগত ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি উসমানী খেলাফত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

অপর দিকে রুশ সাম্রাজ্য মুহাম্মাদ আলীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উসমানী খেলাফতকে সমর্থন দেয়। মুহাম্মাদ আলী পাশা প্রকাশ্যে উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এমনকি সিরিয়া ও আনাতোলিয়ার একাধিক লড়াইয়ে তিনি জয়লাভ করেন। এমনকি তার জন্য ইস্তাম্বুল দখলের পথও উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি তার সাহায্যকারীদেরকে বিচলিত করে তোলে। অর্থাৎ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে। কারণ, তারা তাকে শক্তশালী করার জন্য সাহায্য করেনি; বরং সাহায্য করেছিল উসমানী খেলাফত ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু মুহাম্মাদ আলী যখন নিজেই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করা শুরু করেন, তখন তারা আবার মুহাম্মাদ আলীর বিরুদ্ধে উসমানী খেলাফতকে সাহায্য করতে আরম্ভ করে।

আফসোস! তখন সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবন এবং ক্রুসেড লালসার বিপরীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মুসলমানরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!! মুসলমানরা কখনও ব্রিটিশকে সহায়তা করত; কখনও ফরাসিদেরকে। আর নিজেদের পরস্পরে যুদ্ধে লেগে থাকত।

১২৪৮ হিজরীতে (১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে) তারা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির নাম 'কুতাহিয়্যাহ চুক্তি'। চুক্তিতে তারা একমত হয় যে, মুহাম্মাদ আলী পাশা ইস্তাম্বুল দখল থেকে ফিরে আসবেন। চুক্তিতে আরও মেনে নেওয়া হয় যে, উসমানী খেলাফতের সাথে সম্পর্ক না রেখে মুহাম্মাদ আলী আমৃত্যু মিসর শাসন করবেন। শামের শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার মতামত গ্রহণ করা হবে। মুহাম্মাদ আলী যখন দেখেন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তার বিপরীতে উসমানী সাম্রাজ্যের পক্ষপাতিত্ব করছে, তখন স্বপ্ন পূরণের আশা না থাকলেও তিনি এ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হন এবং মনের অসন্তুষ্টি নিয়েই মিসরে ফিরে যান।

কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর তিনি তার স্বার্থের সন্ধানে উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সাথে নতুন করে আঁতাত করেন। যাতে মিসরের শাসনভার শুধু তার জীবদ্দশায়ই নয়, বরং তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের জন্যও ব্রিটিশরা বরাদ্দ করে। তার জীবদ্দশায় শামও যেন তার শাসনাধীনে দেওয়া হয়। ইংল্যান্ড তার সাথে একমত হয়ে উসমানী সাম্রাজ্যের উপর চাপ প্রয়োগ করে। মুহাম্মাদ আলী আমৃত্যু শামের ক্ষমতা দখল করে। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিদের জন্য মিসরের ক্ষমতা বরাদ্দ করে। এভাবে মিসর ও ফিলিস্তিন মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসনাধীনে চলে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসনামলে ফিলিস্তিনীরা দুঃখ, কষ্ট ও জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা কয়েকবার প্রতিবাদও করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল 'আল-কুদস প্রতিবাদ'। ফিলিস্তিনের উপর বিরাট অংকের কর চাপিয়ে দেওয়া হলে ১২৫০ হিজরীতে (১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে) ১০ হাজার ফিলিস্তিনী এ প্রতিবাদ জানায়। মুহাম্মাদ আলী তার ছেলে ইব্রাহীম পাশাকে দিয়ে শক্তহাতে এই বিপ্লব দমন করেন।

মুহাম্মাদ আলী ফিলিস্তিনের শাসনভার গ্রহণের পর ইংল্যান্ড তার কাছে সর্বপ্রথম যে দাবি উত্থাপন করে, তা হল আল-কুদসে তাদের একজন কনসাল নিয়োগ দিতে হবে। মুহাম্মাদ আলী তা মেনে নেন। এরপর ব্রিটিশ হুকুমত আল-কুদসে একজন কনসাল পাঠায়। এই কনসালের কাছে প্রথম যে বার্তা পাঠানো হয়, তা হল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইহুদীদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ফিলিস্তিনের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এই কনসালের বিরাট ভূমিকা থাকবে।

আসুন, দেখে নিই, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও উসমানী সাম্রাজ্যের প্রত্যেকের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়?

মিসর ও ফিলিস্তিনে মুহাম্মাদ আলী ও তার সন্তানদের কর্মকাণ্ডের কী প্রতিফল ঘটে?

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের শাসনামলে ফিলিস্তিন

ইংল্যান্ড আল-কুদস শহরে নিজস্ব কনসাল নিয়োগের পর ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে হিজরত করতে সাহায্য করতে থাকে। তাদের প্রকল্প একটু একটু করে সফলতার দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু তখনই ইসলামী বিশ্বে এক মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যিনি ব্রিটিশ ও ইহুদীদের বহু পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। এতে ইহুদীদের বহু পরিকল্পনা ও নীল নকশা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ মহান ব্যক্তি হলেন উসমানী সাম্রাজ্যের খলিফা আব্দুল হামীদ দ্বিতীয়। এই ব্যক্তি ছিলেন উসমানী সাম্রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা। তাঁর আবির্ভাব যদি দুর্বলতা ও পতনের যুগে না হত, তা হলে উসমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ অবস্থান থাকত। কিন্তু আফসোস! তিনি এমন সময়ে এসেছিলেন, যখন বামনরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবুও তিনি সাধ্যের সবটুকু দিয়ে কাজ করে যান।

১২৯৩ হিজরী থেকে ১৩২৯ হিজরী (১৮৭৪-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত মোট ৩৫ বছর দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ উসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন। তিনি বিক্ষিপ্ত উসমানী সাম্রাজ্যকে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ, রুশ ও ফরাসি স্বার্থ প্রতিহত করতে থাকেন। বড় বড় কিছু সংস্কারমূলক কাজও করেন।

দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার। ইংল্যান্ডের সহায়তায় তখন

ইহুদীরা ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলে মাত্র ছোট একটি জনপদ গড়ে তুলেছিল। এ জনপদটি ছিল নিতান্তই ছোট। আল-কুদসে সাধারণভাবে তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন রুশ সাম্রাজ্যে ইহুদীদের উপর দমন-নিপীড়ন চলছিল। তৎকালীন রাশিয়াতে ছিল বিরাট সংখ্যক ইহুদীর বসবাস। প্রায় এক মিলিয়ন। সেখানে তখন এন্টি সেমিটিজম বা ইহুদী বিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়।

তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স রাশিয়া থেকে হিজরত করে আসা ইহুদীদেরকে গ্রহণ করার জন্য উসমানী সাম্রাজ্যকে চাপ প্রয়োগ করে। উসমানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তার-ই পরিণাম হিসাবে দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ উসমানী সাম্রাজ্যের ভিতরে ইহুদীদের উপস্থিতি মেনে নেন। তবে এই শর্তে যে, তারা ফিলিস্তিনে বসবাস করতে পারবে না। কেননা, তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, ফিলিস্তিনের জন্যই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদীরা আসছে।

এ পর্যায়ে প্রথম বারের মত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এবং পুরো আমেরিকা সেই প্রোটেস্ট্যান্ট মতাদর্শের অনুসারী, যাদের অন্যতম বিশ্বাস হচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের জন্য ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত যখন উসমানী সাম্রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ শুরু করে, তখন সুলতান আব্দুল হামীদ একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন, যতদিন উসমানী খেলাফত আছে, ততদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কোনো ঠাঁই হবে না।

১২৯৯ হিজরীতে (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে) ইসলামী বিশ্বে ঘটে যায় এক দুঃখজনক ঘটনা। ইংল্যান্ড মিসর দখল করে। এ দখলের ফলে ফিলিস্তিন থেকে মিসর পৃথক হয়ে যায়। এই আগ্রাসন ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা। এভাবে ফিলিস্তিন

দক্ষিণ থেকে ব্রিটিশ বেষ্টিত হয়ে পড়ে, যাদের মতলব ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পা শক্তিশালী করা।

সুলতান আব্দুল হামীদের আগে আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তবে তা বেড়ে ওঠে তাঁর আমলে। তা হল জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার। একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা 'তুর্কী যুব সংঘ' (Young Turks) নামে পরিচিত। এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিসে; কিন্তু দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এর শাখা সৃষ্টি হয়। এসব শাখার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল গ্রিসের থেসালোনিকি শহরের শাখা। থেসালোনিকি সেই শহর, যাতে ছিল বিরাট সংখ্যক ইহুদীর বসবাস। সেই সাথে বার্লিন শাখা এবং উসমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল শাখাও ছিল অনেক প্রসিদ্ধ।

তুর্কী যুব সংঘ ফরাসি বিপ্লবকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। ফরাসি বিপ্লবের আহ্বান ছিল জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ ফরাসিরা ফরাসি জাতি। ব্রিটিশরা ব্রিটিশ জাতি। জাত, কুল, শিরা ও বংশমূল হিসাবে তারা দুনিয়ার দেশগুলোকে বিভক্ত করত। তুর্কী যুব সংঘও ইসলামী বিশ্বকে জাত, কুল ও বংশভেদে বিভক্ত করে ফেলার আহ্বান জানায়। তারা তুর্কী জাতিসত্তার মর্যাদাকে আরব জাতিসত্তার মর্যাদার উপর প্রাধান্যও দিতে থাকে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে এ সংঘ বিরাট আকৃতি ধারণ করে। তারা তুর্কী যুব সংঘের একটি সামরিক বাহিনীও গড়ে তোলে। সামরিক ইউনিটের নাম দেওয়া হয় ঐক্য ও প্রগতি ফ্রন্ট। এ সংঘের অধিকাংশ সভ্য জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা লালন করত। তাদের অধিকাংশ ছিল ধর্মহীন। যারা ধর্ম স্বীকার করত না।

এরা ফরাসি বিপ্লবের মত-পথ সমর্থন করত। তা হল রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পুরোপুরি পৃথককরণ। এই সংঘ উসমানী সেনাবাহিনীর বিরাট সংখ্যাকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে ফেলে, যাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঝোঁক ছিল এবং তারা ইসলামের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল না। ডোনুমাহ ইহুদীদের পক্ষ থেকে এই সংঘ অনেক সমর্থন লাভ করে। এসব ইহুদী, যারা বাহ্যত ইসলামের দাবিদার ছিল, তুর্কী যুব সংঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে।

আরব বিশ্বসহ পুরো ইসলামী দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আরব বিশ্বেও বিভিন্ন সংঘ গড়ে ওঠে, যেগুলো তুর্কী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আরব জাতীয়তাবাদের দাওয়াত দিতে থাকে। এটা ছিল উসমানী সাম্রাজ্যের দূর্দশার সূচনা।

এ বিষয়টি কোনো স্বপ্ন বা ভ্রম ছিল না; বরং এসব ছিল সেই হিসাব-নিকাশ, যা সেই সময়ে উপলব্ধ সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে কষা হয়েছিল। এগুলো কিছু প্রচেষ্টার সমষ্টি, যার পেছনে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। কিছু নীল নকশা, যা পরকল্পিত হয় উসমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সমকালে এবং সাধারণ ইসলামী জনগোষ্ঠী– এমনকি তৎকালীন বেশিরভাগ আলেমের কাছে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা না থাকার সুযোগে। উক্ত পরিকল্পনা এমন সংকট সৃষ্টি করে, যার ভোগান্তি এখন আমরা পোহাচ্ছি।

সেই সাথে হার্জল নামক এক ইহুদী এই নতুন অবকাঠামোর আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে। তৎকালীন শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারস্থ হয় সে। জার্মানির কাছে যায়। সেখানে তেমন একটা সুবিধা পায় না। এরপর সে রাশিয়ার কাছে যায়। রুশ অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তার সহায়তা কামনা করে। রুশ অর্থমন্ত্রী পাল্টা জিজ্ঞাসা করে, আমি কেন তোমাদের সাহায্য করব?

হার্জল তাকে বলে, কারণ আপনারা ইহুদীদের দমন করছেন। আপনারা ইহুদী বিদ্বেষের সমস্যায় ভুগছেন। এভাবে আমরা আপনাদেরকে সমস্ত ইহুদী থেকে পরিত্রাণ দিব।

তখন রুশ অর্থমন্ত্রী তাকে বলে, ফিলিস্তিনে পাঠানোর মাধ্যমে আমরা ইহুদীদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেয়ে তাদেরকে কৃষ্ণ সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়াকে প্রাধান্য দিব।

এরপরও হার্জল নিরাশ হয় না। সে ইংল্যান্ডের কাছে যায়। ব্রিটিশের সাথে তার দীর্ঘ আলাপ হয়। সে কাঙ্ক্ষিত বস্তু ইংল্যান্ডে পেয়ে যায়। ইংল্যান্ড শুরু থেকেই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল।

সেই সাথে এখন ইসলামী ভূখণ্ডে ইহুদী সমাজের মধ্যে স্থানীয় শক্তিশালী মিত্রও পেয়ে যায়।

ফরাসিরা ম্যারোনাইট খ্রিস্টানদের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। রাশিয়া ছিল অর্থোডক্সদের মিত্র। ইংল্যান্ড যদিও দ্রুজ খ্রিস্টানদের সাথে মৈত্রি বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত শক্তি দ্রুজদের ছিল না। তাই তারা মুসলিম বিশ্বে আঞ্চলিক মিত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ছিল। আর তারা হচ্ছে ইহুদী। সেই সাথে ইহুদী ধন-ভাণ্ডারও ইংল্যান্ডকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এজন্য ইংল্যান্ড যখন সুয়েজ খালের শেয়ার ক্রয় করতে চেষ্টা করছিল, তখন তাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ফলে ইংল্যান্ড সরকার ইংল্যান্ডে অবস্থিত ইহুদী ব্যাংক 'রথচাইল্ড' থেকে লোন নেয়।

এর সাথে ফিলিস্তিনের বিপজ্জনক কৌশলগত অবস্থানের বিষয়টা যোগ করুন। ওটা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ হিন্দুস্তান গমনের পথ। এটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরক্ষা পদক্ষেপ। উসমানী খেলাফত পূণগর্ঠনের বিরুদ্ধে এটা হবে মরণফাঁদ।

হার্জল এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। সে ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রেও উপস্থিত হয়। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের কাছে যায়। বহু প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। হার্জলের সাথে সাক্ষাৎকালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ ছিলেন সবদিক দিয়ে পর্যুদস্ত। উসমানী বাহিনী তখন তছনছ। যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ উসমানী কোষাগার তখন খা-খা শূন্য।

হার্জল সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদকে সুলতানের ব্যক্তিগত পকেটের জন্য ১৫০ মিলিয়ন স্বর্ণ লিরার প্রস্তাব দেয়। আরও প্রস্তাব দেয়, উসমানী সাম্রাজ্যের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার এবং ১২০ মিলিয়ন ফ্রাংক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে উসমানী সাম্রাজ্যের নৌবহর প্রস্তুত করে দেওয়ার। উপরন্তু সে আরও দিতে চায় উসমানী কোষাগার গতিশীল করা, আল-কুদসে উসমানী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিমের আর্মেনিয়া সংকট নিরসনের জন্য সুদবিহীন ঋণ ৩৫ মিলিয়ন লিরা।

হার্জল সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদকে এসব প্রস্তাব দেয় আল-কুদসের বাইরে একটি জনপদ প্রদান এবং ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইহুদীদের হিজরতের অনুমতি প্রদানের মোকাবেলায়।

এসব প্রলোভন ও প্ররোচনা সত্ত্বেও সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ দ্ব্যর্থহীনভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জওয়াবে বলেন মনোমুগ্ধকর কয়েকটি কথা। তিনি বলেন, হার্জল যেন এ বিষয়ে আর এক কদমও সামনে না বাড়ে। আমি দেশের এক ইঞ্চি মাটিও বিক্রি করতে পারব না। কারণ, তা আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়; বরং জাতির সম্পদ। এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতির রক্তের বিনিময়ে। আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে তা সিঞ্চিত করব। তবুও তা ছিন্ন-ভিন্ন হতে দিব না।

অতঃপর তিনি বলেন, হয়তো কোনো দিন এমন আসবে, যখন হার্জল কোনো প্রকার মূল্য ছাড়াই এ ভূখণ্ড নিয়ে নিবে। কিন্তু এ ভূখণ্ডে আমাদের দেহ ঝাঁঝরা হওয়ার আগে সে কিছুতেই তা নিতে পারবে না।

একথাগুলো তিনি বলেছিলেন হৃদয়ের গভীর থেকে। হার্জল এই আলোচনার পর বেরিয়ে যায়। কিন্তু তার মাথায় তখন স্পষ্ট পরিকল্পনা। সে বলে ওঠে, সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের একটা বিহিত করার আগে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়।

আসুন জেনে নিই, হার্জল ও ইহুদীরা মহামতি সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদকে সরিয়ে দিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে; যিনি ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসতি স্থাপনের যাবতীয় প্রতিরোধ করেছিলেন?

উসমানী ভূখণ্ডে বেড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য ও প্রগতি সংঘ-এর কী প্রভাব ছিল?

ফিলিস্তিনের ইসলামী আন্দোলনে এসবের কী প্রভাব পড়েছিল?

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের পরবর্তী যুগে ফিলিস্তিন

থিওডর হার্জল এসব সাক্ষাৎকার থেকে দুটি লক্ষ নিয়ে বের হয়– (ক) উসমানী খেলাফতের পতন ঘটানো। সে বলে, উসমানী খেলাফতের পতন না ঘটিয়ে কিছুতেই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। (খ) অপর কাজ হচ্ছে জারবাদী অর্থোডক্স রুশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো। কেননা, রাশিয়া থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিন হিজরতের পথে এ জারবাদী সাম্রাজ্য মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হার্জল ঐক্য ও প্রগতি সংঘ-এ ঢুকে পড়া ডোনুমাহ ইহুদীদেরকে এবং তুর্কী যুব সংঘকে জাতীয়তাবাদ ইস্যু ফোকাস করতে উৎসাহ দেওয়া শুরু করে। তারা আরব বিশ্বের অভ্যন্তরেও কিছু জাতীয়তাবাদী প্রতীক তুলে ধরা শুরু করে। বিশেষত কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠা শুরু করে, যেগুলো আরব জাতীয়তাবাদের দিকে ডাক দেয়। তাদের অগ্রভাগে ছিল ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্রিস্টান সম্প্রদায়। বিশেষ করে মিসর ও লেবাননে। তুর্কী জাতীয়তাবাদী প্রবণতার বিপরীতে আরব জাতীয়তাবাদের প্রবণতা সূচিত হয়। এতে ইসলামী বিশ্বে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়।

একই সময়ে তারা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে তারা ইহুদীদের চিরন্তন স্বভাব অনুযায়ী তাকে অতর্কিত হামলা করার চেষ্টা করে। যাতে সহজে বিষয়টির সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পতনের পথে অগ্রসর হয়।

সর্বত্র সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের ভাবমূর্তি বিকৃত করতে শুরু করে তারা। ইসলামের উন্নত প্রাণের অনুপস্থিতি, ধর্মনিরপেক্ষতার সয়লাব এবং ইসলামী শরীয়াহ থেকে মানুষের দূরত্বের সুযোগে তারা তুর্কী জনগোষ্ঠীকে প্রতারিত করে। বরং আফসোসের বিষয়, পুরো মুসলিম বিশ্বকে প্রতারিত করে। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলসহ আরও কয়েকটি তুর্কী শহরে কিছু আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদকে সরানো এবং ঐক্য ও প্রগতি সংঘ কর্তৃক তুরস্কের শাসনভার গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে। তখন পঞ্চম মুহাম্মাদ বা মুহাম্মাদ রশাদকে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের বিকল্পহিসাবে বসানো হয়। বাস্তবে তার কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। বরং তিনি ছিলেন খেলাফতের পতন সহজ করার ঢালমাত্র।

ঐক্য ও প্রগতি সংঘের বেশিরভাগ সদস্য ছিল ডোনুমাহ ইহুদী। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদকে সরানোর পর তারা প্রথম মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠা করে। এই সভা ছিল ১৩ জন মন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত। একজন আরব। নয়জন তুর্কী। আর বাকি তিনজন ইহুদী। মন্ত্রীসভায় ইহুদীদের উপস্থিতির কারণে তুরস্কের অভ্যন্তরে কিছু বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। তবে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ বল প্রয়োগ করে এসব বিক্ষোভ দমন করে এবং তুরস্ক ও তুরস্কের বাইরে মুসলমানদের প্রতিরোধ শুরু হয়। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ তখন প্রসিদ্ধ সেই উক্তি করেন, আমাকে অপসারণের কারণ হচ্ছে আমি ইহুদীদের ঠেকিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে অটল, আর ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অটল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ মন্ত্রী তুরস্কের অবস্থার উপর মন্তব্য করে বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এক পত্রে জানান, অভ্যন্তরীণ গঠনে, এ সংঘ (ঐক্য ও প্রগতি সংঘ) প্রধানত ইহুদী তুর্কী জোট মনে হয়।

এর মানে, পুরো বিশ্ব তখন জানত যে, সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ ﷺ-কে অপসারণের পিছনে ইহুদীরা তুর্কীদের সহযোগী।

ঐক্য ও প্রগতি সংঘের প্রথম দিকের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল সংবিধান থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিন হিজরতের নিষেধাজ্ঞার ধারা অকার্যকর করা। এর মাধ্যমে তারা বিরাট সংখ্যক ইহুদীকে [ফিলিস্তিন যাওয়ার] সুযোগ করে দেয়। এমনকি তারা তাদেরকে ফিলিস্তিনে জমি কেনারও সুযোগ করে দেয়। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ কর্তৃক ফিলিস্তিনে নিয়োগকৃত সব উসমানী আমীর ও শাসককে বরখাস্ত করে তারা। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ তাদেরকেই ফিলিস্তিনে নিয়োগ করেছিলেন, যাদের এ ভূখণ্ডের প্রতি ধর্মীয় অনুরাগ ছিল। ঐক্য ও প্রগতি সংঘ তাদেরকে অপসারণ করে তাদের জায়গায় ধর্মনিরপেক্ষদের নিয়োগ দেয়। এসব সঙ্ঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। ইংল্যান্ডের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ উসমানী সাম্রাজ্যকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠেলে দেয়। উসমানী সাম্রাজ্যের শক্তি সমূলে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য। এই সাম্রাজ্যকে তারা জার্মানির পক্ষে ফেলে দেয়। আর নিজেরা অবস্থান নেয় অপর পক্ষে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। এরপর আমেরিকাও তাদের সাথে যুক্ত হয়। এরপর ইতালিও তাদের সাথে এই শর্তে যোগ দেয় যে, বিনিময়ে তাকে লিবিয়া প্রদান করতে হবে। বাস্তবেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ইতালিকে লিবিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা উসমানী বাহিনীর মড়ক শুরু হয়। এজন্য তারা পরাজিত হতে থাকে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সহায়তায় সার্বিয়া ও গ্রিসে উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব কায়েম হয়। ফলে উসমানী সামরিক শক্তি একেবারে দুমড়ে যায়।

এ সময়েও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ১ লাখ তুর্কী সৈন্য বিদ্যমান ছিল। এ হচ্ছে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের প্রতি উসমানী সাম্রাজ্যের যত্নশীলতার প্রমাণ। তবে এসব সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ইসলামী ইতিহাসের সাথে বিদ্রূপকারী একব্যক্তির হাতে। তিনি মুস্তফা কামাল। পরবর্তীতে যিনি মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আরব বিশ্বের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ আরও একজন ব্যক্তির অনুসন্ধান চালাতে থাকে, যাতে তাকে আরব ও তুর্কীদের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। শেষে তারা শরীফ হুসাইনকে নির্বাচন করে, যিনি তখন মক্কার আমীর ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মিসরে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার ম্যাকমোহন ও শরীফ হুসাইনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা একমত হন যে, শরীফ হুসাইন পিছন থেকে উসমানী সাম্রাজ্যের পিঠে আঘাত হানবেন এবং উসামানীদের অধীনে থাকা আকাবা বন্দর দখল করে নিবেন। যাতে ব্রিটিশ বাহিনীর ফিলিস্তিন প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এসবের বিনিময়ে শরীফ হুসাইনকে একটি সাম্রাজ্য দেওয়া হবে, যার নাম হবে আরব সাম্রাজ্য। যখন এ সাম্রাজ্যের সীমারেখা সম্পর্কে হাইকমিশনারকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বলে, সমস্যা নেই; অচিরেই জানা যাবে। এরপর তারা জানায়, আপনাকে জর্ডান ও সিরিয়া দেওয়া হবে। তবে ইস্কান্দারুন দেওয়া যাবে না। কারণ, যুদ্ধ পরবর্তী নব্য তুরস্ককে তা হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হবে! এমনইভাবে লেবাননও দেওয়া যাবে না। কারণ, ফ্রান্স সেটা গ্রহণ করবে। আপনি জাযিরাতুল আরব পাবেন, তবে আশপাশ ছাড়া। অর্থাৎ ইয়ামান, আরব উপসাগর ও দক্ষিণ ইরাক বাদে। এসব কিছু এজন্য, যাতে আরব সাম্রাজ্য সবদিক থেকে ব্রিটিশ বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

শরীফ হুসাইন ছিলেন শুধু মক্কার আমীর। সে হিসাবে এসব প্রস্তাব ছিল তার জন্য সীমাহীন প্রলুব্ধকর। তবে পরবর্তীতে যাতে একথা বলা না হয় যে, শরীফ হুসাইন উসমানী সাম্রাজ্যের পিঠে আঘাত হেনেছিলেন, সেজন্য এবং আরব জনগোষ্ঠীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা সুন্দর একটি শিরোনাম দেয়। তারা বলে, শরীফ হুসাইন বৃহত্তম আরব বিপ্লব কায়েম করতে যাচ্ছেন। এই বিপ্লবের সময়কাল হবে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ। ইসলামী বিশ্বের উপর তুর্কী আগ্রাসনের বিপক্ষে এই বিপ্লব। ইসলামী খেলাফতের বিষয়টি তারা একেবারে বিলুপ্ত করে দেয়। ১লা জুলাই ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ (৩০ রজব ১৩৩৪ হিজরী) শরীফ হুসাইন বৃহত্তম আরব বিপ্লব কায়েম করেন। তার ছেলে ফয়সালের নেতৃত্বে তার বাহিনী অগ্রসর হয়। তাদের সাথে ছিল আরব লরেন্স। লরেন্স ছিল মূলত একজন ব্রিটিশ ইহুদী সামরিক অফিসার।

আরব বাহিনী আকাবার যুদ্ধ এবং অতর্কিতভাবে তুর্কীদের উপর হামলা শুরু করে। আকাবা বন্দরের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিনাই হয়ে দ্রুত ফিলিস্তিন প্রবেশের পথ ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য অবমুক্ত হয়ে যায়।

এই আরব বিপ্লব চলাকালে আরও একটি ঘটনা ঘটে। পত্রিকার পাতায় 'সাইকস-পিকট সন্ধিচুক্তি' প্রকাশ হয়ে পড়ে। সাইকস ছিল নিকট প্রাচ্য (Near East)-এ নিয়োজিত ব্রিটিশ হাইকমিশনার। আর জর্জ পিকট ছিল ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আগে সে বৈরুতে ফ্রান্সের কনসাল ছিল। রাশিয়ার লুক্সেমবার্গে তারা একটি চুক্তিতে সাক্ষর করে। এ চুক্তিতে তারা এমন সিদ্ধান্ত নেয়, যা ছিল শরীফ হুসাইনের সাথে কৃত তাদের চুক্তির ব্যতিক্রম। এ চুক্তিতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উসমানী সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে একমত হয়। ইরাক ও জর্ডান নিবে ইংল্যান্ড। সিরিয়া ও লেবাবন নিবে ফ্রান্স। রাশিয়ার পরামর্শে ফিলিস্তিন থাকে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের অধীন। এই চুক্তি সঙ্ঘটিত হয়েছিল গোপনে। তবে রাশিয়া তা পত্রিকায় প্রকাশ করে দেয়। ফলে এই সংবাদ পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামী বিশ্বের পত্রিকাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। শরীফ হুসাইন তা পাঠ করেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি এতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কেননা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে দেশগুলো বণ্টন করা হয়েছে, সেগুলোই তাকে দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল। তিনি ইংল্যান্ডের কাছে অভিযোগ নিয়ে যান। তবে তারা বলে, এটা তো পত্রিকার কথা। এর কোন ভিত্তি নেই। উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিপ্লব কায়েম করার পর তার সামনে ইংল্যান্ডের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

এরপর আসে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। এ বছর মুসলমানদের উপর নেমে আসে অনেকগুলো বিপর্যয়।

প্রথম বিপর্যয় : ২৫ অক্টোবর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। যে পরিষদের নেতৃত্বে এই বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়, তা ছিল সাত সদস্যের একটি পরিষদ। তাদের প্রধান ছিল সমাজতান্ত্রিক লেনিন। তাদের আদর্শ ছিল ইহুদী কার্ল মার্কসের থিওরি। এই পরিষদে ছিল

চারজন ইহুদী। পঞ্চম সদস্য ছিল স্টালিন, তার স্ত্রী ছিল ইহুদী। ষষ্ঠ সদস্য ছিল একজন রাশিয়ান খ্রিস্টান। তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম মন্ত্রীসভার ২২ সদস্যের ১৭ জন ছিল ইহুদী। ধরা যায়, এটা ছিল একটা ইহুদী সরকার, যা রাশিয়া শাসন করছিল। থিওডর হার্জলের এটাই লক্ষ্য ছিল, যে এর আগেই ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মারা গিয়েছিল। লোকটি তার পরিকল্পনার ফলাফল না দেখেই মারা যায়। সত্যি সত্যি রাশিয়ার জারবাদী অর্থোডক্স সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সর্বশক্তি দিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জমায়েত করতে সংকল্পবদ্ধ ছিল। এজন্য রাশিয়া থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিন গমনের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিপর্যয় : এর এক সপ্তাহ পর ২ নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলফোর ব্রিটিশ ইহুদী লর্ড রথচাইল্ড-এর কাছে একটি চিঠি পাঠায়। সে ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী। সেই চিঠিতে বেলফোর বলে, সম্রাট (বৃটেনের সম্রাট)-এর সরকার অধীর আগ্রহে ফিলিস্তিনে ইহুদী সম্প্রদায়ের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রিটেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের কোনো আইনী বৈধতা ছিল না। এ ছিল বেলফোরের পক্ষ্য থেকে একটি ওয়াদামাত্র। চিন্তা করে দেখুন, ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশের আগেই এ ওয়াদা করা হয়েছিল। যিনি বলেছেন সত্যই বলেছেন, যে মালিক নয় সে দিয়েছে তাকে, যে হকদার নয়।

তৃতীয় বিপর্যয় : ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক তুর্কী ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তিনি হলেন, ফিলিস্তিনে তুর্কী বাহিনীর সেনাপতি মুস্তফা কামাল। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির ধর্মনিরপেক্ষ, পরিপূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষী এবং ঐক্য ও প্রগতি সংঘের একজন। ব্রিটিশরা তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা যেকোনো মূল্যে তার জন্য তুরস্কের সিংহাসনে বসার পথ পরিষ্কার করে দিবে। বিনিময়ে তাকে পুরো বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য পুরো ময়দান খালি করে দিতে হবে। এক

লক্ষ তুর্কী সৈন্যের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে মুস্তফা কামাল (আতাতুর্ক) চলে যেতে একমত হন। বিনিময়ে তুরস্কে একটি রাষ্ট্র কায়েম করে তাকে তার প্রধান করা হবে। এই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ সৈন্যদের রাস্তা খালি করে দেওয়া হয়।

চতুর্থ বিপর্যয় : ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ইংল্যান্ড ফিলিস্তিন দখল করে। ১৯১৭ সালের ১৬ নভেম্বর বেলফোরের অঙ্গীকারের দুই সপ্তাহ পর ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন প্রবেশ করে। জেনারেল এ্যালেনবি ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাপ্রধান। তখন সে তার প্রসিদ্ধ কথাটি বলে ফেলে, এখন সমাপ্ত হল ক্রুসেড যুদ্ধ।

মুস্তফা কামালের গাদ্দারির কারণে পুরো তুর্কী বাহিনী ফিরে আসে। আফসোস! ফিলিস্তিন আগ্রাসনের এই সময়ে আরব বাহিনী ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর সহায়ক।

এখানে আমাদের প্রশ্ন, ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী তখন কোথায় ছিল?

ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী তখন পুরোই অন্ধকারে ডুবে ছিল। তারা আরব জাতীয়তাবাদের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। উসমানী খেলাফতের সমস্ত কৃতিত্ব তারা মুছে ফেলেছিল। খেলাফতের দোষ আর ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছিল না তাদের।

এখানে আমি ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর অন্ধকারে ডুবে থাকার জঘন্য একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। যারা উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ব্রিটিশদের জন্য ফিলিস্তিনের দুয়ার খুলে দেয়। তৎকালীন ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ছিল, অচিরেই ব্রিটিশ আসবে উসমানী খেলাফতের কবল থেকে তাদেরকে স্বাধীন করতে এবং আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দিতে, যার প্রধান হবেন শরীফ হুসাইন। সাইকস-পিকট চুক্তির সংবাদ ফাঁস হয়ে পড়ার পরও তাদের এ ঘোর কাটেনি।

আরও একটি জঘন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রবেশের আগে ফিলিস্তিনে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছিল, 'ইসলামী খ্রিস্টীয় সংঘ'। এটা ছিল একটা বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন, যার লক্ষ ছিল তুর্কী আগ্রাসন ও বিশৃঙ্খলা থেকে

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা– যেমনটা তারা দাবি করত। তৎকালীন কিছু আলেমও এতে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি মুফতী আমীন হুসাইনীও এতে যোগ দিয়েছিলেন, যিনি পরবর্তীতে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেন। চিন্তা করে দেখুন, ফিলিস্তিনী জনসাধারণের উপর অন্ধকারের ঘোর অমানিশা কতটা ছেয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীকে নজরদারী করার ভার ন্যস্ত করা হয় এ সংগঠনের উপর। প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিনের সংকট নিরসনের জন্য এমন কোনো সংগঠন, যার নাম হবে 'ইসলামী খ্রিস্টীয় সংঘ' গড়ে তোলার কোনো অর্থ নেই। অথচ তখন মুসলমানরা ছিল ফিলিস্তিনের জনসংখ্যার ৮২%। খ্রিস্টান ছিল ১০%। আর ঐক্য ও প্রগতি সংঘের উৎপত্তি এবং ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিন যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির পর তাদের সংখ্যা দাড়ায় ৮%।

শরীফ হুসাইনকে প্রদত্ত ওয়াদা অনুযায়ী তিনি প্রাপ্য দাবি করলে ব্রিটিশ পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নেয়। শরীফ হুসাইনের পুত্র ফয়সালকে ইরাকের কর্তৃত্ব দেয় তারা। তার আরেক ছেলে আব্দুল্লাহকে দেয় জর্ডানের কর্তৃত্ব। ব্রিটিশরা তার জন্য একটি রাষ্ট্রের রূপ দেয়। এখানে জর্ডান নামে কোনো রাষ্ট্র ছিল না। বরং এখানে ছিল পূর্ব জর্ডান আমিরাত।

এসব করা হয়, যাতে মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং মুসলমানরা মনে করে যে, তারা তাদের হক বুঝে নিয়েছে। অথচ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীই ইরাক ও জর্ডান নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। আর ফিলিস্তিনকে তারা রাখে কায়রোতে অবস্থিত ব্রিটিশ অফিসের সরাসরি অনুগত একটি সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে।

আসুন, দেখে নিই, ফিলিস্তিনের পরবর্তী অবস্থা কী হয়? কীভাবে নতুন করে শুরু হয় ফিলিস্তন ভূখণ্ডে ইহুদীদের ইতিহাস?

মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কী হয়?

নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদীদের পরিকল্পনা কী?

আতাতুর্ক, তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণ

ইংল্যান্ড উসমানী খেলাফত থেকে নিস্কৃতি পেতে মুস্তফা কামালকে তুরস্কের কর্ণধার বানানোর ইচ্ছা করে। কাজেই তাকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। তবে তিনি ছিলেন অল্প বয়সী। এজন্য ইংল্যান্ড উসমানী খেলাফত ও গ্রিসের মধ্যে একটি কৃত্রিম যুদ্ধ সৃষ্টি করে। এ যুদ্ধে ইংল্যান্ড গ্রিসকে সমর্থন দেয়। মুস্তফা কামাল তুর্কী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং তাদের দাবি অনুসারে ইংল্যান্ডের মদদপুষ্ট গ্রিস বাহিনীর উপর তিনি বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করেন। এতে চারদিকে হইচই পড়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে তার খ্যাতি। পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলো তার ছবি প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে তার সাক্ষাৎ শুরু হয়। ইংল্যান্ড এই লোককে সম্মান দেখাতে শুরু করে, যিনি ব্রিটিশ মদদপুষ্ট গ্রিস বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছেন। কিন্তু যখন আপনি এই যুদ্ধের উৎস পর্যালোচনা করবেন, তখন দেখবেন যে, এই যুদ্ধে একটি লোকও মারা যায়নি; বরং এ ছিল পরিষ্কার একটি প্রহসন। তবে এই প্রহসনই বহু মুসলমানকে, বরং বলুন সমস্ত মুসলমানকে প্রতারিত করে। এমনকি আহমাদ শাওকীর মত সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বও বলে ওঠেন—

আল্লাহ আকবার! কি অভূতপূর্ব জয়!

হে তুর্কী খালিদ! আরব খালিদরে জাগাও বিশ্বময়!!

অর্থাৎ আহমাদ শাওকী তুরস্কের খালিদ— মুস্তফা কামালকে আরবের খালিদ— খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ-এর সাথে তুলনা করেন। এই

কবিতা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন তিনি কামাল আতাতুর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হননি। পরে যখন তিনি মুস্তফা কামালের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হন, তখন একটি দীর্ঘ কাসীদা লেখেন, তাতে ইসলামী খেলাফতের পতনের পর তুরস্ক ও মুসলমানদের প্রতি মাতম করেন।

আফসোস! অদৃশ্য শক্তির সহায়তায় এরপর মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় পৌঁছে যান। এরপর তিনি একের পর অদ্ভুত কাজে ব্যাপৃত হতে আরম্ভ করেন। আফসোস! পরবর্তীতে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে এগুলো প্রয়োগ করা হয় এবং মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের অভিজ্ঞতাকে সেই নেতার জন্য একটি মডেলহিসাবে গ্রহণ করা হয়, যে তার দেশ ধর্মীয় মূলনীতি নয়, বরং জাতীয়তাবাদের মূলনীতির উপর পরিচালনা করতে চায়।

মুস্তফা কামাল রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পুরোপুরি পৃথক করে দেন। সংবিধান থেকে সেই ধারা বাতিল করে দেন, যাতে বলা হয়েছিল ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সংবিধানে যুক্ত করেন যে, এটা একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এর কোনো ধর্ম নেই। আমার এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা পর্যন্ত তুরস্কের সংবিধান এমনই রয়েছে।

শরীয়তকে তিনি পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেন। ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের সংবিধান কার্যকর করেন। নারীদের জন্য ইসলামী হিজাব নিষিদ্ধ করেন। কয়েক বছর তুরস্কে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপন বন্ধ রাখেন। কয়েক বছর তুর্কী মুসলমানদেরকে হজ পালনে বাধা প্রদান করেন।

অসংখ্য মসজিদ বন্ধ করে দেন। আয়া সোফিয়া মসজিদ প্রথমে গীর্জা[8], তারপর গুদাম, অতঃপর জাদুঘরে পরিণত করেন। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। অমুসলিমদের সাথে মুসলিম নারীদের বিবাহ বৈধ

[8] বর্তমান তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগানের নেতৃত্বে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই তুর্কী হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে আয়া সোফিয়াকে আবার মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। বহু বছর পর এখানে নতুন করে সালাত আদায় শুরু হয়।

করেন। সাপ্তাহিক ছুটি জুমাবারের পরিবর্তে রবিবার সাব্যস্ত করেন। আরবী ভাষায় আযান নিষিদ্ধ করে তুর্কী আযান প্রবর্তন করেন। তুর্কী ভাষা লিখতে আরবী বর্ণমালা নিষিদ্ধ করে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করেন। তুরস্কে শাইখুল ইসলাম বা মুফতীর পদ বাতিল করেন। এসব আইনের উপর আপত্তি করায় শাসনভার গ্রহণের শুরুতে তিনি পঞ্চাশেরও বেশি আলেমকে ফাঁসি দেন। মসজিদের ইমামদেরকে ইসলামী পাগড়ীর পরিবর্তে ইউরোপীয় হ্যাট পরিধান করতে বাধ্য করেন। হিজরী তারিখ গণনা পুরোপুরি বন্ধ করে খ্রিস্টীয় তারিখ গণনার প্রচলন করেন।

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা বৈধ করেন। মিরাস সম্পদে নারী-পুরুষকে সমান করেন। নিজের নাম থেকে মুস্তফা শব্দ বাদ দিয়ে শুধু আতাতুর্ক বহাল রাখেন। মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেন, যেন তার জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত না হয়।

এই হল সেই মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, যাকে বহু নেতার মডেল হিসাবে গণ্য করা হয়। আমি বলতে পারব না, তারা এই লোক সম্পর্কে এই বিস্তারিত বিবরণ জানেন, কি না? এসব কথা তার শত্রুরা তার সম্পর্কে বলেন, এমন নয়; এগুলো তুর্কী সংবিধানে বিদ্যমান। আফসোস! তুরস্কের সংবিধানে এগুলো আজও রয়েছে।

আহমাদ শাওকী যখন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন আফসোস করে বলেন—

بَكَتِ الصَّلَاةُ وَتِلْكَ فِتْنَةُ عَابِثٍ * بِالشَّرْعِ عِرْبِيدِ الْقَضَاءِ وَقَاحِ

أَفْتَى خُزَعْبَلَةً وَقَالَ ضَلَالَةً * وَأَتَى بِكُفْرٍ فِي الْبِلَادِ بَوَاحِ

কাঁদে সালাত। এসব শরীয়ত নিয়ে তামাশাকারী, অসভ্য বিচারক, নির্লজ্জ (কামাল)-এর ফেতনা। কৌতুক করে সিদ্ধান্ত নেয়, বলে গুমরাহীর কথা এবং দেশে চালু করে পরিষ্কার কুফর।

এ হল মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের ছায়ায় গড়ে ওঠা তুরস্ক। যাকে মুসলমানদের স্বার্থ বিশেষত ফিলিস্তিনের স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করে দেওয়া হয়েছে।

হার্জলের নীল নকশা বাস্তবায়ন, ব্রিটিশ বাহিনীর ফিলিস্তনে অনুপ্রবেশ এবং খলিফা আবদুল হামীদ দ্বিতীয়কে অপসারণের পর ইংল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার লক্ষে এবং বেলফোরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা শুরু করে।

এসময় শুরু হয় খুব ভয়ানক এক পর্ব ১৯১৮-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আমি এ পর্বেরর নাম দিয়েছি ফিলিস্তিনকে ইহুদীকরণ পর্ব। অর্থাৎ ইহুদী স্বার্থে জনসংখ্যার অনুপাত বদলানোর ধাপ। আবদুল হামীদ সানীর যুগে ফিলিস্তনে ইহুদীদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫ হাজার। ঐক্য ও প্রগতি সংঘের যুগে ১৯০৯-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সংখ্যা গিয়ে পৌঁছায় ৫০ হাজারে। শুরু হয় বিভিন্ন পন্থায় ইহুদীকরণ। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ফিলিস্তিনের প্রথম ব্রিটিশ দপ্তরের প্রধান ব্যক্তি ছিল একজন ব্রিটিশ ইহুদী নাগরিক। তার নাম ছিল হার্ভার্ড শামুয়েল।

ফিলিস্তিনের ইহুদীকরণে মৌলিক পাঁচ পদক্ষেপ

প্রথম পদক্ষেপ : ইহুদীদের ফিলিস্তিন হিজরতে উৎসাহ প্রদান। এতে ফিলিস্তিনে ইহুদী জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে বিরাট আকার ধারণ করে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানী খেলাফতের বিলুপ্তি, তুরস্ক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দেন। এর পরের বছরই, অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে একসাথে ৩৪ হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে হিজরত করে। ১৯১৭ সালে যেখানে ইহুদী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৮%, সেখানে অব্যাহত হিজ্রতের ফলে ১৯৪৮ সালে তাদের অনুপাত দাঁড়ায় ৩২%।

আর এই প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়ে যায় প্রসিদ্ধ ইহুদী সংগঠন 'হাগানা'। যা ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর বীজ বলে সাব্যস্ত হয়। ইসরাইলী বাহিনীতে এ সংগঠনের ৬২ হাজার ইহুদী যোদ্ধা ছিল। এখানে আরও ছিল ইরগুন সঙ্ঘ ও ইস্টার্ন সঙ্ঘ নামে ইহুদী সংগঠন। ইংল্যান্ড সবসময় এসব অনুপ্রবেশকারীদেরকে অস্ত্র দিয়ে এবং ইহুদী সেনানিবাসে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করত।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : ফিলিস্তিনে সাধ্যমত জমি কেনার প্রক্রিয়া, যাতে ফিলিস্তিনে অগ্রাধিকার অর্জন করা যায়। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের সময় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জমির মালিকানা ছিল শূন্যের কোঠায়। কেননা, আইন ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে জমির মালিকানায় অন্তরায় সৃষ্টি করত। ঐক্য ও প্রগতি সংঘের সময়ে ১৯০৯-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহুদীরা ঐক্য ও প্রগতি সংঘের নেতাদেরকে ঘুষ দিয়ে ২% জমির মালিক হয়ে যায়। ১৭১৭ থেকে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ আগ্রাসনের যুগে তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৫.৭% ভূমির মালিক হয়ে যায়। এর মানে হচ্ছে, ইহুদী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের ভূমির মালিকানা বৃদ্ধি পায়নি। বরং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে তারা প্রকৃতপক্ষে ৫.৭% ভূমির মালিক হয়েছিল। এই সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই যে, ঐক্য ও প্রগতি সংঘের যুগে তারা ২% ঘুষ দিয়ে নিয়েছিল। এটা ব্রিটিশ আগ্রসনের আগের কথা। অপর ১.২% ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকার তাদেরকে বিনামূল্যে দিয়েছিল। ১.৫% ফিলিস্তিনে বসবাসকারী লেবাননী ও সিরিয়ান বিভিন্ন খ্রিস্টান পরিবারের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। ব্রিটিশ আগ্রাসন বাস্তবায়িত হলে এসব পরিবার তাদের দেশে ফিরে যায়। এসব পরিবারের মধ্যে অন্যতম ছিল সার্সোক (Sursock family), মুত্রাণ (Mutran), ও তিয়ান (Tian) প্রভৃতি পরিবার।

মাত্র ১% ভূখণ্ড ফিলিস্তিনীরা ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দেন। ওই সময় ইহুদীদের কাছে এমন বিক্রয়কে হারাম সাব্যস্ত করে ফিলিস্তিনে একাধিক ফতোয়া প্রকাশিত হয়। বলা হয়েছিল, কেউ ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করলে সেটা মুসলমান এবং বিশেষত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের সাথে খিয়ানত বলে গণ্য হবে।

ফিলিস্তিনীরা তাদের ভূখণ্ড ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে বলে যে মানুষ ধারণা করে, সেটা একটা প্রোপাগাণ্ডা। ইহুদীরা এই প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে থাকে, যাতে ক্রয়সূত্রে এই ভূখণ্ডের মালিক বলে বিশ্বের কাছে আইনী বৈধতা লাভ করতে পারে। এই প্রোপাগাণ্ড সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এমনকি– আফসোসের বিষয়– মুসলমানরাও ফিলিস্তিনকে মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলতে আগ্রহী। তারাও সবসময় একটি কথা বলে থাকে, তারা নিজেদের ভূখণ্ড বিক্রি করে দিয়েছে, এখন তাদেরকেই স্বাধীন করতে হবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ : ফিলিস্তিনের অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার। অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রাণশক্তি। যেমন তাদের নেতা কার্ল মার্কস বলেছিল। ইংল্যান্ড আইনী সহযোগিতার মাধ্যমে ইহুদীদের পরিবেশ তৈরি করে দেয়। ইহুদীদের শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল বিনাশুল্কে প্রবেশের পথ তারা সহজ করে দেয় এবং তারা উৎপাদিত পণ্যের উপর বিরাট শুল্ক ধার্য করে, যাতে ফিলিস্তিনীদের দারিদ্র্যের সুযোগে ফিলিস্তিনী অর্থনৈতিক বাজারে ইহুদীদের একচেটিয়া আধিপত্য সৃষ্টি হয়। এমন গর্হিত কাজের সময়ও ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহ থেকে কোনো প্রকার চাপের মুখে তাদের পড়তে হয়নি। এভাবে ইহুদীদের অর্থনৈতিক আধিপত্য যেকোনো সীমা ছাড়িয়ে যায়। চলুন, এর উপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করি।

আল-কুদসে ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৯টি। সেগুলোর মধ্যে ১৪টি ছিল ইহুদীদের। ভবন নির্মাণের জন্য কাঁচামাল বিক্রির কোম্পানি ছিল ৪২টি। এসবের ৩০টি ছিল ইহুদীদের। ভূমি ক্রয়ের দালালি সংস্থা ছিল ৬২টি, সেগুলোর ৬০টি ছিল ইহুদীদের। কৃষিযন্ত্রের কোম্পানি ছিল ৬টি, ৫টি ইহুদীদের। প্রকৌশলী ঠিকাদার কোম্পানি ছিল ৫৫টি। ৫৪টি ইহুদীদের। মুদ্রণ কোম্পানি ছিল ৬৫টি। সবগুলোই ইহুদীদের। ঔষুধ, লবণ ও খনিজ কোম্পানি ছিল ১৬টি। সবগুলোই ইহুদীদের। তবে মামলা শুধু মালিকানারই ছিল না; বরং আরও বড় ব্যাপার এখানে ছিল। তা হল কোম্পানির নিয়োগকর্তা ও পরিচালক ছিল ইহুদী, আর শ্রমিকরা সবাই ছিল ফিলিস্তিনী। এবার ভেবে দেখুন, এ কঠিন পরিস্থিতিতে ইহুদীদের ব্যাপারে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর অনুভূতি কেমন ছিল?

চতুর্থ পদক্ষেপ : এ ছিল শিক্ষাজ্ঞানকেন্দ্রিক। প্রথম দিন থেকেই ইহুদীরা ফিলিস্তিনে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। তাই ফিলিস্তিনে পা দেওয়ার সাথে সাথেই তারা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করে। তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill)– সে তখনও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী হয়নি– ইংল্যান্ড থেকে নিজে এসে যায়তুন পাহাড়ের উপর হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করে যায়। উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদীদের শিক্ষাগত আন্দোলনের সূচনা করা। ইংল্যান্ড ইহুদীদের নিজস্ব শিক্ষা পরিমণ্ডলও সৃষ্টি করে দেয়। সেখানে তারা শিশুদের হিব্রু ভাষা শিক্ষাদান শুরু করে। তাদের অন্তরে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করতে থাকে।

পঞ্চম পদক্ষেপ : এ হল মিডিয়া আগ্রাসন। ইহুদীরা বিশ্বের সব পত্রিকা, ফিল্ম ও সংবাদমাধ্যগুলোতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে তাদের মালিকানার অগ্রাধিকারের কথা ছড়িয়ে দেয়। এমনকি পুরো বিশ্ব তাদের এ অধিকারের কথা পুরোপুরি মেনেও নেয়। এই সুযোগ তারা পেয়েছিল ইসলামী মিডিয়ার শূন্যতার কারণে।

ইহুদীদের হিজরত ও ভূমিক্রয় ও অন্যান্য ট্রাজেডির বিপরীতে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর তখন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। প্রথম কয়েক বছর তারা একেবারে অন্ধকারে ডুবে থাকে। তাদের মস্তিষ্কে শুধু ছিল জাতীয়তাবাদই সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু পরবর্তীতে তারা বুঝতে পারে যে, ব্রিটিশদের ওয়াদা-আঙ্গীকার সব ছিল মিথ্যা এবং এ হচ্ছে ব্রিটিশ আগ্রাসন, যার উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদীদের শিকড় শক্তিশালী করা। ফলে তারা ইংল্যান্ড ও ইহুদীদের ফিলিস্তিনে অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ– ব্রিটিশ আগ্রাসনের পর যখন ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী জাগ্রত হতে শুরু করে, তখন– থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে দুটি ধাপে ভাগ করা যায়–

প্রথম ধাপ : ব্রিটিশের বিপক্ষে কোনো সশস্ত্র সামরিক পদক্ষেপ ছাড়া শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ধাপ।
দ্বিতীয় ধাপ : সশস্ত্র সংগ্রামের ধাপ।

১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী ব্রিটিশদের সাথে কোনো সমঝোতায় পৌঁছার জন্য সভা-সমাবেশ ও প্রতিনিধি প্রেরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। আর স্বাভাবিকভাবে এসবের ফলাফল ছিল শূন্য। কারণ, ব্রিটিশের কাছে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অবস্থান শক্তিশালী করার এক কূটনৈতিক লক্ষ এবং স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল। এই শান্তিপূর্ণ অধ্যায়ের নেতৃত্ব দেন মুফতী আমীন হুসাইনী। ১৯১৯-১৯২০-১৯২১ সালে ধারাবাহিকভাবে বিপ্লব সংঘটিত হতে থাকে। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আন্দোলন ছিল ১৯২৯ সালের বুরাক আন্দোলন (Buraq Uprising / The Events of 1929)। এ সময় ফিলিস্তিনে কিছু সংখ্যক ইহুদী, ব্রিটিশ ও মুসলমান নিহত হয়। তবে প্রচলিত অর্থে এটা কোনো সামরিক পদক্ষেপ ছিল না।

আল-কুদস ও অন্যান্য জায়গায় কিছু সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। মুসলমানদের সামনে ফিলিস্তিন সংকট তুলে ধরার জন্য ইসলামী বিশ্বেও কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ইসলামী সম্মেলন হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। এ সম্মেলনে ফিলিস্তিন সংকটকে একটি ইসলামী ইস্যু বলে ঘোষণা করা হয়। এতে ইসলামী বিশ্বের বেশ কিছু বরেণ্য ব্যক্তিও উপস্থিত হন। যেমন, মুহাম্মাদ রশীদ রেজা লুবনানী, যিনি তখন মিসরে বসবাস করতেন। হিন্দুস্তানের মুখপাত্র মাওলানা শওকত আলী। তিউনিসিয়ার মুখপাত্র আব্দুল আযীয সাআলবী। প্রখ্যাত পাকিস্তানী কবি মুহাম্মাদ ইকবাল। সিরিয়ান নেতা শাকরী কুওয়াতলী।

ইংল্যান্ডের সাথে আলাপ-আলোচনা কোনো সুফল বয়ে আনেনি। ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সাথে আলোচনার জন্য অনেকগুলো প্রতিনিধি দল লন্ডন গমন করে। বৈঠক হয় কখনও চার্চিলের সাথে, কখনও অন্যকারও সাথে। কিন্তু ইংল্যান্ড ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে গো ধরে বসে থাকে।

১৯৩৩ সালে প্রথম বারের মত ফিলিস্তিনে সশস্ত্র জিহাদের অধ্যায়ের সূচনা হয়। তখন ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসাম। যিনি ফিলিস্তিন সংকটকে মুখের সংকট থেকে কাজের সংকটে পরিণত করেন।

শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসাম একজন সিরিয়ান নাগরিক; তিনি ফিলিস্তিনী নন। সিরিয়াতে শরীয়াহ শাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করেন। এরপর মিসরেও অধ্যয়ন করেন। এরপর সিরিয়া ফিরে আসেন, যখন সিরিয়া ছিল ফ্রান্সের দখলে। ফরাসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সিরিয়াতে কয়েকটি বিপ্লব সংঘটিত করেন। তাঁর উপর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। তখন তিনি পলায়ন করেন। তবে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে নয়; তিনি ফিলিস্তিন গমন করেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলন কায়েমের উদ্দেশ্যে। সব আরব দেশই তো তার দেশ। যদিও তিনি নিজের দেশ সিরিয়া স্বাধীন করতে পারেননি, তবে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে ফিলিস্তিন স্বাধীন করবেন। স্বাধীন করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তিনি সুবিন্যস্ত বিপ্লবী জামাত গড়ে তোলেন। শুরুর দিকে ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই জামাতের কার্যক্রম গোপনে চলতে থাকে।

এক পর্যায়ে কাফেলার সদস্যসংখ্যা এক হাজারে পৌঁছে। তিনি এ কাফেলার একটি অর্থনৈতিক শাখা, একটি সামাজিক শাখা, একটি রাজনৈতিক শাখা ও একটি সামরিক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই জামাত শুধু বিপ্লব সংঘটন কিংবা আশপাশের আরব রাষ্ট্রগুলোর থেকে সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং শক্তিধর ব্রিটিশ জোয়ারের বিপরীতে ফিলিস্তিনে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও সংকল্প করে, যার কেন্দ্রে থাকবে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী।

আসুন দেখি, ইযযুদ্দীন কাসসামের সাথে কী ঘটে?

ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়া কী হয়? এবং ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী কী ভূমিকা অবলম্বন করে?

ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় পরিস্থিতি কী রূপ ধারণ করে?

ফিলিস্তিনে সশস্ত্র সংগ্রাম

আগে আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, ফিলিস্তিনী জিহাদী কাফেলা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করে। ১৯২২ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ কাফেলা গোপনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসাম এক প্রকার তৎপরতা এবং এখানে ওখানে দাওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেন। তবে তিনি ইহুদী ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো সামরিক তৎপরতা শুরু করেন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে, যখন তিনি সামরিক বিপ্লবের ঘোষণা দেন।

তিনি সাবধানে এই সময়টা বেছে নেন, কেননা, এই বছর একসাথে ৬০ হাজার ইহুদীর বিরাট সংখ্যা ফিলিস্তিনে হিজরত করে। শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যদি এখন বিপ্লবের সূচনা করেন, তা হলে পুরো ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠী তার পাশে দাঁড়াবে। একের পর এক ইহুদীদের অনুপ্রবেশের ঔদ্ধত্য তাঁকে শঙ্কিত করে তোলে।

বাস্তবেও তাঁর আহ্বানে ফিলিস্তিনে বিপ্লবের জোয়ার সৃষ্টি হয় এবং তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনীরা ইহুদী ও ব্রিটিশদের উপর আঘাত হানতে শুরু করে। কিছু কিছু জায়গায় তারা নিজেদের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ বাহিনী কেঁপে ওঠে। তারা এমন সামরিক বিপ্লবের কথা কল্পনাও করেনি।

শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসামের মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ইসলামিক। তিনি বলতেন, ফিলিস্তিন স্বাধীন করা, অথবা অন্য যেকোনো ইসলামী ভূখণ্ড স্বাধীন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন। তিনি

তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি করেন– আপনারা প্রত্যেকে সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে হলেও হাতিয়ার কিনুন।

এই ঘোষণার মাত্র একমাস পর ২০ নভেম্বর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশবিরোধী তাঁর এক লড়াইয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যেই সময় তিনি জিহাদের ঘোষণা দেন– ব্রিটিশের বিরোধিতা করেন এবং ইহুদীদের মুখোমুখি হন, তা কিন্তু একমাসের বেশি নয়। ব্রিটিশ ধারণা করেছিল যে, শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসামের হত্যার মাধ্যমে বিপ্লবের মৃত্যু হবে। কিন্তু তা না হয়ে এর আগুন আরও জ্বলে ওঠে। কেননা, যখন তাঁর কার্যক্রম গোপনে চলছিল, তখন তিনি বহু সময় ব্যয় করে ফিলিস্তিনী জনসাধারণকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যেমন নবীজী ﷺ তাঁর দাওয়াতের শুরুতে করেছিলেন। এরপর যখন অনুকূল পরিস্থিতি পেয়ে যান, তখন বিপ্লবের ঘোষণা দেন। ফিলিস্তিনী জনগণও তাঁর সঙ্গী হয়ে যায়। এজন্য তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর দাওয়াত শেষ হয়নি।

শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসামের পর ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্বে আসেন ফারহান সাদী رحمه الله। তিনি একজন ফিলিস্তিনী। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ইযযুদ্দীন কাসসামের গঠিত ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে থাকেন তিনি। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় রমাদান মাসে। সিয়ামরত অবস্থায় তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

ব্রিটিশ ভেবেছিল, এই মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে বিপ্লব থেমে যাবে; কিন্তু তার প্রজ্জ্বলন ও শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ফিলিস্তিনের আকাশে উদিত হয় নতুন এক নক্ষত্র। ফিলিস্তিনের জিহাদী ইতিহাসে তিনি এক অনন্য উপমা। তিনি হলেন শহীদ আব্দুল কাদির হুসাইনী رحمه الله।

ব্রিটিশ আগ্রাসন ও ইহুদী উপস্থিতি বিরোধী ফিলিস্তিন বিপ্লবের ইতিহাসে আব্দুল কাদির হুসাইনী ছিলেন একজন অগ্নিপুরুষ। ১৯৩৬ সালে তিনি অনেকগুলো বিপ্লব সংঘটিত করেন। অর্থাৎ ইযযুদ্দীন কাসসাম ও ফারহান সাদীর শাহাদাতের কয়েক মাস পরই। তাঁর সশস্ত্র

বাহিনী শুধু ১৯৩৬ সালে ৫০৬টি কমান্ডো অপারেশন চালায়। অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতিদিনই এক-দুটি করে অপারেশন।

একই বছর ইংল্যান্ড ফিলিস্তিনে একটি কমিটি পাঠায়, যা বিল কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটি ফিলিস্তিনকে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করার দিকে ইঙ্গিত করে– একটি ইহুদী, আরেকটি ফিলিস্তিনী। স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়টি ফিলিস্তিনী জনগণকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। তারা বুঝতে পারে, ইহুদীরা ইংল্যান্ডের মদদে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

১৯৩৮ সালের এক বছরে ফিলিস্তিনীরা ৫,৭০৮টি কমান্ডো অপারেশন পরিচালনা করে। তাও পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর কোনো প্রকার সহায়তা ছাড়া। ১৯৩৯ সালে মুজাহিদরা ফিলিস্তিনে ৩,৩১৫টি কমান্ডো অপারেশন চালান। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১০ বা তারও বেশি অপারেশন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩ বছরে ব্রিটেনের ক্ষয়ক্ষতি অনুমান করা হয় ১০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাণহানী। বিনা লগ্নিতে এমন ঘটেনি; বরং উক্ত তিন বছরে প্রায় ১২ হাজার ফিলিস্তিনীকে শাহাদতবরণ করতে হয় এবং বন্দী হয় ৫০ হাজার। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ১৪৬ জনকে এবং তছনছ করে দেওয়া হয় পাঁচ হাজার বাড়িঘর।

এ ঘটনার পর ইংল্যান্ড বুঝতে পারে যে, অবস্থা বেগতিক হয়ে যাচ্ছে। এজন্য বেলফোর অঙ্গীকার বাতিল, ফিলিস্তিন বিভক্তি রদ এবং ফিলিস্তিনী সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। কিন্তু ফিলিস্তিনী সরকার গঠিত হবে দশ বছর পর।

আফসোস! ইংল্যান্ডের এসব প্রতিশ্রুতির কারণে ফিলিস্তিনে বিপ্লব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা ছিল ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের একটি ভুল। কেননা, ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির উপর আমাদের আস্থা রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে এসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের দীর্ঘ ইতিহাসের পর।

ইহুদীরা ইউরোপীয় অভিবাসনকে ফিলিস্তিনমুখী করতে গিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে শুরু করে। এমনকি কখনও কখনও ইংল্যান্ড ইউরোপীয় ইহুদীবাহী কোনো কোনো জাহাজ ইংল্যান্ড অভিমুখে নিয়ে যেত। এজন্য ইহুদীরা একটি নৌ-জাহাজ উড়িয়ে দেয়, কারণ সেটা ফিলিস্তিন অভিমুখে পাঠানো হয়নি।

বিশ্ব এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছিল। এমন সময় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। বিশ্ব দুটি সামরিক পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে জার্মান সামরিক পক্ষ– তার সাথে যুক্ত হয় ইতালি ও জাপান। অপর দিকে ব্রিটিশ সামরিক পক্ষ– তার সাথে যোগ দেয় ফ্রান্স, রাশিয়া এবং পরবর্তীতে আমেরিকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বনিম্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫০ মিলিয়ন মানুষের প্রাণহানী ঘটে। কারণ, দুনিয়ার পুরো ইতহাসে এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। এখানে আরেক পরিসংখ্যান বলে, প্রাণহানীর সংখ্যা ৬০ মিলিয়ন।

অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ইহুদীরা এই যুদ্ধ পরিচালনা করে। তারা জার্মানির বিপরীতে ব্রিটিশ শিবিরে যোগ দেয়। ফিলিস্তিনে তারা শক্তিশালী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আবেদন জানায়। তারা অস্ত্র তৈরির কারখানার জন্যও আবেদন করে। ব্রিটিশ বাহিনীর ছত্রছায়ায় ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে তারা ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। এসব কিছু ঘটতে থাকে আরব দেশগুলোর রণাঙ্গান থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকাবস্থায়।

আরেক বিষয় হচ্ছে জার্মানি ও হিটলারের আওতাধীন অঞ্চলগুলোতে সংকটের অজুহাতে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে অভিবাসনের গতি বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৯০ হাজারের অধিক ইহুদী ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে।

নাৎসি বাহিনীর ঘটনাকে ইহুদীরা সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে। তারা দাবি করে, হিটলারের হাতে জার্মানিতে ইহুদীরা গণহত্যার শিকার। তারা এর নাম দেয় হলোকাস্ট– অর্থাৎ পবিত্র আত্মোৎসর্গ।

ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বের আবেগ-অনুভূতি নড়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে, হিটলার ৬ মিলিয়ন ইহুদী হত্যা করেছে। অথচ ইহুদীরা তখনও এই সংখ্যায় পৌঁছতে পারেনি। তবে তারা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করত, যা মানুষের মস্তিষ্কে এসব ধারণা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মনোভাব এমন দাঁড়িয়েছে যেন এসব তথ্য বাস্তব। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদীরা জাতিসংঘে নিজস্ব প্রতিরক্ষা ইউনিট তৈরি করে। অথচ তারা কোন রাষ্ট্রই ছিল না।

জাতিসংঘ কিছু দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। তা সত্ত্বেও তারা ইহুদীদের নামে প্রতিরক্ষা ইউনিট সৃষ্টি করে। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রামাণ করে যে, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদী রাষ্ট্রের যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তা জাতিসংঘের জানা ছিল।

অপর দিকে তখন আমেরিকার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিশেষত জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের পর। আমেরিকা জানান দিতে থাকে যে, অচিরেই সে বিশ্বের পরাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের তারকা ডুবতে শুরু করে। সুতরাং ইহুদীরা তাদের শক্তির গতি আমেরকিার দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং প্রথমবারের মত তারা লন্ডনের পরিবর্তে আমেরিকাতে তাদের সম্মেলনের আয়োজন করে।

ইহুদীরা এবার ফিলিস্তিন থেকে ইংল্যান্ডকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে তারা নিজেরাই সেখানে সামরকি ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে। বহু প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক সংলাপ হলে ইংল্যান্ড নির্ধারিত মেয়াদ ১৯৪৮-এর আগে বের হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অনেক ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দকে ইহুদীরা গোপনে হত্যা করে ফেলে। অথচ এই ব্রিটিশই ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আবাদ করেছিল। তারা বহু ব্রিটিশ অফিস উড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য তারা রেল লাইনও উড়িয়ে দেয়। এসব তারা করে ব্রিটিশকে দ্রুত ফিলিস্তিন ছাড়ার জন্য।

বেশিরভাগ আরব শাসক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে আফসোস! তারা ছিলেন ইংল্যান্ডের শিবিরে। অপর দিকে আরব জনগোষ্ঠী বাজি ধরেছিল (জার্মানি) আহত ঘোড়ায় চড়ে। তারা অনেকে

জার্মানির সাথে মিশে সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তিরও চেষ্টা করেছিল। শর্ত ছিল জার্মানি ফিলিস্তিনের মুসলিম সৈন্যদেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ার প্রশিক্ষণ দিবে। তবে জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তার সাথে সমস্ত আশা নিভে যায়। এভাবেই ১৯৪৫ সালে শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ড মিসরের প্রধান মন্ত্রী মুস্তফা নাহহাস পাশাকে উপদেশ দেয় আরব লীগ গঠন করার জন্য। সত্যিই এক বিস্ময়কর বিষয় যে, যে ইংল্যান্ড মুসলিম ও আরব বিশ্বকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চায়, সেই ইংল্যান্ড কেন মুস্তফা নাহহাসকে আরবদের ঐক্য সৃষ্টির নির্দেশ দিবে?

আরব লীগ সূচনাতে সাতটি আরব দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলো হচ্ছে মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, ইরাক, সৌদী আরব ও ইয়েমেন। ইয়েমেন বাদে এসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ফিলিস্তিনকে ঘিরে অবস্থিত।

অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানসিকতা নিয়ে ইংল্যান্ড চাচ্ছিল তার স্বার্থ কার্যকর করার জন্য আরবরা যেন একটি ক্রুসিবলে[৫] জড়ো হয়। কেননা, আরব লীগে অন্তর্ভুক্ত সবগুলো দেশ ছিল প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসনের শিকার।

বিষয়টি এপর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইংল্যান্ড মুস্তফা নাহহাস পাশাকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন আরব লীগে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর উপর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার শর্তারোপ করে। এর মাধ্যমে ইংল্যান্ড ফিলিস্তিনকে আরব ও মুসলমানদের থেকে বাদ করে দেয় এবং ইহুদীদের পক্ষে বরাদ্দ করে।

আমরা প্রশ্ন করি, সে সময় আরব লীগে অংশগ্রহণকারী কোন দেশটি আগ্রাসনের বাইরে ছিল? মিসর ছিল আগ্রাসনের শিকার। একই অবস্থা ছিল ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও ইয়েমেনের। তা হলে আগ্রাসনের সংজ্ঞা কী? আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার অর্থই বা কী?

---

[৫] Crucible এমন পাত্র, যার মধ্যে ধাতব বস্তু রাখলে আপনা-আপনি গলে যায়।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইঙ্গ-মার্কিন জোট। বিরাট সংখ্যক ইহুদী জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর এই জোট ইউরোপে ইহুদীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করে। এসব শিবিরে ইহুদীদের অবস্থা দেখে এই জোট সহমর্মিতা প্রকাশ করে। এরপর এই জোট খুব স্পষ্ট কিছু দাবি উত্থাপন করে–

প্রথম দাবি : ১ লক্ষ ইহুদীকে অনতিবিলম্বে ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে অভিবাসন দিতে হবে। অন্যথায় মানবিক বিপর্যয় সঙ্ঘটিত হবে।

দ্বিতীয় দাবি : পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড বিক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। যাতে এই বিরাট সংখ্যক নিপীড়িত ইহুদীকে তারা সেখানে পুনর্বাসন দিতে পারে। কিন্তু কে তাদেরকে নির্যাতন করেছিল? যারা তদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল, তারা হল নাৎসি বাহিনী। অথচ এর খেসারত দিতে হবে আরবদের?

তৃতীয় দাবি : ফিলিস্তিনের সরকার হবে অন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকার। না ইহুদী সরকার; না ফিলিস্তিনী। তবুও ইহুদীরা বিপ্লবে ফেটে পড়ে। ইহুদীরা এই প্রস্তাবের উপর আপত্তি করে বসে। কারণ, তারা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকার চায় না; তারা চায় ইহুদী সরকার।

স্বাভাবিকভাবে আরব দেশগুলো ছিল অঘোর নিদ্রায়। তারা প্রথাসুলভ কয়েকটি অভিযোগ লিখে ইংল্যান্ডের কাছে পাঠায়। এরপর জনসাধারণের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিন ও আরও কিছু আরব দেশে শক্তিশালী আন্দোলন হয়। ইংল্যান্ড পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নেয়। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘের কাছে অর্পণ করে। এরপর জাতিসংঘের অধিবেশন বসে এবং সে প্রস্তাবই পাশ হয়, যা ইংল্যান্ড ও আমেরিকা পাশ করেছিল।

জাতিসংঘের অনুমোদিত প্রস্তাব ছিল এমন–

ফিলিস্তিনকে দুই রাষ্ট্রে বিভক্তকরণ। অথচ ইংল্যান্ড আগে ফিলিস্তিনীদের ওয়াদা দিয়েছিল যে, ফিলিস্তিনকে কিছুতেই দ্বি-খণ্ডিত করা হবে না।

অপর প্রস্তাব হচ্ছে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৫৬.৫% ইহুদীরা পাবে। অথচ তাদের জনসংখ্যার অনুপাত ছিল মাত্র ৩২%। আর ফিলিস্তিনীরা পাবে ৪৩%। অবশিষ্ট ০.৫% হচ্ছে আল-কুদস (জেরুজালেম)-এর ভূখণ্ড, যা আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে থাকবে।

আমরা যদি বন্টনের ম্যাপের দিকে তাকাই, তা হলে দেখতে পাই ফিলিস্তিনীদেরকে যে অংশগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ইহুদী সাগরের মধ্যে কয়েকটি দ্বীপ। এক অংশ পশ্চিম তীরে। অপর অংশ গাজায়। মধ্যবর্তী অঞ্চল ইহুদীদের। অর্থাৎ ইহুদীদের অনুমোদন ছাড়া পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনীরা গাজার অধিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। এখানে আরও অনেক অসংগতি রয়েছে বন্টনের মধ্যে।

এরপর আমেরিকা জাতিসংঘের বহু সদস্য রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে বিভাজনের প্রস্তাব কার্যকর করা হয়।

আরব লীগ তখন তড়িঘড়ি করে বৈঠকে বসে। বৈঠকে তারা কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাতে তারা বলে, ব্রিটিশ ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দামেশকের দক্ষিণে কাতনা শহরে ফিলিস্তিনী স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তারা একটি প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করবে। তারা আরও বলে, সত্বর আমরা একটি বাহিনী গড়ে তুলব। আমরা তার নাম দিব স্যালভেশন আর্মি। ৫টিরও অধিক আরব দেশের সমন্বয়ে গঠিত হবে এই বাহিনী। এর নেতৃত্বে থাকবে যে ব্যক্তি, তার নাম ফাওজী কাউকজী। সে ছিল এমন এক লোক, যাকে শত সন্দেহ পরিবেষ্টন করে রাখত। ফিলিস্তিন প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তারা এক মিলিয়ন পাউণ্ড বাজেট করে।

এসব সিদ্ধান্ত কানে যাওয়ার পর ব্রিটেন নিজের নির্দেশে গঠিত আরব লীগের কাছে একটি বার্তা পাঠায়। বার্তার ভাষ্য ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। তাতে বলা হয়, ব্রিটেন কাতানায় ফিলিস্তিনীদের প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্রকরণকে বন্ধুত্ব পরিপন্থী কাজ বলে মনে করে।

ব্যাস, এতেই আরব লীগ কাতানার ক্যাম্প বন্ধ করে ফিলিস্তিনী স্বেচ্ছাসেবকদের বের করে দেয়। ৫টি দেশ থেকে মোট স্যালভেশন আর্মির সংখ্যা নির্ধারণ করে ৭৭০০ সৈন্য।

মাত্র ৭৭০০ সৈন্য যুদ্ধ করবে সেই ইহুদী বাহিনীর সাথে, যাদের শুধু হাগানা গ্যাং-এর সৈন্য সংখ্যা ৬২ হাজার। যারা ক্ষেপণাস্ত্র, জঙ্গী বিমানসহ ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ।

এসময় ফিলিস্তিনে আব্দুল কাদের হুসাইনীর নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন সংঘটিত হয়। বিপ্লব আরব ও মুসলিম বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। এ বছরই ব্রিটেন ইহুদীদের কাছে ২০টি জঙ্গী বিমান বিক্রি করে। আমেরিকার ইহুদীরা যখন শুনতে পায় যে, ফিলিস্তিন সংকটে সহযোগিতার জন্য আরব লীগ ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে ১ মিলিয়ন পাউণ্ড দান করেছে, তখন আমেরিকার ইহুদীরা ফিলিস্তিনের ইহুদীদের ২৫০ মিলিয়ন ডলার দান করে।

আর বিভিন্ন স্থানে যেসব আরব বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেগুলোর কোনো শক্তি বা প্রভাব ছিল না। কেননা, সেগুলো ছিল ব্রিটিশ আগ্রাসনের অধীনে। মুসলমানদের মধ্য থেকে শুধু একটি সংগঠন তখন সক্রিয় হয়। তা হল ইমাম হাসান আল-বান্নার পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট মুসলিম ব্রাদারহুড।

তিনি সংগঠনের সদস্যদেরকে ফিলিস্তিন জিহাদের দিকে মনোবিনেশ করতে নির্দেশ দেন। তাদের এ কাজ ছিল যথেষ্ট সুবিন্যস্ত। উৎপত্তি ছিল মিসর থেকে বীর মুজাহিদ আহমাদ আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন মিসরী ব্রাদারহুডের একজন কর্মকর্তা।

জর্ডানের মুজাহিদরা বের হয়েছিলেন আব্দুল লতীফ আবু কাওরাহর নেতৃত্বে। তিনিও ছিলেন ইখওয়ানের সদস্য।

ইরাকের মুজাহিদরা অগ্রসর হন মুহাম্মাদ মাহমুদ সাওয়াফের নেতৃত্বে। তিনি ইখওয়ানের একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন।

সিরিয়ার মুজাহিদরা সক্রিয় হন মুস্তফা সিবায়ীর নেতৃত্বে। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিরিয়া ইখওয়ানের প্রধান পর্যবেক্ষক।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিসরীয় ইউনিট ফিলিস্তিনে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে অবস্থিত নেগেব (Negev) মরুভূমিতে তারা প্রত্যক্ষ কমান্ডো অভিযান শুরু করে। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের শক্তি অস্ত্র সঞ্চালনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। কেননা, তারা মিসরের সুয়েজ ক্যানালে আগে ইংল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৩ এপ্রিল আল-কাস্তাল শহর অবরোধ করা হলে ফিলিস্তিনে এক বিরাট সংকট তৈরি হয়। শহরটি ছিল খুব দুর্ভেদ্য। ফিলিস্তিনীরা অনুভব করতে থাকে যে, এ শহরের অবরোধ হয়তো জিহাদী আন্দোলনকেই থামিয়ে দিবে। তখন আব্দুল কাদির হুসাইনী আরব লীগের প্রধানের কাছে গমন করেন। তার কাছে অস্ত্রের আবেদন করে তাকে বলেন, আরবদের ভাণ্ডারে জমা করে রাখা অস্ত্রগুলোর আমরাই বেশি হকদার। ফিলিস্তিন ধ্বংস হলে ইতিহাস আপনাদেরকে অভিযুক্ত করবে। অবশ্য আমি আপনাদের ব্যর্থতা আর অভিযোগ দেখার আগেই আল-কাস্তালে মারা যাব।

এরপরও আরবলীগ থেকে কোনো অস্ত্র আসেনি। আব্দুল কাদের হুসাইনী আল-কাস্তালে প্রবেশ করেন এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর শাহাদত বরণ করেন। আল-কাস্তাল শহরের পতন ঘটে। ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের এই মহান সিপাহসালারের শাহাদত ছিল খুব বেদানায়ক ঘটনা।

আরব সেনাবাহিনী এসময় পর্যন্ত ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেনি। কেননা, আরব সেনাবাহিনী ছিল ব্রিটিশ নিয়োগের অধীন। এজন্য ১৪/৫/১৯৪৮ তারিখে ব্রিটিশ বাহিনী বের হয়ে যাওয়ার আগে আরব বাহিনী ফিলিস্তিন প্রবেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, তখনও ব্রিটিশ উপনিবেশ উঠিয়ে নেওয়ার আরও একমাস বাকি ছিল।

আল-কাস্তাল শহরের পতনের পর ইহুদীরা দেইর ইয়াসীন-এ গণহত্যায় লিপ্ত হয়। গ্রামটির ২৫০ জন অধিবাসীকে হত্যা করে। এই গণহত্যার যে নেতৃত্ব দেয়, সে হল মেনাখেম বেগিন। যে পরবর্তীতে শান্তিতে নোবেল পুরুষ্কার লাভ করে।

এরপর ইহুদীরা আরিহা পর্যন্ত পুরো পথ জয় করে ফেলে। তারা ফিলিস্তিনীদের উদ্দেশ্যে বলে, যে আরিহায় আসতে চায়, সে যেনো চলে আসে। দেইর ইয়াসিন ও নাসিরুদ্দীন গ্রামের গণহত্যার কথা শোনার পর ফিলিস্তিনী জনসাধারণের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিনীরা আরিহা আসে। মেনাখেম বেগিনের ভাষ্যমতে ইসরাইলের জন্য বন্টনকৃত (জাতিসংঘ কর্তৃক জোরপূর্বক বন্টন) অঞ্চলের ৮ লক্ষ আরব অধিবাসীর মধ্য থেকে দেইর ইয়াসিন হত্যাকাণ্ডের পর মাত্র ১ লক্ষ ৬৫ হাজার আরব ফিরে এসেছিল।

আমরা আগেই যেমন বলেছি, একটিমাত্র দল, যেদল ফিলিস্তিনে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল, তা হল ইখওয়ানুল মুসলিমীন। জিহাদ করতে করতে তারা আল-কুদস (জেরুজালেম) অবরোধ পর্যন্ত পৌঁছে যান, যার অভ্যন্তরে তখন ১ লক্ষ ইহুদী বিদ্যমান ছিল। ব্রিটিশ শক্তির তুলনায় যদিও শক্তি-সামর্থ্য ছিল নেহাতই কম, তবুও আবেগ, এখলাস ও পারস্পরিক সহায়তার কারণে আল-কুদস শহরের অবরোধ সম্ভব হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমীন আগেই ফিলিস্তিনের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আর ইহুদীদের আধিপত্য ছিল ফিলিস্তিনের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের উপর।

১৯৪৮ সালের ২২ এপ্রিল ইহুদীদের হাতে হাইফা শহরের পতন হয়। ১১ মে পতন হয় সফদ শহরের। ১২ মে বেইট সিয়ান শহরের এবং ১৩ মে পতন হয় ইয়াফা শহরের।

ইয়াফা শহরের পতনের পর এখানে ভয়াবহ গণহত্যা সঙ্ঘটিত হয় এবং মেনাখেম বেগিনের হাতে ৭৭০ জন ফিলিস্তিনী শহীদ হন।

ইয়াফা পতনের একদিন পরই ব্রিটিশ বাহিনীর বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত ছিল। সত্যি সত্যিই ১৪ মে ব্রিটিশ বাহিনী বের হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের নির্ধারিত মেয়াদ আবশ্যকরূপে পূর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের হাতে ন্যস্ত করবে।

ব্রিটিশ বাহিনী বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর ডেভিড বেন-গুরিয়ন ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ঘোষণার মাত্র ১১

মিনিট পরই আমেরিকা ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। অথচ আমরা জানি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না; বরং কংগ্রেসের মাধ্যমে গৃহীত হয়। কিন্তু এখানে প্রেসিডেন্ট একাই সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমেরিকা ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। মাত্র ২৪ ঘণ্টা পর সোভিয়েত ইউনিয়নও ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। এভাবে ইসরাইল বিশ্বের দুটি পরাশক্তির স্বীকৃতি লাভ করে। সেই সাথে ইংল্যান্ডেরও, যে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের বীজ বপন করেছিল।

ব্রিটিশ বাহিনী বেরিয়ে যাওয়ার পর আরব লীগ ফিলিস্তিনে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছিল ৫টি দেশের পক্ষ থেকে– মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ইরাক। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আরবের এক বাদশাহ। এই বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–

প্রথম সিদ্ধান্ত : ইতোপূর্বে গঠিত স্যালভেশন আর্মি বিলুপ্তকরণ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত : আল-জিহাদুল মুকাদ্দাস সংগঠন বিলুপ্তকরণ, যেটা আবদুল কাদের হুসাইনী তাঁর শাহাদতের আগে পরিচালনা করতেন। সেই সাথে সমস্ত ফিলিস্তিনীকে নিরস্ত্রকরণ। যাতে অস্ত্র শুধু সরকারী পক্ষে থাকে, যারা ফিলিস্তিনে লড়তে থাকবে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত : ইহুদীদের সাথে লড়াই। আর বাস্তবে তারা কয়েকটি বিজয়ও অর্জন করে। এখানে প্রশ্ন জাগে। ইংল্যান্ডের অনুগত এই দোসররা কীভাবে বিজয় অর্জন করে? হাঁ, পরক্ষণেই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে, এসব বিজয় ছিল শুধু সেই অঞ্চলগুলোতে, বিভক্তির সিদ্ধান্তের পর যেগুলো আরব অংশে পড়েছিল। তার মানে, আরব বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে শুধু জাতিসংঘ থেকে পাশকৃত বিভক্তির সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করার জন্য। যেই সিদ্ধান্ত তারা ইতোপূর্বে ইংল্যান্ডের সাথে মিলে একটি নগ্ন প্রহসনে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এমনকি ইরাকী বাহিনী যখন জেযরিল ভ্যালিতে প্রবেশ করে– যেটা বণ্টনের সিদ্ধান্তে ইহুদীদের জন্য বরাদ্দকৃত অঞ্চল– তখন আরব লীগ

সাথে সাথে ইরাকী বাহিনীকে সেখান থেকে সরে আসার নির্দেশ দেয়, যাতে এ জনপদ ইহুদীদের কাছে হস্তান্তর করা যায়।

১৭ মে ইহুদীদের হাতে আক্কা শহরের পতন ঘটে। তখনও ইখওয়ানুল মুসলিমীন আল-কুদস শহর অবরোধ করে রেখেছিল। আরব বাহিনী ইখওয়ানের কাছ থেকে দায়িত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আল-কুদসে অভিমুখে রওয়ানা হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ জুন জাতিসংঘ ইহুদী ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে শান্তির আহ্বান জানায়। আল-কুদসে ১ লক্ষ ইহুদী অবরুদ্ধ থাকার পরও আরব লীগ তাতে একমত হয়ে যায়। এ শান্তিচুক্তির মাধ্যমে আরব শক্তি নিস্তেজ হয়ে যায় এবং সর্বত্র ইহুদী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ইউরোপে পঁচাত্তরের অধিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয়। ইংল্যান্ড বহু সংখ্যক জঙ্গী বিমান পাঠায়। প্রশিক্ষক পাইলটও পাঠিয়ে দেয়। ইহুদীরা প্রত্যেক পাইলটকে মাসিক ৫ হাজার স্টার্লিং মুদ্রা ভাতা দিতে থাকে। আল-কুদসে নিযুক্ত আমেরিকান কন্সালের ভাষ্যমতে, একমাত্র শান্তির সিদ্ধান্তই ইহুদীদের বাঁচিয়েছে এবং তাদের ধ্বংসের পথে অন্তরায় হয়েছে।

৯ জুলাই নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। ইহুদীরা বিরাট সংখ্যক সৈন্য হাজির করে। প্রবল আক্রমণ চালায় আল-কুদসে এবং আল-কুদসের এক লক্ষ ইহুদীকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এরপর আল-কুদস ইহুদীদের হাতে অর্পণ করা হয়।

১৯৪৮ সালের ১৫ জুলাই, অর্থাৎ নতুন করে যুদ্ধ শুরুর ৬ দিন পর আবার জাতিসংঘ শান্তির আহ্বান জানায়। আরব দেশগুলো নতুন করে এই প্রস্তাবে একমত হয়। ফলে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ইহুদীদের হাতে আসে।

এরপর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘ একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিল ফোক বার্নাডট (Folke Bernadotte) তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব।

ফোক বার্নাডট প্রকৃত অবস্থার সঠিক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইহুদীরা তাদের সামরিক শক্তির জোরে ফিলিস্তিনের ৭৮% ভূখণ্ড দখল করেছে। অথচ তাদের ভাগে ছিল ৫৬%। তৎকালীন ফিলিস্তিনী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল মোট জনসংখ্যার ৬৭%। আর ইহুদীরা ছিল ৩২%। তবুও তারা এ বণ্টনে সন্তুষ্ট হয়নি; বরং ৭৮% ভূখণ্ড তারা দখল করেছে। এমনিভাবে বার্নাডট তার যবানবন্দীতে লিখেছিলেন, ফিলিস্তিনে ইহুদীরা চৌত্রিশটি গণহত্যা সংঘটিত করেছে। ইহুদীরা এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বেসামরিক লোকজনের উপর। তিনি আরও বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই ফিলিস্তিনের ৫৮৫টি জনপদের মধ্য থেকে ৪৭৮টি তছনছ করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বার্নাডট তার বক্তব্য জাতিসংঘের সামনে তুলে ধরেন, আর ১৭ সেপ্টেম্বর তাকে জাতিসংঘের মদদে ইহুদীরা হত্যা করে। কেননা, তিনি ফিলিস্তিনে ঘটে যাওয়া বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

বিভ্রান্তিকর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনাও ঘটে। ১৯৪৮ সালের ২২ অক্টোবর ইহুদীরা মিসরী বাহিনীর কাছ থেকে বির সাবা ছিনিয়ে নেয়; কিন্তু আমরা আরবদের কিংবা আরব লীগের কোনো মন্তব্য শুনতে পাইনি।

৫ নভেম্বর তারা মিসরের মাজদাল, আসকালান ও পুরা নেগেভ মরুভূমি দখল করে নেয়; কিন্তু কোনো আরবের আপত্তি শোনা যায় না।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে তাদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইখওয়ান সদস্যরা নিজেদের দেশে পৌঁছনোর পর নিরাপত্তা বাহিনী তাদেরকে বন্দী করে এবং তাদেরকে মিসর, জর্ডান ও সিরিয়ার বিভিন্ন কারাগারে প্রেরণ করে।

৭ লক্ষ ৭০ হাজার ফিলিস্তিনীকে বিভিন্ন আরব দেশে বিতাড়ন সম্পন্ন করা হয়। এরপর ইখওয়ানশক্তির সঞ্চালক ইমাম হাসান আল-বান্নাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আয়োজন সম্পন্ন করা হয়।

১৯৪৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইহুদীরা মিসরের সাথে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ করে। ২৩ মার্চ তারা লেবাননের সাথে চুক্তি স্থাপন করে। ৪ এপ্রিল জর্ডানের সাথে তারা চুক্তি স্বাক্ষর করে।

সিরিয়া স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ফলে সিরিয়ায় বিপ্লব ঘটানো হয়। ১৯৪৯ সালের ১ এপ্রিল নেতা হুসনি বিপ্লব কায়েম করে। সিরিয়ার ক্ষমতা দখলের পর নেতা হুসনির প্রথম কাজ ছিল ইহুদীদের সাথে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পন্ন করা।

ফিলিস্তিনের শুধু ২২% ভূখণ্ড তখন অবশিষ্ট থাকে। তাও মিসর ও জর্ডানের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। মিসর গাজার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আর জর্ডান আধিপত্য বিস্তার করে পশ্চিম তীরের উপর। এসব সংলাপ আর শান্তির চুক্তিতে আমরা কোথাও কোনো ফিলিস্তিনীকে ফিলিস্তিনের ইস্যু সওদা করতে দেখিনি।

এ দীর্ঘ ইতিহাস পেশ করার পর আমরা জানতে পেরেছি, কে বিক্রি করেছে। আর কে তার মান-সম্মান, দেশ ও দীনের ব্যাপারে শিথিলতা করেছে। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ইতিহাস একটি হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক ইতিহাস।

এসব সন্ধিচুক্তির পর জাতিসংঘ ইসরাইলকে সদস্যহিসাবে গ্রহণ করে। এরপর একের পর এক বিশ্বের অন্যান্য দেশ নবগঠিত এই জায়নবাদী কাঠামোকে স্বীকৃতি দিতে থাকে। তবে এই প্রতিষ্ঠাই শেষকথা নয়; বরং এরপরও ফিলিস্তিন স্বাধীন করার জন্য ফিলিস্তিনে বহু বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে দোআ করি, তিনি যেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সম্পন্ন করে দেন।

ফিলিস্তিনের ইতিহাস ঘিরে কিছু পর্যালোচনা

মুসলিম উম্মাহ যে পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে, সে হিসাবে এ পরিণতি স্বাভাবিক। এই পরিণতি বিস্ময়কর নয়; বরং শক্তির উৎস থেকে দূরে সরে গিয়েও মুসলমানদের শক্তির উপর বহাল থাকা হচ্ছে বিস্ময়কর। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে মানবতার সূচনা থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার পর এখানে আমাদের একটি বরং কয়েকটি পর্যালোচনা পেশ করা প্রয়োজন–

প্রথম পর্যালোচনা : ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব হয়তো আমরা এখন বুঝতে পেরেছি। বিশেষত ফিলিস্তিন ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত, অথবা মুসলিম বিশ্বের নানাবিধ ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত অনেক বিষয়ই হয়তো আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা পারস্য, রোমান, মুসলিম, অমুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের ইতিহাস অতিক্রম করে এসেছি। হয়তো এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ ﷻ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কেন কাহিনী দিয়ে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস অধ্যয়ন না করে আমরা ভবিষ্যতে কিছুতেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারব না। ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমেই একজন বিবেকবান ব্যক্তির সেই ভুলে পতিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, যেই ভুলে এর আগে তার পূর্বপুরুষরা পতিত হয়েছিল।

যে পথ নানান বিপর্যয় এবং দেশ ও জাতির ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে জেনে-বুঝে সেই পথে পা বাড়ানো অসম্ভব। যে ব্যক্তি উম্মাহর ইতিহাস থেকে মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ ও মুসলিহীনের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করবে এবং বিজয়ের উপকরণ

সম্পর্কে অবগত হবে, তার জন্য এসব উপকরণ শূন্য থাকা অসম্ভব। কাজেই বিশেষভাবে ইসলামের ইতিহাস এবং স্বাভাবিকভাবে মানবতার ইতিহাস অধ্যয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। আর আমরা যে বিষয়টি তুলে ধরলাম, তাও হয়তো এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কালের এই ধারাবাহিকতায় আমরা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ইতিহাস দেখেছি। আমরা এমন অনেক গোপন বিষয় জানতে পেরেছি, যা আমাদের অনেকের কাছে অজানা ছিল। আমরা এও জেনেছি যে, ফিলিস্তিন কী ইসলামী ভূখণ্ড, নাকি আরব ভূখণ্ড? কেন আমরা বলে থাকি যে, ফিলিস্তিন একটি ইসলামী ভূখণ্ড? আমরা মসজিদে আকসা ও কুব্বাতুস সাখরার পার্থক্য জেনেছি। আমরা এটাও জেনেছি যে, ফিলিস্তিনীরা কি তাদের ভূখণ্ড বিক্রি করে দিয়েছে? অথবা কে এই পবিত্র ভূখণ্ডের মাটি ও মানুষকে বিক্রি করে দিয়েছে?

প্রিয় ভাই-বোন! আমরা অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা মেলে ধরলাম। বিষয়টি আমরা অনেক সংক্ষিপ্ত করেছি। আমরা ফিলিস্তিনের ইতিহাসের ১০ হাজার বছর বা আরও অধিক কাল নিয়ে কথা বললাম। এ বরকতময় ভূখণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য বহু পৃষ্ঠার অনেকগুলো স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রয়োজন।

যেমন, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে বসবাসকারী নবীদের ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। এমনই ব্যাপার ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসলামী বিজয়ের কাহিনীতে। যাতে রয়েছে বহু উপদেশ, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা। বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস। এ অধ্যায়টি গভীর, সূক্ষ্ম ও সুদৃঢ় আলোচনার দাবি রাখে। কেননা, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে সংকট পুনরাবৃত্তিশীল। বিশাল উসমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস, যা ৬০০ বছর টিকে ছিল এবং ফিলিস্তিনের কারণে লড়ত। উসমানী খেলাফতের পতনের পরই ইহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনের পতন হয়েছে। এমনইভাবে আধুনিক ইতিহাসের আলোচনাও। এসব বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের বিরাট সংখ্যক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। কেননা, তা কাহিনী, শিক্ষা ও উপদেশে ভরপুর। একইভাবে

১৯৪৮ সালের পরবর্তী ইতিহাসও আমাদের জানা প্রয়োজন। অনেক মানুষই জিজ্ঞাসা করে, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কী ঘটেছে? ফিলিস্তিনীদের প্রতিক্রিয়া কী? এবং আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়াই বা কী?

প্রথম পর্যালোচনা : ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব।

দ্বিতীয় পর্যালোচনা : এই ইতিহাসের আলোকে আমাদের প্রশ্ন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অধিকার কোথায়? অধিকার যদি আদি বসবাসের কারণে হয়ে থাকে, তা হলে তারা তো ফিলিস্তিনের সর্বপ্রথম বাসিন্দা নয়। তাদের আগে ফিনিশিয়ান, কেনানী ও জেবুসাইটরা ফিলিস্তিনে বসবাস করেছে। যদি বিষয়টি দীর্ঘ সময় শাসন করার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তা হলে তাদের শাসন তো সবচেয়ে দীর্ঘ ছিল না। সব মিলিয়ে তারা ৪১৮ বছর শাসন করেছে। সেখান থেকে ৮০ বছর ছিল ঈমানী শাসন। আর বাকি ৩৩৮ বছর ফেতনা-ফাসাদের শাসন।

আর ব্যাপারটি যদি শুধু অবস্থানের ভিত্তিতে হয়, তা হলে দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের মানুষই ফিলিস্তিনে অবস্থান করেছে। পারস্য, রোমান, গ্রিক, মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদী প্রভৃতি।

আর যদি বিষয়টি দীর্ঘ স্থায়িত্বের ভিত্তিতে হয়, তা হলে মুসলমানরা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী ছিল।

তাদের দাবি যদি হয় বিকৃত তাওরাতের ওয়াদার আলোকে, তা হলে বিকৃত তাওরাত কী ওয়াদা করেছে? তাওরাত বলেছে, এ ভূখণ্ড নেককারদের হাতে অর্পণ করতে। বর্তমান ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে নেককার লোকজন কোথায়? এই ফেতনাবাজদের মধ্যে নেককার কোথায়, যারা শুধু ফিলিস্তিন নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের রব ﷻ বলেন—

> আমি যাবুরের মধ্যে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, আমার নেককার বান্দারাই দেশের উত্তরাধিকারী হবে। [সুরা আম্বিয়া : ১০৫]

এমনকি তাওরাতেও তা শুধু মুত্তাকীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মুত্তাকী কোথায়? যদি তারা বলে, এটা আমাদের আকিদা। তা হলে মুসলিম হিসাবে আমরাও বলি, এটা আমাদের আকিদা। আমাদের বিশেষ আকিদা হচ্ছে যেদিন থেকে এই ভূখণ্ডে ইসলাম প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকে এই ভূখণ্ড একটি ইসলামী ভূখণ্ড। ইনশা আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত তা ইসলামী ভূখণ্ডই থাকবে।

তৃতীয় পর্যালোচনা : নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিন একটি বরকতময় ভূখণ্ড। অর্থাৎ এটা খুব মূল্যবান ভূমি। এ ভূখণ্ডে আল্লাহ ﷻ এমন অগণিত উপাদান রেখেছেন, যা ইসলামী বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই নেই। এজন্য আমি বলি, ফিলিস্তিন মুমিনদের জন্য একটি হাদিয়া। আল্লাহর শরীয়ত থেকে ছিটকে পড়া কেউ এ ভূখণ্ড গ্রহণ করতে পারবে না।

ফিরে দেখুন, বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই মুসলিম বাহিনীর দিকে নজর দিন, যারা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন।

ফিরে দেখুন, আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ ﷺ-এর বাহিনীর দিকে। তাঁর পেছনে রয়েছেন উমার ইবনু খত্তাব ﷺ। দেখুন, আমর ইবনু আস ﷺ-এর বাহিনীর দিকে, যা অন্তর্ভুক্ত করেছিল বহু সাহাবী ও তাবেয়ীকে।

ফিরে দেখুন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বাহিনী, নুরুদ্দীন মাহমুদের বাহিনী, সাইফুদ্দীন কুতুয ও যাহির বাইবার্সের বাহিনী, সাইফুদ্দীন কালাউন ও আশরাফ খলীলের বাহিনী। এদের বাহিনীর দিকে বার বার দেখুন, যাতে ওইসব লোকের বৈশিষ্ট্য জেনে নিতে পারেন, যারা ফিলিস্তিনের মাটি স্বাধীন করবে।

আমি মনে করি, ফিলিস্তিন হচ্ছে উম্মতের ঈমানের মানদণ্ড। ফিলিস্তিন ইস্যুতে যদি উম্মতের অনুরাগ থাকে, তা হলে অন্যান্য ইসলামী ইস্যুতেও সে অনুরাগের মধ্যে থাকবে। পক্ষান্তরে ফিলিস্তিন ইস্যুতে যদি মুসলমানদের উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে যায়, তা হলে অন্যান্য ইসলামী ইস্যুতে তাদের উদ্দীপনায় আরও বেশি ভাটা পড়বে। কাজেই ফিলিস্তিন হচ্ছে ঈমানী মানদণ্ড।

এই ভূখণ্ড ছিল রসুল ﷺ-এর ইসরার ভূমি। এখানে রয়েছে প্রথম কিবলা, যে ভূখণ্ডে বসবাস করেছেন অসংখ্য নবী-রসুল, সেই ভূখণ্ডের জন্য যদি তারা সক্রিয় না হয়, তা হলে অন্যান্য দেশের জন্য তারা কীভাবে সক্রিয় হবে?

চতুর্থ পর্যালোচনা : ফিলিস্তিন আকিদাসংক্রান্ত ইস্যু। অর্থাৎ জাত-পাত, ধলা-কালা, সচ্ছলতা-অভাব, নৈকট্য-দূরত্ব— সব নির্বিচারে ফিলিস্তিন প্রত্যেক মুসলমানের ইস্যু। এটা শুধু ফিলিস্তিনীদের বিষয় নয়; এটা আঞ্চলিক বিষয় নয়।

আসুন দেখি, ইতিহাসের ধাপে ধাপে কারা ফিলিস্তিন স্বাধীন করতে কাজ করেছেন? আরব সাহাবীরা ফিলিস্তিনী ছিলেন না। এর পরে যারা ফিলিস্তিনের পতাকা উড্ডীন করেছেন, তাদের দিকে দেখুন। নুরুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন তুর্কী বংশদ্ভূত। তিনি ফিলিস্তিনী ছিলেন না। এমন কি আরবও ছিলেন না। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী কুর্দী। সাইফুদ্দীন কুতুয ছিলেন তুর্কী বংশদ্ভূত মামলুক। এমনিভাবে কালাউন ও আশরাফ খলীলও ছিলেন তুর্কী বংশদ্ভূত মামলুক।

আধুনিক যুগে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ ছিলেন উসমানী তুর্কী। তিনিও ফিলিস্তিনী ছিলেন না। এমনকি আধুনিক যুগেও ফিলিস্তিনের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম কোনগুলো? সবার আগে জিহাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন শায়খ ইযযুদ্দীন কাসসাম। তিনি সিরিয়ান; ফিলিস্তিনী নন।

বিভক্তির পর ফিলিস্তিনীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা বাহিনীর সঞ্চালক হাসান আল-বান্না ছিলেন মিসরী; ফিলিস্তিনী ছিলেন না। কাজেই ফিলিস্তীন ইস্যু কোনো আঞ্চলিক ইস্যু নয়; বরং এটা আকিদাসংক্রান্ত ইস্যু, যা ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি ওইসব মুসলমানকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করেন।

পঞ্চম পর্যালোচনা : ফিলিস্তিনে আগত সবার কাছেই এই বিশ্বাসের (আকিদার) মাত্রা ছিল। অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের কাছেই নয়।

মুসলমানরা প্রথম থেকেই বিশ্বাসের কারণে এগিয়ে এসেছিলেন। আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ থেকে মুসলমানরা বিশ্বাস (আকিদা)-র কারণে সক্রিয় রয়েছেন।

আল-কুদসের পাদ্রি যখন আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন বিষয়টি আপনাদেরকে এ দেশে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে? আপনারা কী চান? আনপনারা কী আল-কুদস চান? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আল-কুদস একটি মহিমান্বিত ভূখণ্ড। এখান থেকে আমাদের নবী ﷺ-এর মিরাজের সূচনা হয়েছিল। তিনি দুই ধনুক পরিমাণ বরং আরও কম দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছিলেন। আল-কুদস নবীদের এবাদতের স্থান এবং এখানে রয়েছে তাদের কবর। আমরা তোমাদের চেয়ে এর বেশি হকদার।

অতএব, তিনি আল-কুদসে গিয়েছিলেন আকিদার কারণে। তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহর সাথে অন্যকিছুকে ইলাহ মান্যকারী পৌত্তলিকদের কলুষতা থেকে এ ভূখণ্ডকে পবিত্র করতে এবং সেখানে আল্লাহর বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করতে।

এমনকি অমুসলিমরাও এ ভূখণ্ডে গিয়েছিল তাদের আকিদার কারণে। যদিও তা বিকৃত, অগ্রহণযোগ্য; তবুও তা আকিদা (বিশ্বাস)। আমরা দেখতে পাই ক্রুসেডাররা যখন সেখানে যায়, তখন তারা ক্রুশ প্রতীক উত্তোলন করে। তারা বলে, আমরা এখানে যিশুকে সাহায্য করব! গীর্জার সহায়তা করব। তারা এই ধর্মীয় অনুরাগ নিয়েই সেখানে গিয়েছিল।

ইহুদীরা যখন আল-কুদসে যায়, তখন তারাও আকিদার কারণে যায়। তারা কখনও তাদের ফাইলপত্র, কথা-বার্তা ও অভিভাষণ থেকে আকিদাকে বাদ দেয়নি। এমনকি থিওডোর হার্জল– যে ছিল ধর্মহীন এবং ইহুদীবাদে পুরোপুরি বিশ্বাস করত না– সেও চেয়েছিল একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, যেখানে ইহুদীরা জমা হবে এবং বিশ্বে তাদের পরিচিতি রচিত হবে। এজন্য সেও ইহুদীদের গীর্জায় যেতে বাধ্য হয়, যাতে সবাই দেখে যে, সে একজন ধার্মিক ইহুদী। কারণ, সে জানত যে, মানুষ যদি সক্রিয় হয়, তা হলে আকিদার কারণেই সক্রিয় হবে।

এমনকি ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সেনাপ্রধান জেনারেল এ্যালেনবি যখন ফিলিস্তিন প্রবেশ করে, তখন সে বলে উঠেছিল, 'আজ ক্রুসেড লড়াই সম্পন্ন হল।' অথচ নতুন সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সেনা ছিল সেকুলার পন্থী। আমি আমার এই কথা ওইসব সেকুলার এবং ওইসব লোকের উদ্দেশ্যে বলছি, যাদের কাছে ইসলামী বিশ্বের ঝাণ্ডা বাদে অন্যকোনো ঝাণ্ডা আছে। আমি বলছি, দুনিয়ার প্রত্যেক দেশ ফিলিস্তিন আসে আকদিার কারণে। অতএব, খাঁটি আকিদা ছাড়া ফিলিস্তিন বিজয় অসম্ভব!

ষষ্ঠ পর্যালোচনা : শত্রুদের শক্তির কারণে ফিলিস্তিন বা অন্যকোনো ইসলামী ভূখণ্ডের কখনও পতন হয়নি; বরং তার পতন হয়েছে মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে। আপনি ইতিহাসের সেই সময়কালের দিকে ফিরে দেখুন, যখন ফিলিস্তিন আগ্রাসনের শিকার হয়। ফিরে দেখুন সেই ধাপ, যখন উবায়দী (ফাতেমী) বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। দেখুন সেই ধাপ, যখন ক্রুসেডার বাহিনী ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। লক্ষ করুন সেই সময়ের দিকে, যখন ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। আরও দেখুন সেই সময়ের দিকে, যখন ইহুদী বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে।

আমরা দেখতে পাব মুসলমানরা তখন ছিল শরীয়ত থেকে অনেক দূরে এবং এমন এক অবস্থায়, যখন তাদের বিজয় আসতে পারে না। একথা প্রমাণ করে যে, ইসলামে বিজয়ের সমীকরণ একেবারে স্পষ্ট। বিজয় দানকারী হচ্ছেন আমাদের রব ﷻ।

> আল্লাহ শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। [সুরা আনফাল : ১০]

যখন আমরা আল্লাহর দীন থেকে উদাসীন ও দূরে থাকব, তখন কীভাবে আমাদের রব আমাদেরকে সাহায্য করবেন? আল্লাহর কসম! মুসলমানরা আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরও যদি তাদেরকে বিজয়ী করা হয়, তা হলে দুনিয়াতে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

কেননা, সাধারণ মানুষের সামনে এটা দীন ধ্বংস এবং মান ও মূল্যবোধ ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্য (আল্লাহ এ উম্মতকে রক্ষা করুন) তিনি এ উম্মতের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তিনি তখনই সাহায্য করবেন, যখন তারা আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকবে। আর যখন তারা আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে, তখন তিনি প্রজন্ম বদলে দিবেন এবং নতুন এক প্রজন্ম উপস্থিত করবেন, যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং তিনিও তাদেরকে ভালোবাসবেন– যারা মুমিনদের উপর নম্র, কিন্তু কাফেরদের উপর কঠোর। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করবে না।

কাজেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ হচ্ছে শরীয়ত থেকে দূরে সরে যাওয়া। অপর যে বড় রোগে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়েছে এবং যেটা ফিলিস্তিনের দীর্ঘ ইতিহাসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার পতনের কারণ হয়েছে, তা হল অনৈক্য। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> আর আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো এবং তাঁর রসূলের। তা ছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়োও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। [সুরা আনফাল - ৮:৪৬]

এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

এমনই আরেক ভয়ঙ্কর রোগ হচ্ছে উপকরণ অবলম্বন না করা। যেমন, যখন ফিলিস্তিনের পতন হয়, তখন কারণ ছিল মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকরণ অবলম্বন না করা; উন্নত মানের হাতিয়ার না থাকা এবং সৈনিকদের উত্তম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা। পক্ষান্তরে যে সময়গুলোতে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছেন, তখন আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি দেখতে পাই। যদিও তাদের সামর্থ্য ছিল কম।

ফিলিস্তিন শত্রুর হাতে চলে যাওয়ার পিছনে আরও একটি ভয়ঙ্কর নিদর্শন হচ্ছে অযোগ্য ব্যক্তির হাতে শাসনভার অর্পণ। অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব– চাই সে নেতৃত্ব হোক রাজনৈতিক, সামরিক,

জ্ঞানভিত্তিক অথবা ধর্মীয়– এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা, যার এই দায়িত্ব পরিচালনার যথেষ্ট যোগ্যতা নেই। অথবা এমন ব্যক্তির কাছে অর্পণ করা, যে খিয়ানত করে। আল্লাহর কসম! এটা আমানতকে ধ্বংস করার নামান্তর এবং কিয়ামতের আলামত। যেমন আমাদের রসুল ﷺ বলেন–

> যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। [বুখারী : ৫৯]

আপনারা ১৯৪৮ সালের ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকান। যাতে তৎকালীন আরব নেতাদেরকে দেখে নিতে পারেন। তা হলেই বুঝতে পারবেন প্রিয় ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদী রাষ্ট্র কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

সপ্তম পর্যালোচনা : ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদীরা গেড়ে বসা নিয়ে যদি আমরা বলি, এর কারণ মুসলমানদের দুর্বলতা, তা হলে একথা বলে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুদের প্রচেষ্টা অস্বীকার করার কোনো মানে নেই। কোনো সন্দেহ নেই যে, ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল বিরাট এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আমরা দুর্বল হওয়ার মানে এই নয় যে, অন্যরা কোনো পরিকল্পনা করেনি। বরং আমরা স্বীকার করি যে, ফিলিস্তিনে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে ইহুদীরা অক্লান্ত সাধনা ও বিরাট পরিশ্রম করেছে। এসব কিছু থিউডোর হার্জলের আগেকার। স্মরণ করুন আমরা ডোনুমাহ ইহুদীদের বিরাট প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তির ব্যাপারে যা বলেছিলাম। মনে করুন, স্বতন্ত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা এবং ইহুদীদের চূড়ান্ত পর্যায়ের কৃপণ হওয়ার পরও সেই মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দের কথা। আরব লীগ ৫টি দেশের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল ১ মিলিয়ন পাউণ্ড। বিপরীতে শুধু আমেরিকার ইহুদীরাই প্রদান করেছিল ২৫০ মিলিয়ন ডলার।

এর সাথে আরও সহায়তা করে ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স। সেই সাথে ছিল মুসলিম ও আরব বিশ্বে ঘাপটি মেরে থাকা বিরাট সংখ্যক স্বার্থপর। আরও ছিল তুরস্কের ঐক্য ও প্রগতি সঙ্ঘের অভ্যন্তরে। কাজেই এ ছিল উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। যাতে প্রচুর অর্থ,

মিডিয়া শক্তি এবং বহু অনুপ্রবেশকারীর ত্যাগ ও প্রচেষ্টা ছিল। এই দিকটির প্রতিও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

> তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও, তবে তারাও তোমাদের মত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা নিসা - ৪:১০৪]

ইহুদীরা যে রাশিয়া অথবা ইউরোপ থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিন এসেছে, তারা এসেই সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ পায়নি, তাদের তো আমেরিকা, লন্ডন কিংবা প্যারিসেও হিজরত করার সুযোগ ছিল। তা হলে কোন জিনিস তাদেরকে ফিলিস্তিন হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তা হল আকিদা; বিশ্বাস! বিকৃত আকিদা। তা হলে মুসলমানদের বিশুদ্ধ আকিদা কোথায়, যা তাদেরকে এই পবিত্র ভূখণ্ড স্বাধীন করতে সক্রিয় করবে?

অষ্টম পর্যালোচনা : এখন হয়তো আমরা ইসলামী খেলাফতের মূল্য বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, এখানে এমন একটি নেতৃত্ব থাকা দরকার, যা মুসলমানদেরকে পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ করে রাখবে। বুঝতে পেরেছি সুলতান আব্দুল হামীদ সানীর মূল্য, যিনি মুসলমানদের নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে ছিল একটি প্রকল্প, যার নাম ছিল ইসলামী সংঘ। কিন্তু সর্বত্র জাতীয়তাবাদের শক্তি সেই প্রকল্প রুদ্ধ করে দেয়। যখন উসমানী খেলাফতের পতন হয়, তখনই ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহুদী রাষ্ট্র। এটাই হচ্ছে খেলাফতের মূল্য। এক নেতৃত্বের অধীনে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার মূল্য।

আমি বলছি না যে, উসমানী খেলাফত তার শেষ সময়ে শক্তিশালী ছিল। অথবা তার স্থায়ী হওয়ার অধিকার ছিল। আমি শুধু বলছি যে, উক্ত খেলাফত ছিল একটি প্রতীক, যার অধীনে মুসলমানদের সমবেত থাকা ওয়াজিব। আমি আরও বলছি যে, দুর্বল নেতৃত্ব শক্তিশালী করা আবশ্যক। কিন্তু যেই খেলাফত মারা গেছে, তার পক্ষে মুসলমানদেরকে নতুন করে একত্র করা কঠিন, যাকে অনেকে কল্পনা মনে করে। অথচ এর অধীনে আমরা দীর্ঘকাল জীবন-যাপন করেছি। তখন তা কল্পনা ছিল না;

বরং তা ছিল রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ওই মুসলমানদের জন্য সাহায্য আর বিজয়, যারা এক কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। চাই এ কাঠামো হোক কখনও উমাইয়া, কখনও আব্বাসী, কখনও আইয়ুবী, কখনও জঙ্গী বা কখনও উসমানী। এমন একটি অবকাঠামো মুসলমাদের পুনরায় গড়ে তোলা আবশ্যক, যা নতুন করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। অন্যথায় আমাদের বিপর্যয় লেগেই থাকবে।

নবম পর্যালোচনা : ইসলামী দেশসমূহের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আশা কখনও মরবে না। আমরা দেখেছি অবিচ্ছিন্ন ৯২ বছর আল-কুদস ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে থাকে। পরিশেষে স্বাধীন হয়। কিছু কিছু ফিলিস্তিনী শহর অবিচ্ছিন্ন ২০০ বছর ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে থাকে। শেষে সেগুলোও স্বাধীন হয়। ক্রুসেড লড়াই অব্যাহত থাকে ২০০ বছর। এরপর কী হয়? বহু সম্প্রদায় আর বহু জাতির জিহাদের বদৌলতে সবখান থেকে ক্রুসেডার বাহিনী বেড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই বহু জাতি আর সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-এর আকিদা। আমরা যেন সবসময় স্মরণ রাখি প্রিয় নবী ﷺ-এর হাদীস–

> আমার উম্মতের একটি দল সবসময় সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের অপদস্থকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনই থাকবে তারা, যতক্ষণ পর্যন্ত (কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে) আল্লাহর নির্দেশ না আসে। [মুসলিম : ৫০৫৯]

আল্লাহর কসম! এই উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত নিঃশেষ হবে না। এটা আমাদের রব ﷻ-এর অঙ্গীকার। এই উম্মত সমস্ত মানুষের জন্য চূড়ান্ত রেসালত, চূড়ান্ত দীন ও চূড়ান্ত রসুলের ধারক। কাজেই এই উম্মতের সমাপ্তি মানে দুনিয়ার সমাপ্তি; কিয়ামতের আগমন। এই উম্মত সবসময় বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> মুসা বললেন তার কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। [সুরা আরাফ: ১২৮]

দশম পর্যালোচনা : এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ। এই দীর্ঘ ইতিহাস শোনার পর– যা তুলে ধরতে গিয়ে আমরা যৎসামান্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তুলে ধরেছি, যা একেবারে খোসা ও আবরণতুল্য, প্রকৃত বিশ্লেষণ অনেক অনেক অনেক গভীর– এখন আমাদের করণীয় কী?

দেখা যাচ্ছে আমরা তথ্য-উপাত্ত সঞ্চয় করলাম, আর তাতেই সব হয়ে গেল? আমরা অজানা কিছু বিষয় জেনে নিলাম, তাতে কি সব হয়ে গেল?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা!

এসব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আমাদের সক্রিয় হতে হবে। আমরা ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে কথা বলব। অর্থের মাধ্যমে, দুআর মাধ্যমে, ইহুদী পণ্যসহ যেসব পণ্যের লভ্যাংশ ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে যায়নবাদী রাষ্ট্রটির নির্মাণ ও স্থিতির জন্য ব্যয় হয়, সেগুলো বর্জনের মাধ্যমে জিহাদ করার কথা আলোচনা করব। এ ছাড়া আমি মনে করি এই ইস্যুতে দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–

এক : ফিলিস্তিনের ইতিহাসে আমরা যেসব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলো প্রচার করা। মুসলমানদের বুঝ শুধরে দেওয়া। এ বিষয়ে অনেক মুসলমানই ভুল-বুঝাবুঝির শিকার। এমনকি অনেক ধর্মভীরু মুসলমানও। সেই সাথে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন ফোরামে কাজ করা।

দুই : পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং মুসলিম ও অমুসলিম– সবার সাথে আলোচনা করা। পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমে– আরব-অনারব বিভিন্ন ভাষায়– এ বিষয়ে লেখালেখি করা। যাতে মানুষ প্রকৃত সত্য বুঝতে পারে; সত্যকে সনাক্ত করতে পারে এবং মিথ্যার মরিচিকা থেকে সত্যের রত্ন আলাদা করতে পারে।

মনে রাখবেন, এই ইস্যুতে প্রত্যেক মুসলমানের কিছু করণীয় আছে। এটা শুধু শাসকশ্রেণি, আলেম-সমাজ, অর্থনীতিবিদ অথবা বিশেষজ্ঞদের বিষয় নয়।

প্রিয় ভ্রাতৃসমাজ!

পরিশেষে আমি স্বাগতম জানাব প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে, যিনি ফিলিস্তিন ইস্যুতে কাজ করছেন। আপনি লাভ করেছেন সুউচ্চ সম্মান। অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ পুরুস্কার। আপনি সেই বরকতময় ভূখণ্ডের পক্ষে প্রতিরোধ ও জিহাদের মামলা জিতেছেন, যেখানে রসুল ﷺ-কে ইসরা (রাতের বেলায় ভ্রমণ) করানো হয়েছিল এবং সেখান থেকে তাঁকে উঠানো হয়েছিল আসমানে। যেখানে তিনি সমস্ত নবীর ইমামতি করেন। যেই ভূখণ্ডের দিকে ফিরে মুসলমানরা সালাত আদায় করেছিল কয়েক বছর। যে ভূখণ্ডকে পরিতৃপ্ত করেছে বহু সাহাবী, তাবিয়ী এবং এই জাতির মুজাহিদ সন্তানদের রক্ত। আপনাকে স্বাগতম!!

আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আমি দোআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর পথের মুজাহিদদের সাথে হাশর নসিব করেন। যারা জিহাদ করেছেন এই ইস্যুতে এবং অন্যান্য ইস্যুতে। আমি তাঁর কাছে আরও দোআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে বাস্তবতা দেখিয়ে দেন এবং সত্যের পথ দেখান। আমাদেরকে তার বিশেষ সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। মৃত্যুর আগে বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করার সুযোগ দেন। ফিলিস্তিন ও সমস্ত দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি এর সামর্থ্য রাখেন।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

হুদহুদ
প্রকাশন
বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

خَطُّ الزَّمَنِ
قِصَّةُ فِلَسْطِيْنَ
مُنْذُ ظُهُوْرِ الْإِنْسَانِ إِلَى زَمَانِنَا

ইসলামী ইতিহাসের হাজারও কাহিনী থেকে আমরা আপনাদের জন্য এমন এককাহিনী নির্বাচন করেছি, বর্তমান যুগে যা অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খুব জরুরী। তা হল ফিলিস্তিনের কাহিনী। কয়েক হাজার বছরের ঘটনা সম্বলিত ফিলিস্তিনের ইতিহাস। ফিলিস্তিন মানবেতিহাসের এমন এক অধ্যায়, যা উপলব্ধি ও আত্মস্থ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। এতে রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আর উপদেশ। রয়েছে এমন অজস্র শিক্ষা, যা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। এখন এবং নিকট ও দূর ভবিষ্যতে। ...

কেউ কেউ মনে করেন, ফিলিস্তিন সংকট একটি ভূখণ্ডগত সমস্যা; যা ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব ব্যাপার। ফিলিস্তিনীরা যেহেতু প্রতিনিয়ত নানা ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাই এ সমস্যার সমাধান তাদেরই করতে হবে। তবে আমি মুসলিম ভাই-বোনদের বলব, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ফিলিস্তিন সংকট সর্বব্যাপী একটি ইসলামী সংকট, যা পুরো মুসলিম উম্মাহকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। কারণ, ফিলিস্তিন সংকটে সাড়া দেওয়া প্রথমত আকিদার দাবি। আর আকিদার দাবি এমন এক বিষয়, যা পূরণ না করে মুসলমান কিছুতেই ঘরে বসে থাকতে পারে না। ...

এটা মুসলমানদের প্রথম কেবলা এবং তৃতীয় হারাম। এখানে রয়েছে মসজিদে আকসা। এটা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ যে, হাদীসের ভাষ্যমতে মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং ফিলিস্তিনের এই মসজিদ বাদে আর কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যায় না। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড কুরআনের একাধিক বিবরণমতে বরকতময় ভূখণ্ড। ...

ফিলিস্তিনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা ইসলামের সমগ্র ইতিহাস অধ্যয়ন করব। মুসলমানদের ইতিহাসের সমস্ত ধাপ এই ভূখণ্ড দিয়ে অতিবাহিত হয়। ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে আমরা বিচরণ করব মানবেতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে। আমরা জানব পারসিক, রোমান, আশুরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ফারাও ইতিহাস। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসেও আমরা বিচরণ করব। ঘাঁটাঘাঁটি করব ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানিসহ বহু আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাস। ...

এই বরকতময় ভূখণ্ডের ইতিহাসে দুনিয়ার যে সাম্রাজ্যেরই রয়েছে কোনো না কোনো সম্পর্ক কিংবা কোনো প্রকারের রেষারেষি, সেগুলোর ইতিহাসও আমরা তুলে ধরব। ...

চলমান 'ফিলিস্তিন সংকট' নিয়েও আমরা আলোচনা করব। কেননা, ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে এত বেশি পরিমাণে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, যা অন্য যেকোনো সংকটকেন্দ্রিক চালানো অপপ্রচারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। ইহুদীদের দখলে থাকা মিডিয়া শক্তির অপব্যবহার করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে বড় ধরণের বিকৃতি। ওই বিকৃতির ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই। ...

এসব বিষয় সামনে রেখে আমরা উপস্থাপন করছি ফিলিস্তিনের ইতিহাস। আল্লাহ কবুল করুন। –রাগিব সারজানী

হুদহুদ প্রকাশন
বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত
987-984-811-188